বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী

ডঃ মোঃ আলী রেজা খান

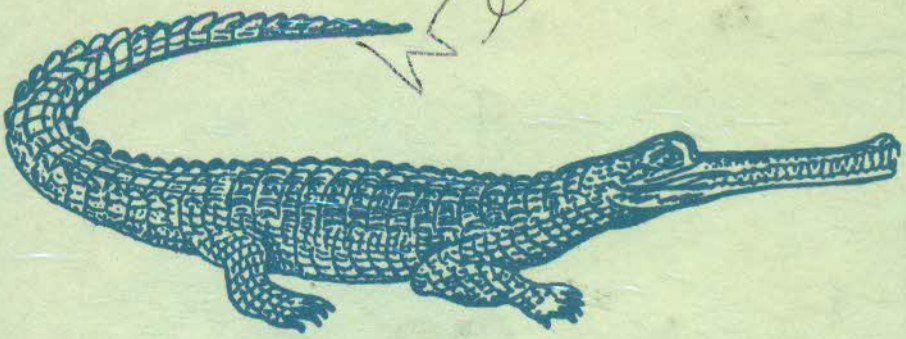

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী

উভচর–সরীসৃপ

(প্রথম খণ্ড)

ডঃ মোঃ আলী রেজা খান

সহযোগী অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং

প্রধান, দুবাই চিড়িয়াখানা

সংযুক্ত আরব আমীরাত

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANSDOC Library
Accession No.
Date

বাএ ৩৩৬৪

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৩/জানুয়ারি ১৯৮৭। পাণ্ডুলিপি : জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ। প্রকাশক : পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৪০২/মার্চ ১৯৯৬। প্রকাশক : মুহম্মদ নূরুল হুদা, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প] বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : যমুনা প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং কোং, ৮/২ ও, নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা। প্রচ্ছদ : শচীন্দ্রলাল বড়ুয়া। মুদ্রণসংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ১২৫.০০ টাকা মাত্র।

BANGLADESHER BANYAPRANI (Wildlife of Bangladesh) First volume, (Amphibia-Reptilia) written by Dr. Md. Ali Reza Khan [Dubai Zoo, P.O. Box. 67 Dubai, U. A. E.]. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Reprint : March 1996. Price : Tk. 125.00 only.

ISBN .984-07-3373-7

উৎসর্গ

বন্যপ্রাণী এবং আমার মাঝে
যে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে
আমার নিত্যদিনের সেই সঙ্গিনী
নাঙ্কু-কে

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণায় নিয়োজিত বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও বটে। ১৯৫৭ সাল থেকে বাংলা একাডেমী গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একাডেমী এ-যাবৎ প্রায় সাড়ে তিন হাজার গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এই গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ সাধারণ পাঠক ও ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে। পাঠকনন্দিত এইসব বই বাংলা একাডেমী পরিকল্পিতভাবে পুনর্মুদ্রণ করে চলেছে। ১৯৯১ সাল থেকে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের প্রকাশনার যাবতীয় কাজ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প'-এর অধীনে নিষ্পন্ন হয়ে আসছে।

ড. আলী রেজা খান প্রণীত 'বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী', [১ম খণ্ড] প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার কারণে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

এই গ্রন্থ আগেরমতো পাঠকসমাজের চাহিদা পূরণ করবে এই আমাদের বিশ্বাস।

মনসুর মুসা
মহাপরিচালক

BANSDOC Library
Accession No.....

ভূমিকা

বন্যেরা বনে সুন্দর। এটাই স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিক অবস্থা কি আমাদের শস্যশ্যামল সুজলা সুফলা বাংলাদেশে বিরাজ করছে? সম্ভবত সবাই এক বাক্যে বলবেন, না। কারণ কমবেশি আমরা জানি, একদিকে মানুষের সংখ্যা প্রায় অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে ব্যাপকভাবে বন-জঙ্গল, গ্রামীণ ঝোপঝাড়, জলাশয়, বিল-বাওর, হাওর প্রভৃতি হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে নয়তো, পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত হয়েছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির সাথে সাথে গ্রামের ও শহরতলীর চেহারায় আমূল রূপান্তর ঘটেছে। নতুন নতুন রাস্তাঘাট, রেললাইন, জলপথের ব্যাপক ব্যবহার, অপরিকল্পিত রূপরেখার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা শিল্পকারখানার সরাসরি প্রভাব এবং কারখানা নির্গত দূষিত পদার্থ আর সার ও কীটনাশক ওষুধের বেপরোয়া ব্যবহার আমাদের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুরা তাদের মায়ের কোলে বসে না বিশুদ্ধ বাতাস নিতে পারছে, না বন রক্ষা করতে পারছে তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বন্যদেরকে।

দ্রাঘিমা এবং অক্ষরেখার মাঝখানে পড়ায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বেশ কিছুটা সুবিধাজনক। উত্তরে বিশাল ও সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশ। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এদেশে বন্যপ্রাণী বিস্তারে সুবিধা অনেক। এখানো লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে ভিন্ন পরিবেশের অস্তিত্ব আছে। তাই যারা হারিয়ে গেছে তাদের কথা একেবারে বাদ দিলেও, এখনো দেশের সব এলাকাতেই কিছু না কিছু বন্যপ্রাণী আছে।

এই দেশের সর্বত্র বন্যপ্রাণীর যে আনাগোনা, আমরা তার কতটুকু জানি বা চিনি। ছোট সময়ের কথা মনে পড়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষের সিঁড়ি ডিঙ্গাবার মুখে শিক্ষক জিজ্ঞেস করেছিলেন আমরা কয়টি পাখির নাম জানি। আমাদের জবাব ছিল অনেক সেই অনেক কটা? কাক, চুড়ুই, শালিক, চিল, শকুন, ঘুঘু, কবুতর, বুলবুলি, টুনটুনি, মাছরাঙ্গা, প্রভৃতি। শিক্ষক পরে হিসেব করে দেখেছিলেন, সারা ক্লাসের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল মাত্র দশ ধরনের পাখি। আপনি এখনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কটা পাখি চেনেন। মাছ, গাছ আর ফুলের বেলাতেও এমন হতে পারে।

উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী এ চার শ্রেণীর প্রাণী স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীতে। এ চার দলের প্রতিটি। প্রজাতির অবশ্যই বৈজ্ঞানিক নাম রয়েছে। বেশির ভাগের ইংরেজি নামও আছে। নেই কেবল বাংলা নাম। কিছু কিছু প্রাণীর বেশ সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। বেশির ভাগের বাংলা নাম না থাকাটা এদেরকে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছে সেটা বলাই বাহুল্য।

সবচেয়ে বড় কথা বাংলাভাষায় বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর উপর কোনো একক বই আজ পর্যন্ত বেরোয়নি। ইংরেজিতে ছিটেফোটা থাকলেও বাংলার ভাগেই শূন্য। দেশের দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় আমি কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখি। প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন বাংলা একাডেমীর বিজ্ঞান পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ লেখেন। পরবর্তীকালে একাডেমী সাধারণ পাঠকের জন্য কিছু চটি বই বের করেন। কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক এ. কে. এম. আমিনুল হকের লেখা "দোয়েল কোয়েল ময়না" বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে। এ পর্যন্তই। এ বইটিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর এদেশী বিস্তৃতি, স্বভাব, খাদ্যাভ্যাস ও প্রজাতি চেনার উপায় আমি প্রথমবারের মতো বের করার চেষ্টা করেছি। সম্ভবত সে কারণে বইএর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। তবু মাছ বাদে বাকি যে চার শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী এদেশে বিদ্যমান তার সব প্রজাতির বর্ণনা এখানে দেয়া সম্ভব হয়নি। সেটা করতে গেলে হ্যাণ্ড বুক আকারে কয়েক খণ্ড বই রচনা এবং প্রকাশ করা প্রয়োজন। পাঠকের সুবিধের কথা চিন্তা করে এবং ছাপার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বইটি তিন খণ্ডে প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। প্রথম খণ্ডে আছে সূচনা, বন্যপ্রাণীর পরিবেশ, উভয়চর এবং সরীসৃপ প্রাণী। দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে পাখি। তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী, বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ, সংরক্ষণ প্রক্রিয়া এবং পরিশিষ্ট।

বর্তমানে ১৮ প্রজাতির ব্যাঙ, ৮৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩১০ প্রজাতির পাখি এবং ৪৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী নিয়ে এ সিরিজ। বাংলাদেশে পাওয়া যেতে পারে এমন প্রায় ৮৫০ প্রজাতির মধ্যে এ সংখ্যা হচ্ছে ৪৬২ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ। এছাড়াও কিছু কিছু প্রাণী-প্রজাতির কথা কেবল রেফারেন্সের জন্য উল্লেখ করা আছে। মোট ৮৫ প্রজাতির সরীসৃপের মধ্যে ২৫ প্রজাতির কাছিম, কচ্ছপ ও কাইট্রা ; ৩০ প্রজাতির অবিষধর সাপ, ১১ প্রজাতির বিষধর সাপ ; ১৬ প্রজাতির টিকটিকি-গিরগিটি এবং ৩ প্রজাতির কুমীর-ঘড়িয়াল ; ২১০ প্রজাতির অগায়ক পাখি ; ১০০ প্রজাতির গায়ক পাখি ; এবং নেংটী ইঁদুর থেকে হাতি পর্যন্ত ৪৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী আছে। "ওয়াইল্ডলাইফ অফ বাংলাদেশ—এ চেকলিস্ট" বইতে বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন প্রায় সব প্রজাতির উল্লেখ আছে।

এদেশের বন্যপ্রাণীর প্রাচীনতম প্রকাশিত তথ্য এবং বাংলাদেশে পাওয়া গেছে, নিজে সংগ্রহ করেছি বা দেখেছি, অন্যরা সংগ্রহ করেছেন বা দেখেছেন এবং সে সব তথ্য আমাকে জানিয়েছেন বা ছাপিয়েছেন, এমন সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে এখানে প্রজাতির বর্ণনা ও তথ্য পরিবেশিত হলো। এদেশে কি কি কাজ হয়েছে গ্রন্থশেষে প্রদত্ত তথ্যপঞ্জী অংশ দেখলে তা বোঝা যাবে। প্রধান প্রধান কাজের উপর একটি ছোট আলোচনা আমার লেখা "ওয়াইল্ডলাইফ অফ বাংলাদেশ--এ চেকলিস্ট" নামক বইয়ের মুখবন্ধে দিয়েছি। তার পুনরাবৃত্তি এখানে না করাই শ্রেয়।

এশিয়া মহাদেশের প্রথিতযশা অশীতিপর পাখি বিশেষজ্ঞ প্রয়াত ড. সালীম আলীর ছাত্র থাকা কালে তিনি আমাকে বলেছিলেন —"আমি যেন কখনো এ কথা না লিখি যে আমার দেখা পাখিটি উঁচু গাছ বা সবুজ ঘন পাতাযুক্ত গাছের ডালে বসে পূর্ব রাগের পালা সারছিল। অথবা পোকামাকড় ধরে খাচ্ছিল। আমি যেন অবশ্যই লিখি পাখি কোনো প্রজাতির গাছের ডালে বসেছিল।' সেটা ছিল ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস। বোম্বে শহর থেকে ভবিষ্যৎ কাজের অতীত সম্ভার সংগ্রহ করে ব্লাক অ্যান্ড অরেঞ্জ ফ্লাইক্যাচার নামক পাখি সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য নীলগিরি পর্বতমালার ৫৭০০ ফুট উচ্চতার কুনুর নামক শহরতলীতে কেবল তাবু গেঁড়েছি। ঠিক সে সময় মহান সালীম স্যার অমন চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটার উদ্দেশ্য ছিল পাখির উপর কাজ করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি নিতে গিয়ে আমি যেন কিছুতেই পাখির পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ উদ্ভিদকুলকে ভুলে না যাই। তাঁর সে চিঠির উপদেশ আমার মন থেকে কখনো সরেনি। ডিগ্রি লাভের পর দেশে ফিরে প্রথমেই স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বন্যপ্রাণী কোর্সে 'বনাঞ্চল' অন্তর্ভুক্ত করি। এ বইতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক এবং মানুষ কর্তৃক সংযোজিত পরিবেশের প্রধান প্রধান গাছপালা এমনকি হাওর এলাকায় প্রাপ্ত উদ্ভিদের কথাও উল্লেখ করেছি। যাতে করে ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ উদ্ভিদবিদ্যা এবং বন বিভাগের বই না পড়েও বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ অঞ্চল সম্পর্কে জানতে পারে। বইয়ের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বিষয়টির উপর জোর দিয়েছি। সূচনা অধ্যায়ে বন্যপ্রাণী কি, তারও একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে উভচর এবং সরীসৃপ প্রাণীর বর্ণনা, বিস্তৃতি ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের প্রথম ঐ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের সনাক্ত করার মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়েছি। এরপর শ্রেণীর বিভিন্ন বর্গ, উপবর্গ এবং গোত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। গণ এবং প্রজাতি, আর কদাচ উপপ্রজাতির উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। এ সিরিজ মহান সালীম স্যারের "দি বুক অফ ইণ্ডিয়ান বার্ডস" এবং এস. এইচ. প্র্যাটারের "দি বুক অফ ইন্ডিয়ান এনিম্যালস" এর ধারা অনুসরণ করে লেখা ও সাজানো হয়েছে। এ বই দুটি থেকে বহু মূল্যবান তথ্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডের জন্য আমি ঢালাওভাবে গ্রহণ করেছি। এর প্রধান কারণ আমাদের দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাকৃতিক যাদুঘর কেন্দ্রের সংগ্রহে দেশী প্রাণীর নমুনা এতই অপ্রতুল যে তা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত টানা সম্ভব নয়। শচীন্দ্রনাথ মিত্রের 'বাংলার শিকার প্রাণী' বইটি এবং নন্দিতা মুখার্জি অনূদিত সালীম আলী ও লাইক ফতেহ্ আলীর 'কমন বার্ডস' (সাধারণ পাখি) বই থেকে প্রচুর সাহায্য নিয়েছি। এছাড়াও তথ্য নিয়েছি কিং অ্যান্ড ডিকিন্সনের 'এ ফিল্ডগাইড টু দি বার্ডস অফ সাইথ ইস্ট এশিয়া' থেকে। উভচর এবং সরীসৃপ অংশ লেখার জন্য বন্ধুবর রমুলাস হুইটেকারের 'কমন স্নেকস', বোম্বে নেচারাল হিস্ট্রি সোসাইটীর জার্নালে প্রকাশিত ঐ সমিতির কিউরেটর জে. সি. ডানিয়েলের উভচর সংক্রান্ত কটি প্রবন্ধ ; এম. এ. স্মিথের ফোনা অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রেপটিলিয়া' খণ্ডত্রয় এবং পি. সি. এইচ. প্রিচার্ডের 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ টারটলস' বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের একটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর উপর সাম্প্রতিকতম তথ্য সংযোজনের চেষ্টা করেছি। এর জন্য উনবিংশ ও বিংশ শতকের শুরুর দিকে ব্রিটিশ রাজ রচিত জেলা গেজেটিয়ার, বাংলার শিকার প্রাণী, জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, কলিকাতা, প্রকাশিত এবং এর পাখি বিশেষজ্ঞ অজয় কুমার মুখার্জির "এক্সটিংক্ট অ্যান্ড ভ্যানিসিং বার্ডস অ্যান্ড ম্যামালস অফ ইন্ডিয়া" বইয়ের সাহায্য ছিলো অপরিহার্য। বন বিভাগের অভিভক্ত ভারত আমলের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন বনবিভাগের ওয়ার্কিং প্লানেও বন্য প্রাণী সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য আছে। এ ছাড়া অন্ততঃ হাজার খানেক বিভিন্ন পেশার ও বয়োবৃদ্ধ লোকের সাথে বিভিন্ন এলাকার বন্যপ্রাণী নিয়ে আলাপ করে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব লিখতে বেশি বেগ পেতে হয়েছে। এ ধরনের কোনো একটি নির্দিষ্ট বই নেই। চুয়াত্তর থেকে তিরাশি এ এক দশকে যে সব স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সভা সেমিনার এবং ওয়ার্কসপে অংশ গ্রহণ করেছি, সে সবের যে ছাপ মনে রয়েছে—এ অধ্যায় তারই ফল। তবে তুখোর বিলেতী লেখক নরম্যান ম্যায়ারসের 'দি সিঙ্কিং আর্ক' বইটি বেশ সাহায্যে এসেছে।

শেষ খণ্ডের এবং অষ্টম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। প্রথম খণ্ডের প্রথম থেকে তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে কোন রেফারেন্স দেয়া হয়নি। কারণ দুটি। এতে করে বইয়ের গতি মন্থর হত। পাঠক হোঁচট খেতেন। আর ছাত্ররা ভরকে যেতেন। তবে যাঁরা আমাদের বন্যপ্রাণী নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করতে চান তাদের সুবিধার জন্য আমার লেখা "ওয়াইল্ড লাইফ অফ বাংলাদেশ—এ চেকলিস্ট" বই থেকে (যা ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছে) তথ্যপঞ্জী অংশ তুলে দিচ্ছি। এখানে অবশ্য ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধেরও উল্লেখ রয়েছে।

কৃতজ্ঞতা

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী বইটি রচনার জন্য প্রথম অনুপ্রেরণা আসে আমার পরম শিক্ষা গুরু মহান ড. সালীম আলী এবং আমার নেশা-পেশার সাথে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়া আমরা সহধর্মিণী, জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজের প্রাণিবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপিকা নুরুন্নাহার হুদা নাজুর কাছ থেকে। বইচ লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাজু আমাকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিয়ে রেখেছে, যাতে আমি এ কাজে পিছুটান দিতে না পারি। তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের ফলে বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের বনেবাদাড়ে, জলাশয়ে, চরে, দ্বীপে এবং সাগরে ঘুরে বেড়াবার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের গবেষণা তহবিল, বাংলাদেশ-জার্মান উদ্ভিদ সংরক্ষণ প্রকল্প, নিউ ইয়র্ক জুলজিক্যাল সোসাইটি, বিশ্ববন্যপ্রাণী তহবিল (ডব্লিউ. ডব্লিও, এফ)—যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্ববন্যপ্রাণী তহবিল আন্তর্জাতিক (সুইজারল্যান্ড) এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর

কনজারফেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস (আই. ইউ. সি. এন) থেকে পাওয়া অর্থ সাহায্যে আমার ও আমার সাথে গবেষণায় নিয়োজিত বেশ কিছু গবেষকের সহায়ক হয়েছে। সরকারের বন বিভাগের বন প্রহরী থেকে ইন্সপেক্টর জেনারেল পর্যন্ত সকলে বন মন্থনের জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের দুজন চেয়ারম্যান ও চেয়ার উইম্যান এবং খোদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বনে-জঙ্গলে ও দেশী বিদেশী বিভিন্ন সেমিনারে যাবার যে সুযোগ করে দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রবীণতম শিক্ষক, প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন পক্ষীতত্ত্বে আমার হাতে-খড়ি দিয়েছেন। হাতের-খড়িকে লাঠিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব নেন ভারতের জাতীয় অধ্যাপক বিশ্ববিখ্যাত পাখি বিশারদ ড. সালীম আলী। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষক এবং বি. এন. এইচ. এস এর সভাপতি হিসেবে তিনি ঐ সমিতির 'সালীম আলী লোক ওয়ান থো অরনিথোলজিক্যাল রিসার্চ' ফান্ড থেকে পি. এইচ-ডি পাঠ্যক্রমের জন্য আমাকে একটি ফেলোশীপ দেন। সুযোগ দেন তাঁর সান্নিধ্য লাভের। ৮৯ বছরের ড. সালীম আলী সমিতির ছাত্র থাকাকালীন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে রেখেছিলেন। সমিতির কিউরেটর মিঃ জে. সি. ডানিয়েল, সহকারী কিউরেটর ড. রবার্ট বি. গ্রাব, বিজ্ঞানী ড. ভি. এস. ভিজন, মিঃ এস. এ. হোসেন, ড. আর-সুগাধন, ড. প্রিয়দর্শিনী এলিজাবেথ ডেভিডার (প্রিয়া), বোম্বের ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন পি. সি. কানন ও প্রিয়ার বাবা প্রসিদ্ধ প্রকৃতবিদ মিঃ ই. আর. সি. ডেভিডার অনেকটা হাতে ধরে ভারতের বিভিন্ন এলাকার বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক এবং আমাদের সুসং দুর্গাপুরের প্রাক্তন জমিদার বংশীয় ড. ডি. কে. লাহিড়ী চৌধুরী সমগ্র শালবন ও হাওর অঞ্চলের ১৯৪৫ পূর্ব সালের এদেশীয় বন্যপ্রাণীর বিশদ বর্ণনা দেন। পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে আমি সাহায্যকারী বই ও জার্নাল বা বিদেশে প্রকাশিত বাংলাদেশী বন্যপ্রাণীর উপর প্রবন্ধের ফটো কপি পেয়েছি। এ ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। এরা হচ্ছেন ড. (মিস) ফেইথ. টি. কাম্পবেল, নেচরাল রির্সোসেস ডিফেন্স কাউন্সিল ; ড. রাসেল মিটারম্যায়ার, চেয়ারম্যান, আই. ইউ. সি. এন. প্রাইমেট বিশষজ্ঞ দল ; ড. ওয়েন কিং, পরিচালক, ফ্লোরিডা স্টেট মিউজিয়াম ; এডওয়ার্ড ও মল, ইস্ট্যার্ণ ইলিনয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. (মিসেস) শিরলে ম্যাকগ্রিল, ইন্টারন্যাশনাল প্রাইমেট প্রটেকশন লীগ ; ড. কেন, গ্রীন, স্মীথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশন, যুক্তরাষ্ট্র ; ড. ডেবিড জে. চিভারস ও ড. আর. সি. ডি. অলিভিয়ার, কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় ; প্রফেসর হুরেল ব্রুক, ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় ; ড. ব্রায়ান গ্রুমব্রীজ, মিস জেনি থর্নব্যাক, মিসেস গিলমার এবং ড. মাইকেল কাভানাগ, স্পিসীস কনজারভেশন মনিটারিং ইউনিট, কেমব্রীজ ; আই. ইউ. সি এন.-এর স্পীসিস সারভাইবাল কমিশনের এক্সিকিউটিভ অফিসার মি. রবার্ট স্কট ; কমিশনের ক্যাট স্পেশিয়ালিস্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মিঃ পিটার জ্যাকসন, হাতি গ্রুপের

চেয়ারম্যান মিঃ জে. সি. ডানিয়েল, সাপ গ্রুপের চেয়ারম্যান রমুলাস হুইটেকার এবং শূকর গ্রুপের চেয়াম্যান ড. এল, আর. অলিভার, চ্যানেল আইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ; প্রফেসর মাধব গেডগীল, সেন্টার ফর থিয়োরেটিক্যাল স্টাডিজ, বাঙ্গালোর, ভূপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কৃষ্ণকান্ত তেওয়ারী, জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তদানিন্তন পরিচালক ড. বি. কে. টিকাদার, উপপরিচালক ড. বিশ্বময় বিশ্বাস এবং ড. অজয় কুমার মুখার্জী।

বাংলাদেশের বনে-জঙ্গলে ঘুরার সময় আমার কয়েকজন ছাত্র সবসময় ছায়ার মতোন আমাকে অনুসরণ করেছে এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছে। এদের মধ্যে সর্বজনাব ড. ফরীদ আহসান (সহকারী অধ্যাপক প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) ; মোঃ নজরুল হক (সহকারী কীপার, জাতীয় যাদুঘর), ড. আনোয়ারুল ইসলাম (অধ্যাপক, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়), মোঃ আব্দুল ওয়াহাব (প্রভাষক, আদর্শ কলেজ,ঢাকা) ; আবদুল মান্নান (অফিসার, জনতা ব্যাঙ্ক) ; মোঃ নিয়াজ আহমেদ, মোঃ ফয়েজদ্দিন এবং মোখলেসুর রহমান (রিসার্চ অফিসার, ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট)।

বাংলাদেশ রাইফেলস-এর কয়েকটি সীমান্ত চৌকির জোয়ানরা জামালপুর, মোমেনশাহী, সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বান্দরবন, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম, দিনাজপুর এবং রাজশাহীতে আমাকে এবং আমারই কাজের জন্য মোঃ ফরীদ আহসানকে যে সাহায্য করেছেন তা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। বইটি লেখা এবং প্রকাশের বিভিন্ন স্তরে যাদের সান্নিধ্য পেয়েছি তাদের সবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনে এলে বই রচনা ও প্রকাশ সার্থক ও সফল হবে। ভবিষ্যতে এর পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের ধারণা থাকলো।

বইটির রচনাকাল ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১। প্রথমে এটা ছাপার কথা ছিলো একটি প্রকাশনা সংস্থার। সেখানে বছর খানেক পড়ে থাকার পর এটা ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশনার জন্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন স্তরে বইটি পড়ে থাকার ফলে ১৯৯৩ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশে ও বিদেশে যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার সব বইতে সংযোজন সম্ভব হয় নি। তবে এ নব্বুই দশকের বেশ কিছু নতুন তথ্য যোগ হলো।

রেজা খান

প্রধান, দুবাই চিড়িয়াখানা
পো: অ. বক্স-৬৭ দুবাই
সংযুক্ত আরব আমিরাত

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় বন্যপ্রাণী ১
বন্যপ্রাণীরা কোথায় থাকে ৩
পাতাঝরা বন ৪
চিরসবুজ বন ৫
সুন্দর বন ৮
চকোরিয়া সুন্দরবন ১৭
দ্বীপাঞ্চলের ম্যানগ্রোভ বন ১৮
গ্রামীণ বন ২০
জলাভূমির বন। ২১

দ্বিতীয় অধ্যায় : উভচর প্রাণী ২২
খসখসে ব্যাঙ ২৪
মাইক্রোহাইলিডী ৩৬
রেনিডী–মসৃণ ব্যাঙ ৩৭
র‍্যাকোফোরিডী : গোছো ব্যাঙ। ৪১

তৃতীয় অধ্যায় :সরীসৃপ প্রাণী ৪২
কাছিম বর্গ ৪৪
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৪৪
বাংলাদেশী কাছিম ৪৫
ইমাইডিডি : কাইট্টা ৪৭
কালি কাইট্টা ৪৮
বড় কেঠো ৫৭
গণ কাইট্টা ৫৭
কড়ি কাইট্টা ৫৮
মাঝারি কাইট্টা ৫৮
ভাইটাল বা স্মিথির কাইট্টা ৫৯
বড় কাইট্টা ৫৯
আদি কড়ি কাইট্টা ৬০
সিলেটি কড়ি কাইট্টা ৬০
শীলা কচ্ছপ ৬০
ডিবা কচ্ছপ কাছিম ৬১
হলদে কাইট্ট ৬২
মগম বা কালো কাইট্টা ৬২
টেস্টুডিনিডী ৬২
পাহাড়ি কচ্ছপ ৬৩
হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ ৭২
ট্রাইওনিকিডী কাছিম ৭২
সুদী বা চিতি কাছিম ৭২
খালুয়া বা গঙ্গা কাছিম ৭৩
ধুম কাছিম ৭৪
বোস্তামী কাছিম ৭৫
ছিম বা চিত্রা কাছিম ৭৫
জাতা কাছিম ৭৫
সামুদ্রিক কাছিম ৭৫
সামুদ্রিক কাছিমদের
বৈশিষ্ট্য : গোত্র কিলোনিডী ৭৬
সবুজ সামুদ্রিক কাছিম ৭৭
লগারহেড ৭৭
জলপাইরঙ্গা কাছিম বা রীডলের সামুদ্রিক
কাছিম অলিভ রীডলে টারটল ৭৮
হকসবিল টারটল ৭৮
ডারমোকেলিডী এবং প্রজাতি লেদারব্যাক
টারটল ৭৯
কাছিম শিকার এবং নিধন ৭৯
কাছিম রপ্তানি ৮১
কাছিমের হাট ৮১
কাছিম কমার কারণ ৮২
কাছিম রক্ষার উপায় ৮২
টিকটিকি–গিরগিটি ৮৩
টিকটিকি ৮৪
খসখসে টিকটিকি ৮৫
মসৃণ টিকটিকি ৮৬
গোদা টিকটিকি ৮৬
ছোট টিকটিকি ৮৬
তক্ষক ৮৭
গিরগিটি ৮৮
উড়ন্ত টিকটিকি বা ড্রাগন ৮৮
রক্তচোষা ৮৯
ডারডনের গিরাগিটি ৯০
সবুজ গিরগিটি ৯০
আঞ্জন ৯১

গুইসাপ গোত্র ৯২
খাটো পা আঁচিল ৯১
পাহাড়ি আঁচিল ৯২
সাইগো সামা ৯২
সরু অঞ্জন ৯২
সিকিমী অঞ্জন ৯২
কালো গুই ৯৩
সোনাগুই ৯৪
বড়গুই বা রামগদি ৯৪
সাপ ১০৩
সাপের দেহ ১০৩
বাংলাদেশী সাপ ১০৫
অবিষধর সাপ ১০৬
অজগর ১০৭
রেটিকুলেটেড পাইথন ১০৮
শামুকখোর ও ঘরগিন্নী ১০৮
উদয়কল বা কুকরী সাপ ১০৯
কালোমাথা সাপ ১১০
নাট্রিসিডী গোত্র ১১০
লালঢোঁড়া সাপ ১১১
কালোমেটে ঢোঁড়া ১১২
মেটেসাপ ১১২
মাইট্টা সাপ ১১২
রেতি বা আঁচিল সাপ ১১৩
দুধরাজ সাপ ১১৪
দারাজ ধনরাজ ধমন র‍্যাট স্নেক ১১৪
কালনাগিনী বা উড়ন্ত সাপ ১১৫
লাউডগা মুতানলী কমনগ্রীন ভাইন ট্রিস্নেক ১১৬
গোত্র হোমালোপাসিডী ১১৭
বিষধর সাপ ১১৯
বাংলাদেশী বিষধর সাপ ১২০
কালকেউটে ১২২
শাকিনী সাপ ১২৩
প্রবাল সাপ ১২৪
গোখরা ১২৫
শঙ্খচূড় ১২৮
সামুদ্রিক সাপ ১২৯
চন্দ্রবোরা গোত্র ১৩১
চন্দ্রবোরা ১৩২
সবুজবোরা ১৩৩
কিংবদন্তির নায়ক সাপ ১৩৪
প্রচলিত ধারণা ১৩৪
সাপের মণি ১৩৫
দুধ পান ১৩৫
প্রতিহিংসা ১৩৭
জিহ্বা দিয়ে শ্রবণ ১৩৭
লেজ দিয়ে আঘাত ১৩৮
দুমুখো সাপের কয় মুখ ১৩৮
বাঁশীর সুরে মোহিত সাপ ১৩৯
শিকড় তাবিজ দিয়ে সাপ বন্ধকরণ ১৩৯
মৃত সাপ জ্যান্ত সাপ ইত্যাদি ১৪০
সাপের পা ১৪০
প্রশ্বাসে মানুষ গেলা ১৪১
সাপের দৌড়-পাল্লা ১৪১
পিচ্ছিল সাপ ১৪১
সাপ ও নেউলের সম্পর্ক ১৪১
সাপের কামড় ও চিকিৎসা ১৪৩
গোখরার কামড় ১৪৪
কাল কেউটের কামড় ১৪৪
চন্দ্রবোরার কামড় ১৪৫
প্রাথমিক চিকিৎসা ১৪৫
কুমীর ১৪৭
কুমীর চেনার উপায় ১৪৮
পৃথিবীর কুমীর ১৪৮
কুমীরের বর্তমান অবস্থান ১৪৯
দৈর্ঘ্য/বয়স ১৫০
কুমীর শিকার ১৫০
ঘড়িয়ালের কথা ১৫১
ঘড়িয়ালের চারিত্রিক তথ্য ১৫২
স্বভাব ১৫৩
খাবার ১৫৩
প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধি ১৫৪
ঘড়িয়ালের শত্রু ও বিলুপ্তির কারণ ১৫৬
বিলুপ্তি রোধের উপায় ১৬১
গ্রন্থপঞ্জি ১৬২

বন্যপ্রাণী

১মখণ্ড

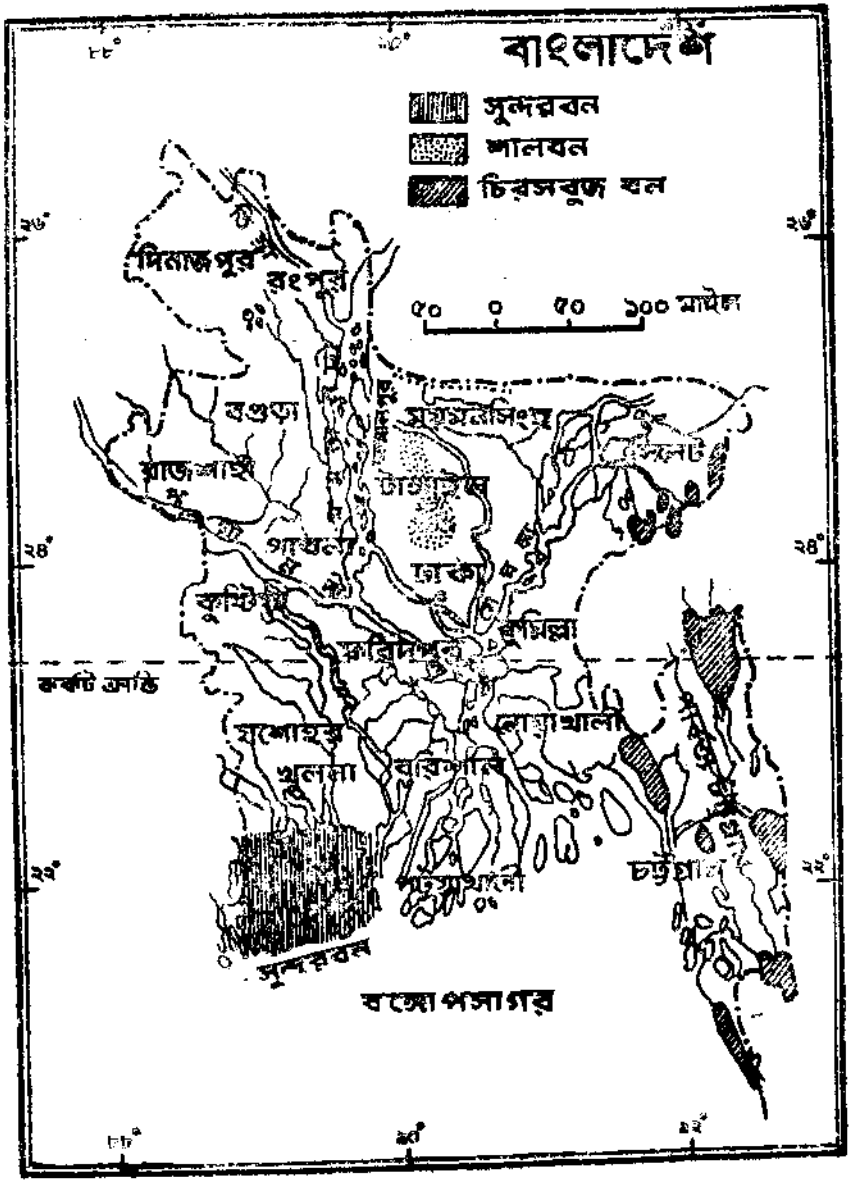
বাংলাদেশ
সুন্দরবন
শালবন
চিরসবুজ বন
৫০ ০ ৫০ ১০০ মাইল
দিনাজপুর
রংপুর
বগুড়া
রাজশাহী
ময়মনসিংহ
সিলেট
টাঙ্গাইল
পাবনা
ঢাকা
কুষ্টিয়া
ফরিদপুর
কুমিল্লা
কর্কট ক্রান্তি
যশোহর
খুলনা
বরিশাল
লোয়াখালী
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম
সুন্দরবন
বঙ্গোপসাগর

প্রথম অধ্যায়

বন্যপ্রাণী

বন্যপ্রাণী বলতে সাধারণত সেসব প্রাণীকে বুঝায় যারা গৃহপালিত নয়, যারা মানুষের উপর কোনোক্রমেই নির্ভরশীল নয়, যারা স্বাধীনভাবে বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় এবং অকৃত্রিম পরিবেশে জীবিকা নির্বাহ ও প্রজনন করার ক্ষমতা রাখে। এসব প্রাণী নিজেরাই আত্মরক্ষার কৌশল রপ্ত করে এবং সকল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সাথে খাপ খাওয়াবার ক্ষমতাও রাখে।

বাংলায় বন্যপ্রাণী শব্দটি এসেছে ইংরেজি wildlife শব্দ থেকে। এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ বাদে কোনো স্থানের সেসব জীব যা মানুষের ছত্রছায়ায় বা তাদের দয়ায় ও আশ্রয়ে লালিত পালিত হয় না। আবার জীব বলতে আমরা প্রাণী এবং উদ্ভিদ বুঝিয়ে থাকি। সে ক্ষেত্রে ওয়াইল্ড লাইফের শব্দার্থ দাঁড়াচ্ছে 'বন্যজীব'। তবে বন্যপ্রাণীর সূত্রটিতে সামান্য পরিমার্জিত করে যদি বলা হয় কোনো এলাকার সকল প্রাণী, (মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণী বাদে) এবং তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, তাহলে বন্যপ্রাণী ও বন্যজীবের মাঝের পার্থক্য যথেষ্ট কমে আসে। কারণ প্রাণ এবং তার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই সকল উদ্ভিদ অন্তর্ভুক্ত হয়।

উপরের যে কোনো সূত্রকেই ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বন্যপ্রাণীর জন্য সঠিক বলে ধরে নিয়ে কাজ করা কঠিন। তাই প্রায়শই বন্যপ্রাণী বলতে কোনো এলাকার মেরুদণ্ডী প্রাণী, বিশেষ করে উভচর থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত চারটি শ্রেণীভুক্ত প্রাণীকে বুঝায়। এ রেওয়াজ চলছে দুনিয়াব্যাপী, আন্তর্জাতিকভাবে এ ধরনের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক সূত্র এজন্য সবাই গ্রহণ করে যে, অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রজাতি সংখ্যা এত বেশি এবং তাদের কোন প্রজাতির সংখ্যা হ্রাস পেল, কিংবা বিলুপ্ত হয়ে গেল তা সহজে বিজ্ঞানীদের নজরে আসে না। কারণ অমেরুদণ্ডী যে কোনো প্রজাতির সদস্য সংখ্যা সত্যই অগণিত। প্রতিদিন এদের দলে নতুন নতুন প্রজাতি সংযোজিত হচ্ছে। হাঙ্গর ও মাছ এ দুটি শ্রেণীও বন্যপ্রাণীর সূত্র থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব। যেহেতু প্রায় প্রতিটি দেশেই মাৎসবিদ্যা একটি প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থকরী বিজ্ঞানের বিষয়। মানুষ তার খাদ্য তালিকায় শূন্যস্থান পূরণের জন্য মাছের চাষ ও সংরক্ষণ-এর দিকে যত্নবান। পৃথিবীর কোথাও এই প্রাণীগুলি উপেক্ষিত নয়; যেমন নয় আমাদের দেশেও।

গবেষণা পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বন্যপ্রাণী বলতে আমরা আমাদের দেশের যে সকল প্রাণী অপেক্ষাকৃত বড়, আকৃতি ও গঠনে দৃষ্টি-আকর্ষ, বিলুপ্ত-প্রায় ও বিরল এবং যা উভচর,

সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং যা মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে বেঁচে আছে এমন সব প্রাণী এবং তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে বুঝতে পারি।

কিছু কিছু বন্যপ্রাণী আমাদের এত কাছাকাছি বাস করে যে তাদেরকে বন্যপ্রাণী হিসেবে ভাবতে প্রায়ই ইচ্ছে করে না। কখনো বা মনে হয় এসব প্রাণী বোধ হয় মানুষের উপর নির্ভরশীল। প্রথমেই ধরা যাক, জালালী কবুতরের কথা। এই কবুতর সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো এরা গৃহপালিত এবং এই কবুতর মানুষের সাহায্য ছাড়া বাঁচবে না। আসলে কি তাই? কোনো দৈব কারণে যদি মানুষের সকল ঘরবাড়ি, দালান কোঠা ধ্বংস হয়ে যায় তবে কি জালালী কবুতর বাঁচবে না?

আপনারা জেনে অবাক হবেন, মানুষ থাকুক আর নাই থাকুক জালালী কবুতর বাঁচবে। জালালী কবুতরের সহজাত প্রবণতা এবং প্রাকৃতিক স্বভাবানুযায়ী এরা প্রকৃতির যে কোনো শস্যদানা খেয়ে জীবন ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। মানুষ উৎপাদিত চাল, গম, যব, বা ডালের এদের কোনো প্রয়াজন হবে না। বুনো ধান, ঘাস, শেয়ালকাঁটা প্রভৃতির দানা ও বীজ কবুতরের প্রাণ রক্ষার জন্য যথেষ্ট হবে। দালান কোঠা না থাকলে জালালী কবুতর যে কোনো পাহাড়ের ঢালের কোনো পাথরের চাইয়ের বা কিছু নুড়ি-পাথরের উপর জড় করা সামান্য কাটি-কুটির মাঝেই ডিম দিতে পারবে, অথবা মানুষের সাহায্য ছাড়া এরা বাঁচতে পারে। পাশের দেশ ভারতের বিভিন্ন পাহাড়ে জালালী কবুতরের মতো রক পিজিয়ন (*Columba leuconota*) বাস করে। প্রকৃতি থেকে খাবার সংগ্রহ করে এবং পাথরের উপর ডিম পেড়ে রক পিজিয়ন দিব্যি বেঁচে আছে।

এবার আসুন চড়ুই পাখির কথায়। কবি আক্ষেপ করে বলেছেন চড়ুই থাকে পরের ঘরে। আবার বাবুই নিজের ঘরে। কবির আক্ষেপ তাঁর কল্পনামাত্র। আসলে চড়ুই মানুষের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে। বহু চড়ুই মানুষের ঘরেদোরে বাস না করে রাস্তার পাশের খাড়া পাড়ে, লতানো গাছের ডাল পালার মাঝে বাসা বানাতে পারে। মঙ্গলা বন্দরের উত্তরে সুন্দরবনে ঢোকার প্রথম প্রবেশ পথ হচ্ছে চাংমারি বন অফিস। এই অফিসের সামনের রয়াল পাম গাছে এবং খেজুর বাগানের প্রায় ছটি খেজুর গাছে চড়ুই পাখির বাসা ছিল। বাসাগুলোতে বাচ্চাও ছিল। প্রথমে আমার নিজের কাছেই অবাক লেগেছিল। পরে অবশ্য মন সব মেনে নিয়েছে। কারণ দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ের গায়ে এবং রাস্তার খাড়া পাড়ে চড়ুইর অনেক বাসাই দেখেছিলাম।

অবাক হবেন না যদি বলি গিরীবাজ বা নোটন পায়রা বন্যপ্রাণী নয়। যেমন বন্যপ্রাণী নয় আমাদের ঘরের সকল রকমের মোরগ-মুরগি, পাতি হাঁস, ছাগল, ভেড়া, কুকুর বিড়াল, গরু-মোষ এবং ঘোড়া। গিরীবাজ বা নোটনদের জন্ম হয়েছে জালালী কবুতর থেকে। এরা মানুষের সাহায্য ছাড়া এক সপ্তাহও বাঁচতে পারবে না। উপরন্তু এদেরকে কয়েক বছর জালালী কবুতরের সাথে প্রজনন করালে এদের বাচ্চারা সবাই জালালী কবুতরের চেহারা ও স্বভাব পাবে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রজাতি হিসাবে গৃহপালিত পশুদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। পোষা প্রাণীদের স্বভাব থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে আত্মরক্ষা,

খাবার সংগ্রহ, বাসস্থান ও প্রজনন ক্ষেত্র নির্বাচনের ক্ষমতা প্রায়ই থাকে না। অথচ চড়ুই, জালালী কবুতর, বন মোরগ প্রভৃতির বেলায় এসব খাটেনা বলেই ঘরের ভিতর বাস করা এসব প্রাণী এবং কোনা ব্যাঙ, নানান টিকটিকি, ও কিছু কিছু সাপ, ইঁদুর, চিকা, চামচিকা এবং কাঠবিড়ালী বন্যপ্রাণীর অন্তর্ভুক্ত।

বন্যপ্রাণীরা কোথায় থাকে

বন্যপ্রাণী কেবল বনে বাস করে এ ধারণা অমূলক। বাসাবাড়ি ও দালান থেকে শুরু করে বন্যপ্রাণী সকল প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করতে পারে। গভীর সমুদ্র থেকে নদীর মোহানা (চিত্র : ১.১) আমাদের বন্যপ্রাণী হাওর-বাওর, বিল ও পুকুর, পাহাড়ি ঝর্ণা, পাহাড়-পর্বত, দ্বীপাঞ্চল, বসতবাড়ি সংলগ্ন ঝোপ-ঝাড় এবং নানান ধরনের বনে বাস করে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতাহেতু এদেশটি বন্যপ্রাণীর জন্য একটি স্বর্গপুরীর মতো। বাংলাদেশের যেসব প্রাকৃতিক পরিবেশে সদাই বন্যপ্রাণী বিচরণ করছে তাদের মধ্যে (১) দেশের কেন্দ্র বিন্দু থেকে উত্তরমুখী পাতাঝরা বন বা শালবন, (২) উত্তর পূর্বাঞ্চলের চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বন, (৩) দক্ষিণ-পশ্চিম কোনের সুন্দরী ও গেয়া গাছ বেষ্টিত সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, (৪) চকোরিয়া সুন্দরবন, (৫) দ্বীপাঞ্চল ও উপকূলবর্তী ম্যানগ্রোভ বন, (৬), গ্রামীণ বন বা ঝোপ ঝাড় এবং (৭) জলাভূমির বন বা গাছপালা অন্যতম।

বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখায় ২০.৩৪° থেকে ২৬.৩৮° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.০১° থেকে ৯২.৪১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে, মোট প্রায় ১৪৩,৯৯৮ বর্গ কিলোমিটার জায়গা আছে। এর মধ্যে ৮৩০০ বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে নদ-নদী ও মোহানাঞ্চল এবং আনুমানিক ২১,৯৫০ বর্গ কিলোমিটার-এ আছে নানান ধরনের বন। সরকারি তথ্য থেকে এ ধারণা পাওয়া গেলেও বনের পরিমাণ এদেশে অনেক কম বলেই বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন এবং বাস্তবেও তাই হবে (মানচিত্র : ১)।

সরকারি বন বিভাগ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বনাঞ্চল নিয়ে সুন্দরবন, ঢাকা, টাঙ্গাইল, মোমেনশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ, ঝুম চাষ এবং ইউ. এস. এফ (আনক্লাসড্ স্টেট ফরেস্ট) বিভাগ গঠন করেছে। জেলাওয়ারীভাবে খুলনা জেলার বন সুন্দরবন বিভাগে, ঢাকার বন ঢাকা, মধুপুর গড় বাদে জেলার সব বন ভূমি নিয়ে টাঙ্গাইল, জামালপুর ও মোমেনশাহী জেলার বন নিয়ে মোমেনশাহী, সিলটে জেলার বন নিয়ে সিলেট, চট্টগ্রাম জেলার বন নিয়ে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার বন বিভাগ, বান্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বনাঞ্চলকে উত্তর, দক্ষিণ, ঝুমচাষ এবং ইউ. এস. এফ. বিভাগে ফেলা হয়েছে।

বন বিভাগ দেশের সব বনাঞ্চলকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে। এগুলো হচ্ছে : রিজার্ভড, অ্যাকুয়ার্ড, প্রটেকটেড, প্রাইভেট, ভেস্টেড, খাস এবং আনক্লাসড্ স্টেট ফরেস্ট। আসলে এসব বন আইনগতভাবে বন বিভাগের নিজস্ব সম্পত্তি, কিম্বা রাজস্ব বিভাগ, জেলা কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি মালিকানায় আছে কিনা তার উপর ভিত্তি করেই এই

শ্রেণীভাগ। উপকূলীয় বন নিয়ে উপকূলীয় বন সার্কেলও রয়েছে বন বিভাগে। ইদানিং তারা গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন প্রকল্পও হাতে নিয়েছেন।

পাতা ঝরা বন

দেশের পাতা ঝরা বনকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। বেশি বৃষ্টিপাতের এলাকায় বনকে আর্দ্র পাতাঝরা এবং অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাতের বনকে শুষ্ক পাতাঝারা বন বলে। রংপুর এবং দিনাজপুর জেলার বিলুপ্তপ্রায় শাল বন শুষ্ক পাতাঝরা বনের আওতাভুক্ত। ঢাকা, টাঙ্গাইল, জামালপুর এবং মোমেনশাহী জেলার শাল ও গজারীবন আর্দ্র পাতাঝরা ধরনের। মধুপুর গড় এবং গজারীবন এদের মধ্যে অন্যতম। এক নম্বর চিত্রে বাংলাদেশের বনাঞ্চল দেখান হয়েছে (চিত্র : ১.২, ১.৩)।

আমাদের শালবন গড়ে সমুদ্র সমতল হতে ১৮ থেকে ২১ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। শালবন এলাকায় বার্ষিক সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রার হেরফের ১২.২° থেকে ২৫.৫° সেন্টিগ্রেড এবং ২৬° থেকে ৩২° সেঃ। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩২২ মিলিমিটার এবং গড় আদ্রতার পরিমাণ ৭৪.৩৮%।

শালবনের উঁচু জায়গা এবং চড়াই-উৎরাইকে 'চালা' বলে। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত সমান্তরাল এবং ঢালু জায়গাকে বলে 'বাইদ'। শাল এবং অপরাপর গাছপালা মূলত চালায় জন্মায়। এক সময় 'বাইদ' এলাকায় ঘাস ও নল খাগড়া হতো। এখন সেখানে ব্যাপকহারে ধানের চাষ করা হয়। চালা প্রতিনিয়ত কেটে সমান করে বাইদে পরিণত করা হচ্ছে। বাইদ চলে যাচ্ছে ব্যক্তি মালিকানায়। ধ্বংস হচ্ছে শালবন।

শালবনের প্রধান প্রধান গাছের প্রজাতিগুলোর নাম এখানে সন্নিবেশিত হলো। বনের শতকরা ৮০ ভাগ জায়গা জুড়ে আছে শাল বা গজারী (*Shorea robusta*) তার সাথে জন্মায় কাইকা (*Adina cordifolia*), শীল কড়ই (*Albizia procera*), সাদা কড়ই (*A. lebbeck*), চাকুয়া কড়ই (*A. chinensis*), কদম (*Anthocephalus chinensis*), কান্তা কড়ই (*Bridelia retusa*), আজুলী (*Dillenia pentagyna*), জারুল (*Lagerstroemia speciosa*), বট (*Ficus bengalensis*), পাকুড় বা অশ্বত্থ (*F religiosa*), জাম (*Syzygium cumini*), বহেরা (*Terminalia bellerica*), হরিতকী (*T. chebula*), ইত্যাদি। এই গাছপালাগুলো বনের উপরিস্তর (overstorey) হিসেবে পরিচিত। এদের ডালপালা জুড়ে হয় একটি চন্দ্রাতপ বা চাঁদোয়া (canopy)। এসব গাছের উচ্চতা সাধারণত ১৩ মিটারের বেশি।

চন্দ্রাতপের নিচে রয়েছে, ৬ থেকে ১২ মিটার উচ্চতার, দ্বিতীয় বা নিম্নস্তর। ছায়া সহ্যকারী এবং দূরে দূরে জন্মানো এ স্তরের গাছের মধ্যে আছে নিম (*Azadirachta indica*), কাঞ্চন (*Bauhinia variegata, Bauhinia cordata*), সোনালো বা বান্দরলাঠি (*Cassia fistula*), মিনজিরী (*C. siamea*), কুম্ভী (*Careya arborea*), আম (*Mangifera indica*), আমরা (*Spondias mangifera*), আমলকী (*Phyllanthus emblica*), সিন্দুরী (*Mallotus philippensis*), অশোক (*Saraca indica*), শেওড়া

(*Streblus asper*), গাব (*Diospyros peregrina*), ঘোড়ানিম (*Garruga pinnata*), ইত্যাদি।

নিম্নস্তর এবং লতানো ও লায়ানার (গাছের মতো মোটা লতা), অন্যতম হচ্ছে লতাসীম (*Spatholobus roxburghii*), গিলা (*Entada pursaetha*), লতাবড়ই (*Zizyphus oenoplia*), কুমারিকা (*Smilax aspera* ও *S. macrophylla*), গাছ আলু (*Dioscorea spp* প্রজাতি), বাবুল (*Acacia nilotica*), রাইটিয়া (*Wrightia tinctoria*), কুচি (*Hollarrhina antidysenterica*), আগাছা (*Microcos paniculata*, ল্যানটানা (*Lantana camara*), আসামলতা (*Eupatorium odoratum*), ইত্যাদি।

চিরসবুজ বন

দেশের পূর্বাঞ্চল, উত্তরে সিলেট থেকে দক্ষিণে চট্টগ্রাম জেলার টেকনাফ অবধি, চিরসবুজ এবং মিশ্র চিরসবুজ বন বিস্তৃত। অবশ্য মধ্যবর্তী কুমিল্লা এবং নোয়াখালী জেলায় এসব বনের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সিলেট, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের আবহাওয়ার যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। সিলেট জেলার পূর্বাংশের পাথারিয়া, হারারগাছ, রাজকান্দি, তারাপ, রঘুনন্দন, কালিঙ্গা এবং পশ্চিম ভানুগাছের টিলায় মিশ্র চির সবুজ বন আছে। যদিও এক সময় জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল বন। জেলার বহু বনভূমি চলে গেছে ১৩৭টি চা বাগানের ৪৩,০০০ হেক্টর জমিতে। এ অঞ্চলে বার্ষিক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যথাক্রমে ৮.৩° থেকে ২৪.৪° সে: এবং ২৭.২° থেকে ৩২.৭° সে:। অবশ্য ভূগোল বিশারদ হারুণ-আর-রাশীদের মতে বালিছড়াতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ০° সে: পর্যন্ত নামতে পারে। বার্ষিক গড় আর্দ্রতা হচ্ছে ৭৯% এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৯৮৭ মিমি।

বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপ মাত্রা হচ্ছে যথাক্রমে ১২.৭° থেকে ২৫° সে: এবং ২৫.৬° থেকে ৩১.৬° সে:। বার্ষিক গড় আর্দ্রতা ৭৭.৯৫%। গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৩০৫০ মিমি। পক্ষান্তরে কক্সবাজারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হচ্ছে ১৩.৩° থেকে ২৪.৪° সে: এবং ২৬.১° থেকে ৩১.১° সে:। বার্ষিক আর্দ্রতার গড় ৭৮.১% এবং বৃষ্টিপাত ৩৫৫৮ মিমি। চট্টগ্রাম বন বিভাগের ভাল বন উত্তরে হাজারীখিল এবং দক্ষিণের চুনতী এবং হারবাং এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কক্সবাজারের ভালো বন দুলাহাজরা, ভূমারীগোনা এবং টেকনাফ এলাকায় বিস্তৃত (চিত্র : ১.৪)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার কেবল উত্তর বন বিভাগের কাসালং রিজার্ভ এবং দক্ষিণ বন বিভাগের রাংকিয়ং এবং সাঙ্গু-মাতা মুহুরী রিজার্ভ সর্বাধিক সুন্দর এবং ভালো চিরসবুজ বন বিদ্যমান। বান্দরবন সহ এ জেলার গড়পরতা তাপমাত্রা ডিসেম্বরে ২৪° সে: এবং মে মাসে ৩৫° সে:। বার্ষিক গড় আর্দ্রতা প্রায় ৮০% এবং বৃষ্টিপাত ২৫৪০ মিমি।

চিরসবুজ বনের স্তরবিন্যাস খুবই স্পষ্ট। বাংলাদেশের চিরসবুজ বনে প্রবেশের মুখে প্রথমে নজরে আসবে প্রায় ৫০ মি: (১৫০ ফুট) উচ্চতার উপরিস্তর। এ স্তরের এক গাছের

ডালপালা অন্য গাছের ডাল পালার সাথে মিশে থাকে না। গাছগুলি কম ঘনত্বেরও বটে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে উপরিস্তরের প্রত্যেকটি গাছ যেনো এক একটা ছাতা (চিত্র : ১.৫)। উপরিস্তরের গাছের ঘনত্ব কম হওয়ায় ওরা কোন নির্দিষ্ট চন্দ্রতাপ সৃষ্টিতে সক্ষম হয় না। ফলে নিচের স্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো প্রবেশ করে। মাটি থেকে গাছের উচ্চতা সাধারণত ৩০ মিঃ থেকে ৫০ মি:। আমাদের চিরসবুজ বনের উপরিস্তরের গাছগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিস্তৃত হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির গর্জন (*Dipterocarpus spp.*) প্রজাতিসমূহ, চাপালিস (*Artocarpus chaplasha*), বুদ্ধ নারিকেল (*Sterculia alata*), সিভিট (*Swintonia floribunda*), চন্দুল (*Tetrameles nudiflora*), তেলশুর (*Hopea odorata*), পিতরাজ (*Aphanamixis polystachya*), শিমুল (*Bombax ceiba*), টুন (*Toona ciliata*), কড়ই (*Albizia spp.*) প্রজাতিসমূহ, বান্দরহোল্লা (*Duabanga grandiflora*) ইত্যাদি। উপরিস্তরের এসব গাছ আসলে পাতাঝরা চিরসবুজ বনের এদের উপস্থিতির দরুন আমাদের বনগুলি মিশ্র চিরসবুজ বন হিসেবে বেশি পরিচিত। অথচ চিরসবুজ বনে যেরূপ কচু জাতীয় উদ্ভিদ, ফার্ন ও ট্রি ফার্ন, ঢেকিশাক, মস ও অরকিডের ব্যাপক সমারোহ থাকা দরকার চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু বনে তেমনটি বিদ্যমান। ভারী লতা ও লায়ানা'র প্রজাতিসমূহের অপ্রতুলতা আফ্রিকার চিরসবুজ বনে টারজানের উল্লুকের মতন ঝুলার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এসব লতা-লায়ানার সাহায্যে টারজান ঝুলে বেড়াত একগাছ থেকে অন্যগাছে (চিত্র : ১.৬, ১.৭ ও ১.৮)।

চিরসবুজ বনের দ্বিতীয় স্তরের গাছের প্রজাতির সংখ্যা অত্যধিক। এই স্তর ১৫ থেকে ৩০ মি: অবধি বিস্তৃত। এরা সবাই প্রায় চিরসবুজ। এই স্তরের নিচে সদাই ছায়াঘন পরিবেশ বিদ্যামান। ফলে এ স্তর একটি নির্দিষ্ট চন্দ্রাতাপ সৃষ্টি করে। যার দরুন খুব সামান্য সূর্যরশ্মি চন্দ্রতাপ ভেদ করে নিচের স্তরগুলিতে পৌছাতে পারে।

দ্বিতীয় বা নিম্ন স্তরের প্রধান প্রধান প্রজাতি হচ্ছে বাটনা (*Quercus spp.*) ও জাম (*Syzygium spp.*) প্রজাতিসমূহ, রাটা (*Amoora wallichi*), তালি (*Palaqium polyanthum*), গুট গুটিমা (*Bursera serrata*), উরিয়াম (*Mangifera longipes*), কনক চাম্পা (*Pterospermum acerifolium*), বট, অশ্বত্থ, জগডুমুর, প্রভৃতি (*Ficus spp*), জলপাই (*Elaeocarpus spp*) প্রজাতিসমূহ এবং রকতন (*Lophopetalum wightianum*)। এদের সাথে জন্মায় লাকুচ বা ডইয়া (*Artocarpus lakoocha*), গামারী (*Gmelina arborea*), গাব (*Diospyros peregrina*), পিটালী (*Trewia polycarpa*), উদাল (*Sterculia villosa*), অর্জুন (*Terminalia arjuna*), বহেরা (*T. bellerica*), হরিতকী (*T. chebula*), মিনজিরী (*Cassia siamea*) এবং অন্যান্য।

তৃতীয় স্তরের গাছগুলোর মধ্যে উপরিস্তর এবং দ্বিতীয় স্তরসমূহের গাছের চারা ব্যাপক হারে বিদ্যমান থাকে। এ স্তরের গাছ ছায়া সহ্যের ক্ষমতা রাখে। এই স্তরকে ট্রান্সগ্রেসিভ (Transgressive storey) স্তরও বলা হয়। সাধারণত মাটির এক মিটার

উচ্চতা থেকে তৃতীয় স্তরের শুরু অর্থাৎ প্রায় ১০ মি: পর্যন্ত বিস্তৃত। কোনো দৈব কারণে উপরের স্তর দুটি নষ্ট হয়ে গেলে ট্রান্সগ্রেসিভ স্তরের গাছপালা অত্যধিক আলোর প্রভাবে অনেক উঁচু হতে পারে। এমনকি কালক্রমে উপরিস্তর অবধি বাড়তে পারে। শত শত বছর পরে এ স্তর উপরিস্তরে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয় স্তরের গাছের অন্যতম হচ্ছে আশোক (*Saraca indica*), সিন্দুরী (*Mallotus philippensis*), মেকরাঙা (*Macaranga spp.*), খোকসা (*Ficus hispida*), গার্সিনিয়া (*Garcinia spp.*), গ্লকিডিয়ন (*Glochidion spp.*), ও জাম (*Syzygium spp.*), প্রজাতিসমূহ, কেসটানপসিস (*Castanopsis indica*), গাম বা বউলাগোটা (*Cordia myxa*), আমলকী (*Phyllanthus emblica*) ও হাড়জোড়া (*Vitex glabrata*)।

তৃতীয় স্তরের নিচে এবং কোনো সময় এই স্তরের জায়গা দখলকারী অথবা মিশ্রভাবে অবস্থানকারী স্তরটি হচ্ছে নিম্নস্তর। এ স্তরে ব্যাপকহারে বাঁশ, বেত ও বহিরাগত (Exotic) সমস্যা সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ দেখা যায়। সিলেট চট্টগ্রাম, বান্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর চিরসবুজ বন এবং এর সাথে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কিছু গর্জনের সাথে মিলিতভাবে বাঁশ বন আছে। বাঁশ এবং বেত ঝাড়ের যেসব প্রজাতি আছে তার মাঝে মুলি (*Melocanna bambusoides*), মিতিঙ্গা (*Bambusa tulda*), পারুয়া (*B. teras*), দারাল বাঁশ (*Melocalamus compactiflorus*), ডলু (*Neohouzeaua dullooa*), ডলুবাঁশ (*Teinostachyum griffithi*), কালি (*Oxytenanthera nigriciliata*), এবং (*O. auriculata*), বড় বাঁশ (*Dendrocalamus longispathus*), গল্লাবেত (*Daemonorops jenkinsianus*), হাইনাবেত (*Calamus latifolius*), সুন্দীবেত (*C. guruba*), সাঁচীবেত (*C. tenuis*)ও বেত (*C. flagellum*) প্রধান। বাঁশ ও বেতবনে, পাহাড়ি ঝর্ণার ও ছড়ার ধারে এবং ছোট ছোট উপত্যকায় প্রচুর জন্মায় জংলী কলা (*Musa spp.*), ল্যানটানা (*Lantana camara*) এবং আসামলতা (*Eupatorium odoratum*), (চিত্র : ১.৯)। শেষের প্রজাতি দু'টি বহিরাগত।

চিরসবুজ বনের আকর্ষণীয় লতাগুল্ম এবং লায়ানার মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃত হচ্ছে টিনোসপোরা (*Tinospora cordifolia*), ভিটিস (*Vitis spp.*) প্রজাতিসমূহ, লতাসিম, গিলা, ডেরিস (*Derris spp.*), কাঞ্চন, বনকলমী (*Imomoea spp.*), ঝুমকোলতা (*Passiftora spp.*) প্রজাতিসমূহ, মুসেন্ডা (*Musanda spp.*) ও কুমারিকা প্রজাতিসমূহ। চিরসবুজ বনের ডালে ডালে ঝুলে থাকা অর্কিডের মধ্যে *Oberonia spp., Vanda spp., Dendrobium spp.,* এবং পরজীবীদের মধ্যে *Viscum spp, Dendropthoe falcata, Loranthus longiflorus* এবং বন লতা (*Mikania cordata*) প্রধান।

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার চিরসবুজ বন ধ্বংস করার ফলে সে সব পাহাড়ি ভূমিতে সাংকোষ বা শন গাছ (*Imperata cylindrica*) এক দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করে রেখেছে। এর সাথে আরো হচ্ছে অপকারী গাছ *Lantana camara, Eupatorium odoratum, Clerodendrum infortunatum, Melastoma* ও *Osbeckia*

প্রজাতিসমূহ। মাঝে মধ্যে আগাছা (*Microcos paniculata*), আজুলী বা হাড়গোজা (*Dillenia pentagyna*), মোজ (*Pterospermum semisagittatum*), উদাল (*Sterculia villosa*), সোনালো, জারুল, কড়ই ও কুম্ভী গাছও এসব ঘাস খেতে গজাতে দেখা যায়। কাপ্তাই কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টির ফলে চিরসবুজ বনের কয়েকশ' বর্গ কিলোমিটারব্যাপী বিশাল বনাঞ্চল ডুবে গেছে। এখানকার কিছু কিছু জলমগ্ন বন এলাকার চিরসবুজ গাছ মরে যাবার পর সেখানে নলখাগড়ার বন গজিয়েছে। এসব বনে কাশ (*Saccharum spontaneum*), খাগড়া (*Phragmites karka*) এবং হোগলা (*Typha elephantina*) জন্মায়। অপরাপর উদ্ভিদের মধ্যে সিটকী (*Phyllanthns reticulatus*), বরুনা (*Crateva nurvala*), হিজল (*Barringtonia racemosa*), পিটালী (*Trewia parviflora*), এবং পানিবাজ (*Salix spp.*), এ ধরনের জলাভূমিতে বেশ ভাল হয় (চিত্র : ১.১০, ১.১১, ১.১২ ও ১.১৩)।

সরকার চিরসবুজ বন কেটে যেসব 'এক প্রজাতি বন' বা মনোকালচার সৃষ্টি করছেন তার মধ্যে সেগুন (*Tectona grandis*), চম্পা (*Michelia champaca*), বিভিন্ন গর্জন (*Dipterocarpus spp.*), ঢাকী জাম (*Syzygium grandis*), রাবার (*Havea brasiliensis*), গামারী (*Gmelina arborea*), তেলশূর (*Hopea odorata*), লোহাকাট (*Xylia spp.*), জারুল (*Lagerstroemia spp.*), চা (*Camellia sinensis*), এবং মালয় দেশীয় অয়েল পাম (*Elaeuis guinensis*) প্রধান।

সুন্দর বন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ জুড়ে যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র এবং চিরসবুজ বন রয়েছে তাকে বলে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে সারা বছর বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকে প্রচুর। বনের মাঝখানটা সদাই থাকে স্যাঁতসেঁতে। জোয়ারের পানি বনের প্রায় সব জায়গা প্রতিদিন বিধৌত করছে। এ বনে সারা দেশ থেকে বয়ে আনা পলি মাটি জমছে তাই বনের জমি কর্দমাক্ত। বনের বেশির ভাগ গাছ শ্বাসমূল (pneumatophore) ও ঠেস মূল যুক্ত। শ্বাস মূলগুলো মাটি ভেদ করে আকাশমুখি থাকে। মাটিতে অতিরিক্ত লবণ এবং পচা জৈব-পদার্থ আছে বলে গাছের জন্য অক্সিজেনের অভাব ঘটে। ফলে গাছ শ্বাসমূলের সাহায্যে বায়বীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে। অনেক গাছের গোড়ায় আবার আলম্ব বা বাটট্রেস (buttress) থাকে। মাটি কাদাযুক্ত হবার দরুন আলম্ব এবং ঠেসমূল গাছের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। প্রধান প্রধান গাছের ফল হয় লম্বা। গাছে থাকা অবস্থাতেই এদের অঙ্কুরোদগম পদ্ধতির শুরু হয়। বীজ হতে ভ্রূণ-মূলটি লম্বা এবং মোটা হয়ে ঝুলতে থাকে। পরে অঙ্কুরটি কাণ্ড হতে ঝরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে মাটিতে গেঁথে যায়। পরে মূল এবং ভ্রূণ-মূল বের হয়। লোনা মাটিতে অঙ্কুরোদগম সম্ভব নয় বলেই এ ব্যবস্থা। এ পদ্ধতিকে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে। কিছু কিছু গাছের ফল নারকেলের মতো শক্ত মোড়কে ঢাকা থাকে। এরা জল বাহিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। হাজার হাজার খাল ও নদী জালের মতন

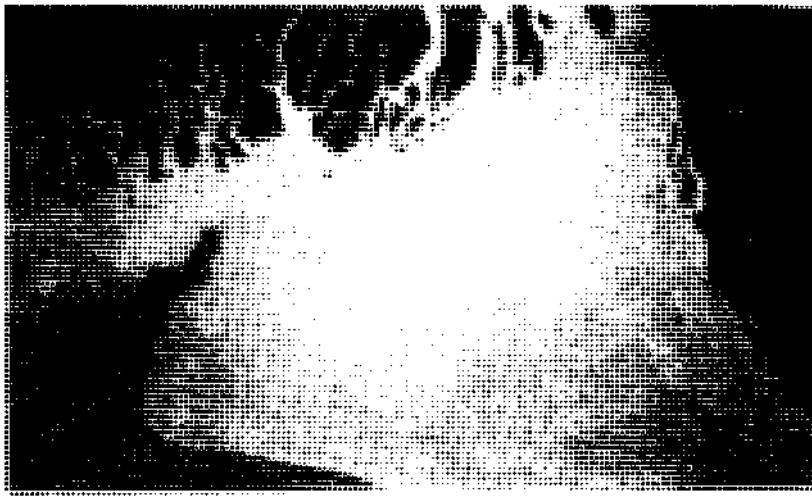

চিত্র ১.১ : বাংলাদেশ সীমানায় বঙ্গোপসাগর এলাকা। সামনের কালো অংশ অতলান্ত সাগর কক্সবাজারস্থ মেরীন ল্যাবের দেয়াল থেকে নেয়া, ১৯৮০

চিত্র ১.২ : শালবন। সামনে বাইদ, মধুপুর, ১৯৭৭

চিত্র ১.৪ : টেকনাফ রেঞ্জের গর্জন বন। ১৯৭৬।

চিত্র ১.৩ : শালবনের বাঁশঝাড়, ১৯৭৬।

চিত্র ১.৫ : চিরসবুজ বনের উপরিস্তর এবং চন্দ্রাতপ পাবলাখালি, ১৯৭৮

চিত্র ১.৬ : চিরসবুজ বনের বৃক্ষ ফার্ন বা ঢেঁকি শাক পাবলাখালি, [illegible]

চিত্র ১.৭ : চিরসবুজ বনের ১৫০ ফুট উঁচু সিভিট গাছ। নিচে দ্বিতীয় স্তরের গাছ-গাছালি। পাবলাখালি।

চিত্র ১.৮ : চিরসবুজ বনের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং নিম্নস্তরের গাছ পাবলাখালি ১৯৮৬

চিত্র ১.৯ : চির সবুজ বনের বাঁশ ঝাড় মাহিল্লা, লংগদু ১৯৭৬।

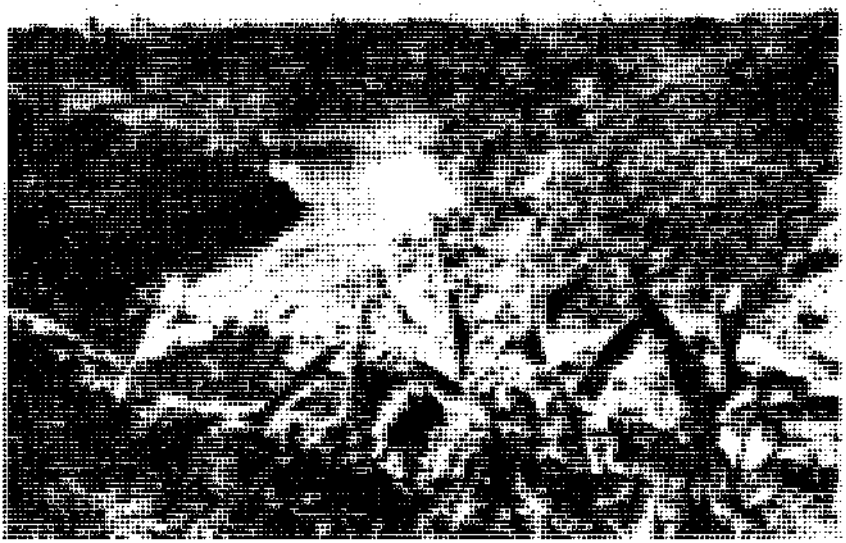

চিত্র ১.১০ : কাপ্তাই হ্রদের পাশের খণ্ডবন। ১৯৭৮

চিত্র ১.১১ : কাপালং নদী তীরের অশ্রেণীভুক্ত বন। ১৯৭৮

চিত্র ১.১২ : কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টির ফলে কয়েকশ বর্গকিলোমিটার চিরসবুজ বন পানিতে ডুবেছে। মৃত গাছের গুড়ি তারই নীরব সাক্ষী। লংগদু, ১৯৭৮।

চিত্র ১.১৩ : কাপ্তাই হ্রদজনিত কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত বনের এক বিশাল গাছ সভ্যতাকে ভ্রূকুটি করছে। মারিস্যা, ১৯৭৮।

চিত্র ১.১৪ : সুন্দরবনের সবচেয়ে উঁচু গেওয়ার নিচে সুন্দরী গাছ। ঢাংমারী, ১৯৮০

চিত্র ১.১৫ : সুন্দরবনে নদীতীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে কাঁশ, হোগলা ও উরিঘাস এবং গোলপাতার ঝোপ। চাঁদপাই, ১৯৮০

চিত্র ১.১৬ : অসংখ্য নৌকা নোঙর পেতেছে সুন্দরবনের নদীতে। উদ্দেশ্য কাঠ কাটা। ঢাংমারী, ১৯৮০

(চিত্র : ১.২০)। এতে পাঁচ মিটার উচ্চতার কোনো গাছ নেই বললেই চলে। আশেপাশের গ্রামের লোকজনরা আদি বন কেটে ফেলেছে। এখন যে কাটা যুক্ত দুর্ভেদ্য উদ্ভিদ জন্মাচ্ছে তার বেশির ভাগই হচ্ছে নুনিয়া কান্তা (*Aegialitis rotundifolia*) এবং চুলিয়াকান্তা (*Dalbergia spinosa*)। মাঝে মাঝে গোরান এবং খর্বাকৃতির কেওরাও দেখা যায়। বন বিভাগ এই বনের বাইরের দিকের অংশে কেওরার চাষ করেছে (চিত্র : ১.২১)।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এক সময় চকোরিয়া সুন্দরবনে বুনো মোষ, সাম্বার হরিণ, চিত্রা হরিণ, শূকর, কাকড়াভুক বানর ও সাধারণ বান্দর, প্রচুর রামগদি বা রিং লিজার্ড এবং লোনা পানির কুমিরের আড্ডাখানা ছিল। বর্তমানে কেবল গুই সাপ, রাম গদি ছাড়া আর কোনো বন্যপ্রাণী নেই। এ বনে অবশ্য ব্যাপকহারে উপকূলবর্তী সাপ (*Cerberus rhynchops*) ও প্রচুর আবাসিক পাখি আছে। শীতকালে অসংখ্য কাদাখোচা, চাপাখি, ঘুঘলি, গুলিন্দা প্রভৃতি পাখিও বনের কাদাযুক্ত মেঝে এবং পলিময় কিনারায় বা নদী খালের পাড়ে ভীড় করে।

চট্টগ্রাম জেলার উখিয়া থানা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত মহা সড়ক এবং নাফ নদীর মধ্যবর্তী কর্দমাক্ত সমভূমি বা মাড ফ্লাটে (*Mud-flat*) চকোরিয়া সুন্দরবনের চেয়ে অনেক ভালো ম্যানগ্রোভ বা ডিয়া দ্বীপ বন আছে। এখানে পাঁচ থেকে দশ মি. উচ্চতার কেওরা এবং বাইন আছে। খর্বাকৃতি হাড়গোজা গাছের ব্যাপকতাও পরিলক্ষিত হয়। গত অর্ধযুগে এই অঞ্চলের উপর সরকারি বনবিভাগের নেক নজর উঠে গেছে। ফলে বন অঞ্চলের অনেক জমি চিংড়ি চাষ প্রজেক্টে রূপান্তরিত হচ্ছে। লোপ পাচ্ছে ১০ মি. উচ্চতার শত বছরের পুরানো কেওরা এবং সেই অর্থে বন। কেবল নাফ নদীতীরের এ বনেই প্যারাইল্লা বা কাকড়াভুক বান্দর পাওয়া যায় (চিত্র : ১.২২ ও ১.২৩)।*

দ্বীপাঞ্চলের ম্যানগ্রোভ বন

বাংলাদেশ ভূসীমানার সবচেয়ে দক্ষিণে, চট্টগ্রাম জেলার টেকনাফ থানার সেন্টমার্টিন্স আইল্যান্ড বা জিনজিরা দ্বীপ। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা সাত-আট বর্গ কিলোমিটারের, দুমাথা মোটা এবং মাঝখান চিকন (ডামবেল) আকৃতির এ-দ্বীপটি প্রবালের তৈরি। দ্বীপের চার পাশে আছে জ্যান্ত প্রবালের কলোনী। সারা দ্বীপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নিশিন্দা (*Vitex nigunda*), লতানো আইপোমিয়া (*Ipomoea pescaprae*) এবং কেওয়া-কান্তার (*Pandanus odoratissimus*) সমারোহ। দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে সামান্য পরিমাণ খর্বাকৃতির অথচ খাঁটি ম্যানগ্রোভ বন আছে (চিত্র : ১.২৪)।

এ-দ্বীপের আড়াই হাজার (বর্তমানে প্রায় ৫০০০) মানুষের শতেকগুণ বেশি আছে জল কবুতর (সীগালস), গাংচিল (টার্ন), অপরাপর শীতের ও আবাসিক পাখি, সামুদ্রিক

---

* চিংড়ি প্রকল্পের অধীনে চলে যাওয়ার ফলে চকোরিয়া সুন্দরবন এবং টেকনাফের নাফ নদীতটের ডিয়াবন উজাড় হয়েছে। প্যারাইল্লা বান্দরও হারিয়ে গেছে।

কাছিম ও ব্যাঙ, টিকটিকি, ডোরা, দারাজ ও গোখরা সাপ এবং রামগদি, চামচিকা, বাদুড় এবং ইঁদুর। এখানে এক প্রকার মিঠা পানির কাছিমও আছে।

সেন্টমার্টিনস দ্বীপ বাদে অপরাপর সব দ্বীপ মূল ভূখণ্ডের কাছকাছি। এ সবের মধ্যে নামকরা হচ্ছে মহেষখালী, কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, চর ওসমান (নিঝুমদ্বীপ), ঢালচর, মৌলবীর চর, রামগতি, চর জব্বার, চর লক্ষ্মী, মনপুড়া এবং চর কুকরী মুকরী। এগুলির মধ্যে কেবল মহেষখালী দ্বীপে পাহাড়ী এলাকা আছে। এসব পাহাড়ে এক সময় চিরসবুজ বন এবং প্রচুর বন্যপ্রাণী ছিল। বনের সাথে সাথে এ দ্বীপ থেকে বন্যপ্রাণী উজাড় করে ফেলা হয়েছে।

সরকার ১৯৬৫–৬৬ থেকে উপকূলবর্তী দ্বীপাঞ্চলে উপকূলীয় বন সৃজনের চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার বন বিভাগের মাধ্যমে ব্যাপকারে উপকূলীয় বন–সৃজনের কাজ চলছে। দ্বীপাঞ্চলে এবং উপকূলীয় বাঁধে মূলত কেওরা, গেওয়া, কাকড়া, সুন্দরী, বাইন, পশুর এবং গড়ান, ও বাবুল এবং খয়ের গাছ লাগানো হচ্ছে। মহেশখালী, সোনাদিয়া, কুতুবদিয়া, চরজব্বার এবং হাতিয়া দ্বীপের পাশের মনুষ্য সৃষ্ট বন দেখতে ভালোই লাগে (চিত্র ১.২৫ ও ১.২৬)। এখানে কোনো স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী নেই। বাসিন্দা পাখির সংখ্যাও খুব কম। সাপ বাদে অন্য কোনো সরীসৃপ নেই বললেই চলে। শীতকালে হাজার হাজার পাখির সমারোহ মন মাতিয়ে রাখে।

উপকূলীয় এবং দূরবর্তী দ্বীপগুলোতে সৃজনকৃত বনে কেবল শীতের পাখি এবং উপকূলীয় সাপের জন্য ভালো পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এসব বন অনেকটা সরকারি ভাবে সৃষ্ট অপরাপর এক–প্রজাতি বনের মতন। উদ্ভিদের প্রজাতি বৈচিত্র্য না থাকার দরুন এসব বন কোনো প্রাণীকে আকর্ষণ করতে পারে না। উপরন্তু এসব গাছপালা আদি বনের গাছ পালার মতো বড় হচ্ছে না। আমি চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার যে বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরেছি, তাতে পাঁচ থেকে সাত মিটার উচ্চতার উপর কোনো কেওরা, বাইন, সুন্দরী বা পশুর আমার নজরে পড়েনি। নব্বুই দশকে মনুষ্যসৃষ্ট এমন অনেক বন নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে ও হচ্ছে।

উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত এবং ভাবাবেগে পরিচালিত বহু সরকারি প্রভাবশালী ব্যক্তি সৃজনকৃত বনে হরিণ, বানর প্রভৃতি ছেড়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কর্ণধার হবার চেষ্টায় রত আছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে, কেওরা বনে বাস না করে হরিণ ও বানর ছুটে যাচ্ছে বনের পাশের ধানি জমিতে। এতে করে বন্যপ্রাণী এবং মানুষের মাঝে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস।

উপকূলীয় এবং দূরবর্তী দ্বীপাঞ্চলের রাজ হাঁস সহ হাজার হাজার শীতের পাখির আনাগোনা হয় দ্বীপের কর্দমাক্ত ও অগ্রসরমান অংশ যাকে ইংরেজিতে বলা হয় মাড–ফ্লাট এবং তীরবর্তী বালুকা বেলায় বা স্যান্ডফ্লাট (sand-flat)। মাড–ফ্লাটে জন্মায় উরী ঘাস বা ধান (*Oryza coarctata*)। এই ঘাস গৃহপালিত গরু–মোষ–ভেড়া–ছাগলকে যেমন

আকর্ষণ করে তেমনি করে বুনো হাঁসকে। এখানে কাদাখোচা পাখিদের সমারোহ ঘটে সবচেয়ে বেশি। মদনটাক, বক, পেলিকেনও এখানে আসে।

গ্রামীণ বন (চিত্র : ১.২৭)

গ্রামীণ বন বলে সত্যিকার অর্থে দেশে কোনো বন নেই। তবে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেও গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়া এবং বাড়ি ঘরের পিছনে বাঁশ ঝাড়, ভিটা বাড়ি বা জঙ্গলে এবং গ্রামের বিস্তীর্ণ জমিতে আম, কাঁঠাল, লিচু, দেবদারু, খেজুর, সুপারি ও নারকেলের বাগান ছিল এবং তার যে ছায়া ঘেরা পরিবেশ ছিল তা যে কোনো মিশ্র শুষ্ক এবং আর্দ্র পাতাঝরা বনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এসব ঝোপঝাড়ে শতাধিক বছর আগে বাঘ পর্যন্ত বাস করত।

এখানো দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সকল জেলা, ঢাকার কিছু কিছু থানা, মোমেনশাহীর প্রত্যন্ত গ্রামে, ফরিদপুর এবং যশোহর জেলাতে বেশ গাছ-গাছড়া আছে। বহু প্রজাতির পাখি, সাপ, ইঁদুর, বাদেও এগুলো শেয়াল, বাগডাসা, খাটাশ, বেজী, বনবিড়াল এবং শশকের আবাসভূমি। গ্রামে গঞ্জের ঝোপঝাড় এবং বাগানের সেরা গাছ হচ্ছে আম (*Mangifera indica*), কাঁঠাল (*Artocarpus heterophyllus*), জাম (*Syzygium cumini*), বহরা বাঁশ (*Dendrocalamus strictus*), ঝাওয়া বাঁশ (*Bambusa arundinacea*), খেজুর (*Phoenix sylvestris*), সুপারি (*Arcea catechu*), নারিকেল (*Cocos nucifera*), তাল (*Borassus flabellifer*), জিওল (*Lannea coromandelica*), পিটালী (*Trewia polycarpa*), বরুনা (*Crateva nurvala*), হিজল (*Barringtonia racemosa*), গাব (*Diospyros peregrina*), সাজিনা (*Moringa oelifera*), কলা (*Musa spp.*) প্রজাতিসমূহ, সিরিষ (*Albizia lebbeck*), কড়ই (*A. procera*), শিলকড়ই (*A. lucida*), রেণ্ডী কড়ই (*Enterolobium saman*), মান্দার (*Erythrina ovalifolia*), সোনালো (*Cassia fistula*), মিনজিরি (*C. siamea*), চিকরাশি (*Chukrasia tabularis*), শিমুল (*Bombax ceiba*), ছাতিম (*Alstonia scholaris*), বাবুল (*Acacia nilotica*), পেয়ারা (*Psidium guajava*), লিচু (*Litchi chinensis*), আমড়া (*Spondias dulcis*), চাইলতা (*Dillenia indica*), বনতেঁতুল (*Pithecellobium dulce*), শিশু (*Dalbergia sisoo*), দেবদারু (*Polyalthia longifolia*), কৃষ্ণচুড়া (*Delonix regia*), রাধাচূড়া (*Caesalpinia pulcherrima*), কামিনী (*Murrya paniculata*), বকফুল (*Sesbania grandiflora*), মেহগনি (*Swietenia mahagoni*), কদম (*Anthocephalus chinensis*), বট (*Ficus bengalensis*), অশ্বত্থ (*F. religiosa*), জগডুমুর (*F. racemosa*), খোকসা (*F. hispida*), জিনাল (*Trema orientalis*), তেঁতুল (*Tamarindus indicus*), অর্জুন (*Terminalia arjuna*), আমলকী (*Phyllanthus emblica*), কামরাঙ্গা (*Averrhoa carambola*), বাজনা (*Zanthoxylum rhetsa*), বকুল (*Mimusops elengi*), কাঞ্চন (*Bauhinia spp.*) প্রজাতিসমূহ এবং পলাশ (*Butea monosperma*)।

জলাভূমির বন (চিত্র : ১.২৮ ও ১.২৯)

জলাভূমি বলতে দেশের বিল বাওর, হাওর, মরা নদীর অংশ এবং বড় বড় দিঘিকে বুঝান হয়। ইংরেজিতে ওয়েটল্যান্ড বলে যে জলজ প্রাকৃতিক পরিবেশকে বুঝানো হয়, বাংলাদেশের জলাভূমি তার সমতুল্য। দেশের হাওর অঞ্চলে ইতোপূর্বে গণ্ডার, বুনো মোষ, শুকুর, হরিণ—সেই সাথে বাঘ এবং লক্ষ লক্ষ বুনো হাঁসের আবাসস্থল ছিলো। সে অবশ্য এক শতাব্দী আগের কথা। এখন সেসব হাওরে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেখা পাওয়া না গেলেও দেড়শ' থেকে দু'শ প্রজাতির পোষ-পাখালি, এক একটির হাজার হাজার পাখি, শীত মৌসুমে নেমে আসে জলাভূমিতে। এ ছাড়াও দেশীয় আবাসিক পাখিদের একটা বড়দল, উদবিড়াল বা ভোঁদর, বেজি ও মেছো বিড়াল বহুলাংশে জলাভূমির খাদ্য শৃঙ্খলের (ফুড চেইন) এবং পরিবেশ পদ্ধতির (ইকোসিস্টেম) অংশ। এছাড়া আছে কয়েক প্রজাতির ব্যাঙ, জলডোরা, ডোরা সাপ, কাছিম এবং গুইসাপ। জলাভূমির গাছ-গাছড়ার মধ্যে অপুষ্পক উদ্ভিদ ব্যাপকহারে বিরাজমান। তার সাথে আছে সপুষ্পক উদ্ভিদের সমারহ। প্রধান প্রধান প্রজাতিগুলো হচ্ছে *Chara, Nitella, Salvinia, Saggitaria, Pistia, Cyperus, Eleocharis, Scripus ariticulatus, Panicum, Hydrilla verticillata, Valisnaria spiralis, Potamogeton crispus, Lemna, Spirodela polyrhiza, Echhonia crassipes, Monochoria, Ipomoea aquatica, Enhydra flactuans, Eclipta alba, Schumannianthus dichotomus, Utricularia stellaris, Nymphaea nouchali* ও *N. Stellatta, Nelumbo nucifera, Euryle ferox, Ludwigia adscendens, Trapa bispinosa, Polygonum,* ইত্যাদি। এসব প্রজাতি হয় পানিতে ভাসে বা ডুবন্ত, অর্ধডুবন্তবস্থায় থাকে। কোনো কোনো প্রজাতি পানি ভেদ করে বেশ কিছুটা উপরে উঠে আসে—যেমন পাটিবেত। জলার ধারের গাছ এবং ঝোপঝাড় সৃষ্টিকারী প্রজাতির অন্যতম হচ্ছে হিজল, পানিবাজ, বরুনা, পিটালী, ছিটকী, খাগড়া, হোগলা, এবং নল (*Thysanolaena maxima* বা *elephantina*)।

গত দশক থেকে রাজশাহীর চলন বিল, ঢাকার আড়িয়াল বিলে এবং মোমেনশাহী, সিলেট জেলার সকল হাওর অঞ্চলে ব্যাপক হারে ইরি ধান ও অপরাপর ফসলের চাষ চলছে। ফলে এসব এলাকার জলাজমির পরিমাণ প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। যার দরুন হাওর ও বিলের বন্যপ্রাণীদের ব্যাপক সমারোহ আর নজরে আসছে না। চাষাবাদ ছাড়াও বিক্ষিপ্ত মৎস্য আহরণ জলাভূমির বন্যপ্রাণীদের উপর নতুন নতুন উপদ্রবের সৃষ্টি করছে। উপরন্ত আছে জাল পেতে অথবা গুলি করে পাখি শিকার। এদের বেশির ভাগই হচ্ছে গুপ্ত শিকারি বা পোচার।

সঠিক পদক্ষেপ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাবস্থাপনা গ্রহণ করা হলে জলাভূমির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সীমিত শিকার এবং সেই সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাষাবাদ ও মৎস্য চাষ সম্ভব হবে বলে বিশ্বাস করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উভচরপ্রাণী

উভচর মানে উভয় স্থানে চরে বেড়ায় এমন প্রাণী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এখানে উভয় স্থান অর্থ হচ্ছে দুটি প্রাকৃতিক পরিবেশ। একটি পানি, অন্যটি ডাঙ্গা। পানিতে বসবাসকারী প্রাণীদের ডাঙ্গা জয় করা এক যুগান্তকারী এবং বৈপ্লবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অভিযোজনের ফল। উভচর প্রাণীরা একান্তভাবে ডাঙ্গায় জীবন যাপন করার ক্ষমতার অধিকারী হয়নি। তাই তারা যে মৎস্যশ্রেণী থেকে আবির্ভূত হয়েছে সেই শ্রেণীর পানিতে বসবাসের বহু অভিযোজন তারা এখনো বয়ে চলেছে। উভচরদের এসব চরিত্রের মধ্যে প্রধান হচ্ছে পানিতে ডিম পাড়া, পানিতে ব্যাঙাচির জন্ম ও পরিবর্ধন, ফুলকার সাহায্যে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণের ব্যবস্থা, পায়ের পাতা চামড়াযুক্ত হয়ে লিপ্তপাদ (Webbed feet) গঠন করেছে। উভচর প্রাণীদের যে চামড়ায় গা মোড়া থাকে তাতে কোনো আঁইস নেই। এমনকি এ চামড়া তেমন পুরুও নয়। ফলে রোদে গেলে উভচরদের চামড়া শুকিয়ে যেতে পারে। তাই উভচর প্রাণী হয় পানিতে নয় স্যাঁতসেঁতে বা অন্ধকার জায়গায় বাস করে। সেখানে এদের দেহের এবং পরিবেশের তাপমাত্রার মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। অবশ্য ডাঙায় হেঁটে বা লাফিয়ে বেড়াবার জন্য যথেষ্ট উপযোগী দু'জোড়া পায়ের সৃষ্টি হয়েছে মাছের বুকের এবং উরুর কাছের পাখনা থেকে। পা বিহীন অথবা কেবল বুকের কাছের এক জোড়া পাখনা বা টিকটিকির মতো লেজ ও পা যুক্ত উভচর প্রাণী আছে। সে সব প্রাণী-প্রজাতি বাংলাদেশে নেই। ডাঙায় থাকবার সময় উভচর প্রাণীরা তাদের ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বসন কাজ চালাতে পারে। তাদের জিহ্বা স্প্রিং-এর মতন সামনে ছুটে গিয়ে ক্ষুদ্র পোকা-মাকড় এবং কখনো বা পাখির ছানা ধরে সোজা পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দিতে পারে। এসবই হচ্ছে ডাঙায় বাস করার অভিযোজন। উভচর প্রাণী Amphibia শ্রেণীভুক্ত।

উভচর প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডে আছে তিনটি প্রকোষ্ঠ-দুটি অলিন্দ এবং একটি নিলয়। ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে বয়ে আনা অক্সিজেন বিহীন ও কার্বন-ডাই অক্সাইডযুক্ত (বিভিন্ন বই-পুস্তকে যাকে ভুল করে দূষিত রক্ত বলা হয়) এবং পালমোনারী শিরার ফুসফুস থেকে বয়ে আনা অক্সিজেন যুক্ত রক্তের (তথাকথিত বিশুদ্ধ রক্ত) মিশ্রণ ঘটে। ফলে সর্বাঙ্গে সমপরিমাণ অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পৌছাতে পারে না। নিলয় সংকুচিত হবার সময় প্রথম দিকে বেরিয়ে আসা যে রক্ত মগজে এবং মথায় যায়

সেই রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। এরপর যে রক্ত বিভিন্ন ধমনীর মাধ্যমে নিলয় থেকে বের হয় তাতে ক্রমাগতভাবে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে। এর পরিণতি হলো এই যে পরিবেশের সাথে নিজের দেহের তাপমাত্রা সার্বিকভাবে বজায় রাখতে ব্যর্থ হয় উভচর প্রাণীরা। এজন্য উভচর প্রাণীদেরকে ভুল করে শীতল রক্তের অধিকারী প্রাণী বলা হয়। আসলে উভচর প্রাণীরা হচ্ছে প্রকৃতির সাথে তাদের দেহের তাপমাত্রার সাম্যাবস্থা বজায় রাখার ক্ষমতা বিহীন প্রাণী। উভচর প্রাণীদের সাথে সাথে পরবর্তী শ্রেণী সরীসৃপ প্রাণীদের দেহেও তাপমাত্রার হেরফের হয় পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার সাথে। কেবল পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যুৎসই চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড রয়েছে। সেজন্য এদের হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেনযুক্ত এবং কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত রক্তের সংমিশ্রণ হয় না। ফলে পায়ের আঙ্গুল থেকে ঠোঁট বা চুলের গোড়া পর্যন্ত একই ধরনের রক্ত সরবরাহ হয়। এতে করে দেহের সঠিক তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত থাকে।

যেহেতু বেশিরভাগ উভচর প্রাণীর ডিমে কাছীম এবং মুরগীর ডিমের মোড়কের মতো ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ স্বচ্ছিদ্র খোসা নেই সেজন্য এদের ডিম ডাঙ্গায় পাড়া সম্ভব হয় না। উভচরদের চামড়া যেমন অধিক তাপে শুকিয়ে যেতে পারে তেমনি এই নরম ডিমগুলো শুকিয়ে যেতে পারে। এর জন্য উভচর প্রাণীরা পানিতে ডিম পাড়তে বাধ্য হয়। হতে পারে সে পানি গাছের কোনো ফোকরে অথবা পাতায় জমে থাকা, বা রাস্তার পাশে সামান্য গর্ত, পুকুর বা বিশাল পুকুর বা বিশাল জলা ভূমিতে। অবশ্য কোনো কোনো প্রজাতি নিজ দেহ থেকে নিশ্রত রসের তৈরি ফেনায় (ফ্রথে) ডিম ছেড়ে দিতে পারে। এই ফ্রথ তরল পদার্থের পরিপূরক পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রায় উভচর প্রাণী ডিমে তা দেয় না বা ডিমের রক্ষণাবেক্ষণ করে না। সেজন্য কতগুলো ডিম থেকে কটা বেঙাচি হবে এবং কটা-বেঙাচি থেকে শেষ অবধি কটা বাচ্চা বড় হতে পারবে তা নিশ্চিত নয় বলে তাদের বংশরক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এরা অসংখ্য ডিম পাড়ে। যেমনটি পাড়ে এক একটি মাছ। ঘটনা এই যে, অতসব ডিমের মধ্যে থেকে কিছু না কিছু বাচ্চা বড় হবেই। তারাই আবার পরের বছর বাচ্চা দেবে। বেশি ডিম বহন করার জন্য উভচর প্রাণীর স্ত্রীগুলো আকারে বা আয়তনে পুরুষ উভচরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ।

কুনো ব্যাঙ এবং কোলাব্যাঙ (ভাউয়া ব্যাঙ) চিনে না বাংলাদেশে এমন লোক খুব কম আছে। এমনকি দেশের শহুরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও এদেরকে চেনে। এ দুটি ব্যাঙই আমাদের প্রধান উভচর প্রাণী। আমাদের দেশে এমন কোনো প্রজাতির প্রাপ্ত বয়স্ক উভচর প্রাণী নেই যাদের দেহ টিকটিকির মতো লম্বা এবং লেজ যুক্ত অথবা সাপের মতো লম্বা এবং পা বিহীন। আমাদের দেশে কত প্রজাতির উভচর আছে তার উপর এ পর্যন্ত কোনো ব্যাপক জরিপ চালানো হয় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেনের অধীনে মুহাম্মদ মজিবুর রহমান নামে একজন ছাত্র বাংলাদেশের এগারোটি উভচর প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ এবং অন্য একটি প্রজাতির দেখার কথা উল্লেখ করে একটি ছোট বৈজ্ঞানিক রচনা বাংলাদেশের প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির মুখপত্র, দেশের প্রাণিবিদ্যার একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রকাশনা, 'বাংলাদেশ জার্নাল অফ জুলজিতে' প্রকাশ করেন। তবে আমি নিজে

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব উভচর প্রজাতি সংগ্রহ করেছি, ডাক শুনেছি এবং অপরাপর বিদেশী বিশেষজ্ঞরা উভচরের ডাক শুনেছেন ; ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে প্রজাতি আসাম, বার্মা এবং পশ্চিমবঙ্গে আছে বলে উল্লেখ রয়েছে তা থেকে আমি ধরে নিয়েছি আমাদের দেশে উনিশ/বিশ প্রজাতির উভচর প্রাণী আছে। এর বিস্তারিত তালিকা আমি প্রকাশ করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত আমার প্রথম বই 'ওয়াইল্ড লাইফ অব বাংলাদেশ : এ চেকলিস্ট' নামক ১৭৩ পৃষ্ঠার বইতে। এখানে প্রত্যেকটি প্রজাতির নাম উল্লেখ না করে যেসব প্রজাতি আমাদের পরিবেশের অংশ হিসেবে বহুদিন থেকে আছে এবং যারা আমাদের অল্প পরিচিত তাদের বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো।

গোত্র : বুফেনিডী (Bufonidae), খসখসে ব্যাঙ

এই গোত্রের প্রজাতিগুলোর গা খসখসে। এরা বছরের দীর্ঘ সময় শীতনিদ্রা* না যেয়েও বসবাস করতে পারে। খসখসে ব্যাঙ সাধারণত ঘরদোরে, বনের কম স্যাঁতসেঁতে জায়গায়, গাছের গুড়ী বা নুড়ি-পাথরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। রাতের বেলায় খাবার সন্ধানে বের হয়। এদের চোয়ালে কোনো ক্ষুদ্র দাঁতের সমাহার নেই। জিহ্বার কোনো ভাগ নেই। এটি কুকুরের জিভের মতো। এদের চোখের তারা আনুভূমিক। এদের প্রত্যেকের চোখের পিছনে এবং কানের উপর প্রত্যেক পাশে একটি করে প্যারটিড গ্রন্থি আছে।

খসখসে ব্যাঙ-এর দুটি প্রজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যেতে পারে। এদের একটি আমাদের অতি পরিচিত কুনো ব্যাঙ। অপরটি গেছো খসখসে ব্যাঙ* (*Nectophryne*

---

* শীতনিদ্রা : ইংরেজি হাইবারনেশন শব্দটির বাংলা করা হয়েছে শীতনিদ্রা বা শীতকালীন ঘুম। আর ঘুম হচ্ছে শারীরবৃত্তীয় বিশ্রাম অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ এবং প্রণালিসমূহের কাজ এ সময় অপেক্ষাকৃত কম হয়। এ অধ্যায়ের শুরুতে বলেছি উভচরে এবং সরীসৃপ প্রাণীরা পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার সাথে নিজ দেহের তাপ স্থিতাবস্থায় রাখতে পারে না। ফলে এদেরকে বছরের বহু সময় চুপচাপ বা অনড় হয়ে পড়ে থাকতে হয়। কেউ কেউ আবার দিনে রোদ পোহায়। রাতে কাঠের ফোকরে, ইটের ফাঁকে বা ডাল পালার আড়ালে এমনভাবে লুকিয়ে বা মরার মতো পড়ে থাকবে যে শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বজায় রাখতে সবচেয়ে কম পরিমাণ অক্সিজেন ব্যয় হয়। ব্যাঙের পক্ষে এ কাজটি সম্ভব হয় না। কারণ ওরা নিশাচর প্রাণী। আর রাতেই শীতের প্রকোপ বেশি। কাজেই উভচর প্রাণী বাধ্য হয়ে সারা শীতের মাস এমন সব গর্ত, ঘরের ভিতরের অন্ধকার এবং কম বাতাসযুক্ত অংশ, রান্না ঘরের মিটসেফের আড়ালে, পাথরের ফোকরে ঢুকে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকে যে শরীরের শারীরবৃত্তীয় কাজ সর্বনিম্নে নেমে আসে। নড়াচড়া ও চলাফেরা না করার জন্য অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। কোনো রকম প্রাণে বাঁচার জন্য যে পরিমাণ শক্তি দরকার হয় তা আসে চামড়ার নিচে রক্ষিত চর্বি বা (subcutaneous fat) থেকে। শীতের শেষে পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে ব্যাঙের শরীরে এক ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হয় এবং তাদের শীতনিদ্রা ভেংগে যায়।

সরীসৃপদের কিছু প্রজাতি পাখির এক-দুটি এবং স্তন্যপায়ীদের এক-দুটি প্রজাতি স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন শীতনিদ্রা যেতে পারে। তবে বাংলাদেশে এমন কোনো পাখি বা স্তন্যপায়ী নেই।

* মোটা দাগ চিহ্নিত নাম ও তথ্য আমার ব্যক্তিগত।

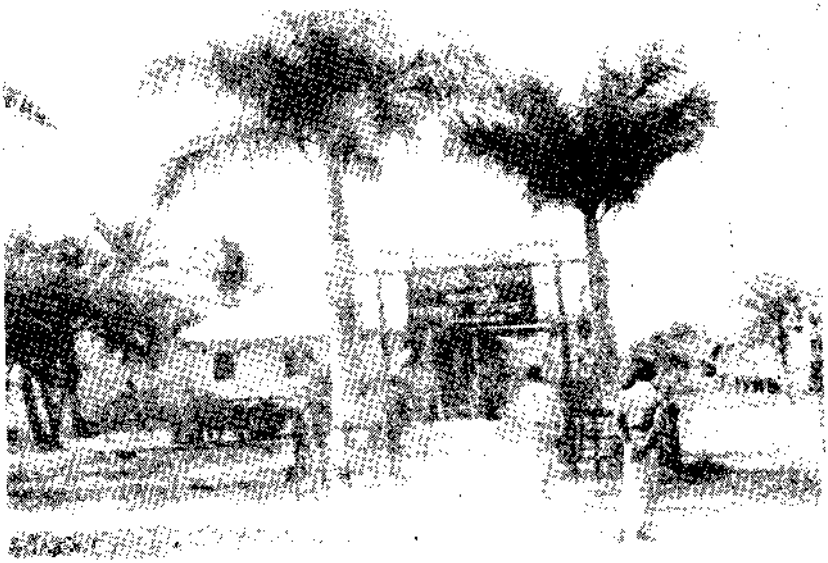

চিত্র ১.১৭ : সুন্দরবনে ঢোকার প্রবেশ দ্বার টাংমারী, ১৯৮০।

চিত্র ১.১৮ : সুন্দরবনের হেঁতাল গাছ। পোড়ামাটি, ১৯৮০।

চিত্র ১.১৯ : সুন্দরবনের বলা গাছ খাদরামারী, ১৯৮০।

চিত্র ১.২০ : আকাশ থেকে উপকূলীয় বন। কুতুবদিয়া, ১৯৮০।

চিত্র ১.২১ : আকাশ থেকে চকোরিয়া সুন্দরবন, ১৯৮০।

চিত্র ১.২২ : বনের মেঝে ফুটো করেছে শ্বাসমূল। চাকরিয়া সুন্দরবন, ১৯৮৩।

চিত্র ১.২৩ : বনবিভাগের চাষ করা নাফ–নদী তীরের কেউরা বন। টেকনাফ, ১৯৭৯।

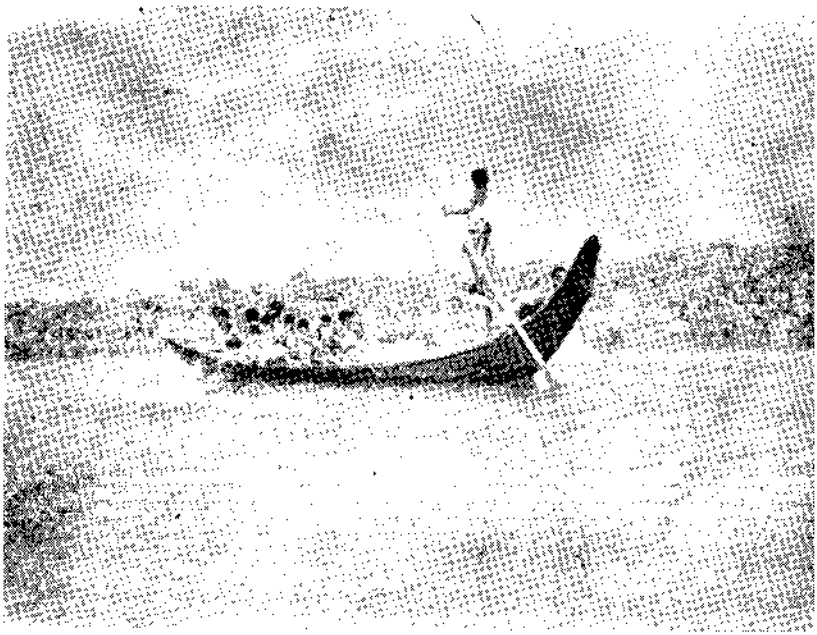

চিত্র ১.২৪ : দ্বীপাঞ্চলের ম্যানগ্রোভ বন। ঘটিভাঙ্গা সোনাদিয়া, ১৯৮১।

চিত্র ১.২৫ : নাফ নদী-তীরে হারগোছা বন। মোষের পিঠে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণে গো-বক। ওয়াইকং, ১৯৮২।

চিত্র ১.২৬ : নাফ নদীর জলিরডিয়া দ্বীপ। এ দ্বীপে এখন আর কোনো বন নেই। টেকনাফ, ১৯৮৩।

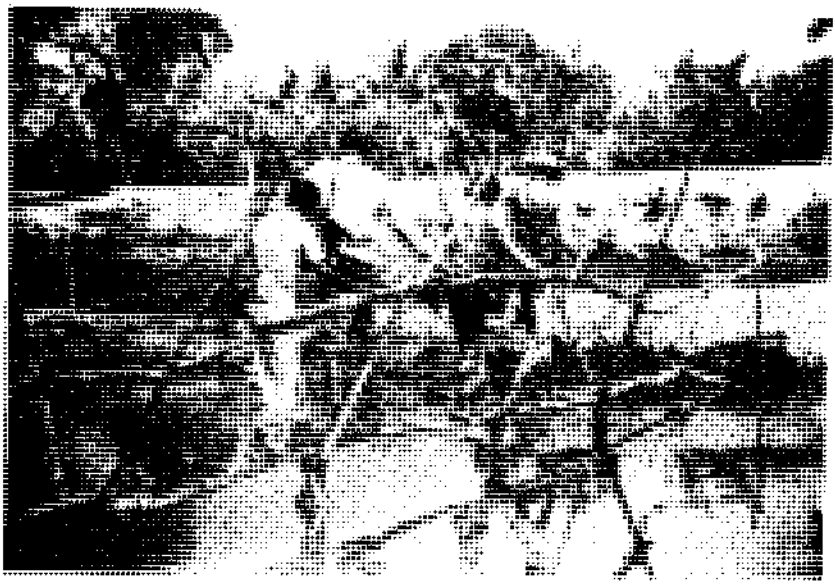

চিত্র ১.২৭ : গ্রামীণ বন। বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, মে ১৯৭৯।

চিত্র ১.২৯ : হাওরে গজার মাছ।

চিত্র ১.২৮ : হাওর এলাকা।

চিত্র ২.১ : কুনো ব্যাঙ Bufo melanostictus.

চিত্র ২.২ : বেলুন ব্যাঙ Uperodon globulosum. মধুপুর বন, ১৯৮৩

চিত্র ২.৩ : ভেঁপুব্যাঙ Kaloula pulchra. হ্লীলা, টেকনাফ, ১৯৭৯।

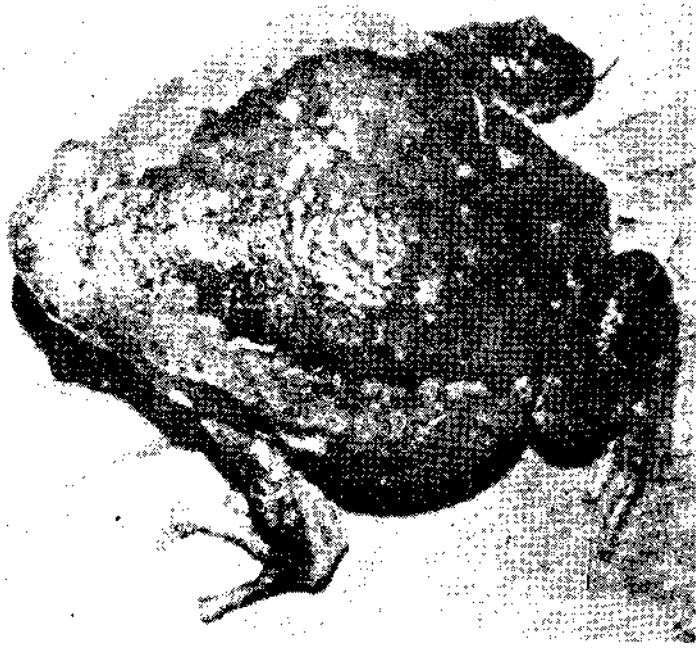

চিত্র ২.৪ : কট্‌কটি ব্যাঙ Rana cyanophlyctis.

চিত্র ২.৭ : গেছো ব্যাঙ Rana temporalis.

চিত্র ২.৫ : কোলা ব্যাঙ Rana tigerina.

kempi)। এ ব্যাঙ এখনো আমি নিজে দেখিনি বা দেশের অন্য কেউ দেখেনি। গেছো খসখসে ব্যাঙ সিলেট জেলাতে পাওয়া যেতে পারে।

নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র থেকে শুরু করে প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, প্রকৌশলী এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল পণ্ডিত প্রথম যে মেরুদণ্ডী প্রাণীর উপর কাঁচি চালিয়েছেন সেটি কুনো ব্যাঙ (*Bufo melanostictus*)। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ ব্যাঙ আত্মাহুতি দেয় আমাদের দেশের গবেষণাগারে। একটি কুনো ব্যাঙ সর্বাধিক একশ পঞ্চাশ মিলিমিটার অবধি লম্বা হতে পারে। এই মাপ মাথার অগ্রভাগ থেকে পিঠ যেখানে অবসারণী ছিদ্রে শেষ হয়েছে সেই পর্যন্ত ধরা হয়। (চিত্র : ২.১ ও ২.২)

কুনো ব্যাঙ জানুয়ারি মাসের শেষ থেকে অক্টোবর মাস অবধি দেশের যে কোনো এলাকায় পাওয়া যেতে পারে। কেবল সমুদ্র সৈকতে দেখা নাও যেতে পারে। তবে সুন্দরবনের আধা লোনা পানির পাড়ে কুনো ব্যাঙ বসে থাকতে দেখেছি। জোয়ারের সময়কার হাল্কা ঢেউ ওদের গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যেত। অবাক হয়েছি কি করে কুনো ব্যাঙ ঐ লবণাক্ততা সহ্য করেছে। কারণ সাধারণ নিয়মে অশ্রাবণ প্রক্রিয়ায় এদের চামড়া ভেদ করে পানির লবণ রক্তপ্রবাহে চলে যাবার কথা।

কুনো ব্যাঙ শতকরা একশ ভাগ মাংসাশী বা কীট পতঙ্গ ভুক প্রাণী। ঘরের ভিতরের তেলাপোকা, মশা, মাকড়সা থেকে শুরু করে ওদের চোখের সামনে আসা যে কোনো প্রাণী, আর লম্বা করে ছুড়ে মারা গোটানো জীবের চৌহুদ্দির মধ্যে পড়া যে কোনো প্রাণী এদের খাদ্য তালিকার সিংহভাগ পূরণ করে। ব্যাঙাচি অবশ্য সবুজ শেওলা ও অপরাপর নরম উদ্ভিদ খেয়ে জীবন ধারণ করে। প্রকৃতির এ নিয়মের ফলে উভচর প্রাণী দুটি খাদ্য শৃঙ্খলের (ফুড চেইন) এবং দুটি পরিবেশ পদ্ধতির (ইকোসিস্টেম Ecosystem) অংশ হিসেবে কাজ করছে। এতে করে ডাঙ্গার খাবার পানিতে এবং পানির খাবার ডাঙ্গায় পৌছে অজৈব এবং জৈব দ্রব্যকে দুটি পরিবেশের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে সরাসরি সাহায্য করছে।

কুনো ব্যাঙের,—সেই সাথে বেশিরভাগ উভচর প্রাণীর, প্রজনন চক্র বেশ চমকপ্রদ। চাষী এবং গাঁয়ের লোক ব্যাঙের ডাকাডাকি শুনে প্রায়শই বলে বৃষ্টি হবে কি হবে না। ইদানিং পত্র পত্রিকায় লিখছে এই কারণেই নাকি অনেক গ্রামবাসী তাদের গ্রাম থেকে ব্যাঙ ধরতে দিচ্ছে না। এর পেছনে কিছুটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে বৈকি।

প্রাণিজগতের বেশির ভাগ প্রাণী প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট তাপ মাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণকে প্রজননের জন্য "উদ্দীপক" হিসেবে নিয়ে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। এ দুটি ভৌত উদ্দীপক যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাপে বৃষ্টি বহুল অঞ্চলে উপস্থিত হয় তবে সেখানে তখনি বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যায়। বিগত ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বলা নেই কওয়া নেই গাদা গাদা কুনো ব্যাঙ হাজির হলো গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের পুকুরে। তারা ডিম দিল সেখানে। প্রজনন শুরু হলো। পরে আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া তাপ মাত্রা এবং বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ নিয়ে দেখলাম ফেব্রুয়ারি মাসের ঐ নির্দিষ্ট দিনটিতে তাপমাত্রা এবং আদ্রতা ছিল '৭৭ এর অক্টোবর থেকে '৭৮ এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে সর্বাধিক। তবে সেদিন বৃষ্টি হয় নি, যদিও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। এ

থেকে ভ্রম'র ধারণা হয়েছে চাষীরা ব্যাঙের ডাকাডাকি থেকে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনার যে পূর্বাভাস দেয় তা কৃষকের প্রকৃতির প্রতি গভীর অভিনিবেশের পরিচয় প্রদান করে।

কুনো ব্যাঙের প্রজননের সঠিক দিন তারিখ নেই বললেই চলে। ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রায় সব মাসেই এরা প্রজননের জন্য প্রস্তুত থাকে। অনাবৃষ্টির বছরে প্রজনন কম হয়। অতি বৃষ্টিতে প্রজনন হয় বেশি।

সব উভচরের কেবল পুরুষ ব্যাঙ ডাকাডাকি করে, স্ত্রীরা নীরব। কপাল ভালো নচেৎ মুখরা রমণীর অত্যাচারে বেচারা নাটা পুরুষ ব্যাঙের প্রাণান্তর হতো। পুরুষ কুনো ব্যাঙের থুতনিতে বেশ বড় কালো স্বরথলি (ভোকাল স্যাক) আছে। ফুসফুস থেকে বাতাস ঐ থলি হয়ে যখন মুখ দিয়ে জোরে বের হয় তখন কুরকুর ধ্বনি আমরা শুনতে পাই যা স্ত্রী ব্যাঙের কাছে প্রিয়তমের বাঁশীর সুরের মতন লাগে। এতে করে স্ত্রী ব্যাঙের প্রজনন উন্মাদনা জেগে উঠে। অবশ্য স্বর কত সুন্দর বা উঁচু হবে, কত তাড়াতাড়ি প্রতিটি কুরকুর শব্দ বেরুবে তার উপর নির্ভর করবে কোনো স্ত্রী ব্যাঙ আকৃষ্ট হবে কি না ; অথবা তাদের দেহে কামউন্মাদনা জাগবে কি না।

স্বরথলির সাথে সাথে পুরুষ ব্যাঙের তালুতে বুড়ো আঙ্গুলের গোড়ায় কালো নরম গদীর মতো আস্তরণ দেখা যায়। এসবকে বলে নুপশিয়াল প্যাড (Nuptial pad) বা বিয়ের পোষাক। সাধারণত প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের দেহেই বিয়ের পোষাক থাকে।

বৃষ্টি থাকলে দিনের যে কোনো সময় আর বৃষ্টি হবে হবে করলে সন্ধ্যা নাগাদ পুরুষ বেরিয়ে আসবে তার দিন যাপনের আস্তানা থেকে। গায়ে প্রজননোপযোগী পরিবেশের স্পর্শ লাগার সাথে সাথে সে ডেকে উঠবে। আস্তে আস্তে পুরুষ এগুতে থাকবে পানি ধরে রাখা যে কোনো জায়গার দিকে। পানির ধারে বসে তার ডাক উঠবে তুঙ্গে। তখন দেখা যাবে আরো পুরুষ এবং স্ত্রী ভীড় করেছে পানির ধারে। ভারী শরীর এবং স্বরথলী বিহীন সব উভচরই যে স্ত্রী ব্যাঙ এটা বুঝতে পুরুষ ব্যাঙের কষ্ট হয় না। ধারে কাছের যে কোনো একটা স্ত্রীকে ধরতে পারলেই হলো। এই জড়াজড়ি অবস্থায় একটি পুরুষ ও স্ত্রী ব্যাঙ কয়েক ঘণ্টা থেকে দিন দুয়েক পর্যন্ত পানিতে থাকতে পারে।

পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রী ব্যাঙের পিঠে চেপে তার সামনের পা স্ত্রীর সামনের পায়ের এবং দেহের মাঝখান দিয়ে চালিয়ে স্ত্রীকে চিমটার মতো চেপে ধরবে। ফলে স্ত্রী ব্যাঙ আর কিছুতেই পিঠের পুরুষকে লাথি মেরে ফেলে দেবার ক্ষমতায় থাকবে না। পিঠের উপর বসা পুরুষ, পেট ও পায়ের মাঝে পুরুষের পা, পরিবেশের তাপ মাত্রা এবং পানির তাপমাত্রায় মিলিত উদ্দীপনা স্ত্রী ব্যাঙকে ডিম ছাড়ার অনুপ্রেরণা দেয়। স্ত্রীর অবসারণী ছিদ্র (*Cloaca*), দিয়ে ডিম বেরিয়ে আসার সাথে সাথে পুরুষের অবসারণী দিয়ে শুক্রকীট বেরিয়ে আসে। উভয়ের মিলন হয় পানির ভেতরে। ডিমগুলো এক ধরনের পিচ্ছিল ফিতার মোড়কে বাঁধা থাকে। এজন্য ব্যাঙের ডিম পাড়ার সময় তাদের পিছনে লম্বা লম্বা ফিতা দেখা যায়। এসব জড়িয়ে থাকে জলজ উদ্ভিদের সাথে। ডিমের সাথে শুক্রকীটের মিলনকে বলে নিষেক (Fertilization)। সাধারণ নিয়মে একটি ডিমের সাথে একটি শুক্রকীটের মিলন হয়। স্ত্রী ব্যাঙের শেষ ডিমটি এবং তাকে নিষেক্তি করার কিছু

পরে পুরুষ ব্যাঙের জোড় খুলে যায়। তারা সরে পড়ে যার যার আবাস স্থল বেছে নেবার জন্য।

নিষেক্তির ফলে সৃষ্ট ডিম্বানু *(Embryo)* কোষ বিভাজনের মাধ্যমে আয়তনে বড় হতে হতে একটা ছোট বলের আকার ধারণ করে। দু সপ্তাহের মাথায়, ক্রমাগত কোষ বিভাজন এবং কোষগুলো স্তরে স্তরে সেজে যাবার ফলে ভ্রূণাণু একটি লম্বাটে ব্যাঙাচির *(Tadpole)* আকার ধারণ করে। ব্যাঙাচি ডিমের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। তাদের অগ্রভাগে সৃষ্ট এক ধরনের চোষক *(sucker)* এর মাধ্যমে জলজ উদ্ভিদের পাতা আটকে থাকে। ব্যাঙাচির এই প্রাথমিক অবস্থায় কোনো মুখ থাকেনা। তাই তার দেহের সকল বর্ধন হয় শরীরে সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্য থেকে। দেহের খাবার নিঃশেষিত হবার মুখে ব্যাঙাচির চোষকের জায়গায় মুখটি তৈরি হয়। লেজের উপরের দিকে এবং অঙ্কীয় দেশে দুটি চামড়ার ভাঁজের সৃষ্টি হয়। এগুলি মাছের পুচ্ছ পাখনা সাদৃশ্য। এ অবস্থায় ব্যাঙাচি তার মুখের সাহায্যে নরম শেওলা খেয়ে জীবন ধারণ করে।

ক্রমশ দেহের অগ্রভাগ থেকে ফুলকাগুলি দেহের সাথে মিশে গলবিলের দুপাশে ফুলকার আকার ধারণ করে। এই অভ্যন্তরীণ ফুলকাগুলি কান কোয়া দিয়ে ঢাকা থাকে। অবিকল মাছের মতো। কিছুদিনের মধ্যে ফুলকাগুলি শরীরের সাথে মিশে যায় এবং গলবিলের পাশে সৃষ্টি হয় দুটি ফুসফুসের। এ সময় কানকুয়ার তলায় দু পাশে দুটি অগ্রপদ এবং অবসারণী ছিদ্রের দুপাশে পশ্চাদ পদ গঠিত হয়। লেজটি ক্রমশ শরীরে মিশে গিয়ে দেহ গঠনের কাজে সাহায্য করে। ফুসফুস সৃষ্টি হবার পর থেকে ব্যাঙাচি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ না করে পানির উপর ভেসে উঠে বায়বীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে। মুখের উপরে নিচে দুটি চোয়াল গঠিত হয় এবং যথারীতি পরিপাকতন্ত্র পূর্ণতা লাভ করার মধ্য দিয়ে ব্যাঙাচি প্রথমেই ক্ষুদে ব্যাঙে রূপান্তরিত হয় এবং ডাঙ্গায় উঠে আসে। প্রজননের পর হাজার হাজার ব্যাঙের বাচ্চা বাড়ি-ঘর-রাস্তা-ঘাট ছেয়ে ফেলে। এদের মধ্যে শত শত মৃত্যু বরণ করে। মানুষের ও অপরাপর প্রাণীর, গাড়ি-ঘোড়া ইত্যাদির নিচে পিষ্ট হয়ে এবং অন্য প্রাণীর খাবার হয়ে শত শত মারা পড়ে। শেষ পর্যন্ত শতকরা দুভাগ প্রাপ্তবয়স্কাবস্থায় পৌছতে পারে কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে প্রায় সকল উভচর প্রাণীর প্রজনন চক্র কম বেশি ব্যাঙের প্রজননের মত। তবে প্রজননকালে পুরুষ ব্যাঙের শরীরে যে সব আঙ্গিক পরিবর্তন হয় তা প্রজাতি ভেদে ভিন্নতর হতে পারে।

পুরুষ ব্যাঙ যখন স্ত্রী ব্যাঙকে জড়িয়ে ধরে পানিতে লুটুপুটি খায় তখন প্রায়শ দ্বিতীয় কোনো পুরুষ ব্যাঙ প্রথমটিকে হটিয়ে নিজে জায়গা দখল করতে চেষ্টা করে। কিন্তু জোড়বাঁধা পুরুষ ব্যাঙটি এত অনড় থাকে যে তাকে চিমটা দিয়ে টেনেও ছাড়ানো যাবে না। উপরন্তু যখন দ্বিতীয় ব্যাঙ স্ত্রী ব্যাঙের পিঠে উঠার চেষ্টা করে তখন প্রথমটির পিছনের লম্বা পা আস্তে আস্তে দ্বিতীয়টির বুকে ঠেকায়। তারপর এমন জোরে ধাক্কা মারে যে বেচারা দ্বিতীয় পুরুষ ব্যাঙ চিৎপটাং দিয়ে পানিতে গিয়ে পড়ে। এদৃশ্য অবলোকন করার মতো। প্রজনন রাতের বেলায় শুরু হলে পর দিন ভোরের বেলা দেখা যাবে বহু পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রী ব্যাঙের সঙ্গ লাভে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ স্ত্রী ব্যাঙ ডিম ছেড়ে চলে গেছে পুকুর থেকে এবং বাকিরা জোড় বেঁধে আছে। আমার ধারণা হলো, পুরুষ ব্যাঙের সংখ্যা স্ত্রী

ব্যাঙের চেয়ে আনুপাতিক হারে বেশি। জোড় না বাঁধা অর্থাৎ কুমার ব্যাঙ একজন আর এক জনের উপর উঠে এমন কি একসাথে পাঁচ–ছ'টি পর্যন্ত পিঠ ধরে পড়ে থাকে প্রজননের কৃত্তিম সাধ বা বিক্ষোভ জাহির *(Displacement activity)* আচরণের বহিপ্রকাশ ঘটায়। এ স্বভাব বহু প্রাণীর জন্য অকৃত্রিম। বানর–হনুমানদের বেলায় তো এটা খুবই সাধারণ আচরণ। এ বিক্ষোভ জাহির এক ধরনের সমকামীতা *(Homosexuality)* স্বরূপ।

গোত্র : মাইক্রোহাইলিডী *(Microhylidae)*

মসৃণ সরু মুখাকৃতির এই ব্যাঙের মাথা দেহের তুলনায় ছোট এবং এরা বছরের দীর্ঘ সময় মাটিতে নিজের তৈরি গর্তে থাকে। কেবল প্রজনন ঋতুতে এদের ব্যাপক উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। মসৃণ এবং গেছো ব্যাঙের সাথে এদের প্রধান তফাৎ এই যে ছোট মুখাকৃতির ব্যাঙের উপরের চোয়ালে কোনো দাঁত নেই। এদের জিহ্বা খসখসে ব্যাঙের চেয়ে ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার। উপরন্তু এদের চোখের মনি হয় গোলাকার বা খাড়া *(Vertical)*। প্রত্যেক প্রজাতিতে কানের পর্দা হয় অনুপস্থিত, নয় দেহের সাথে এমনভাবে মিশে থাকে যে তা কখনো খুঁজে পাওয়া যাবেনা। প্রথম আঙ্গুল সদাই দ্বিতীয় আঙ্গুল অপেক্ষা ছোট। এদের ব্যাঙাচির ঠোঁটে কোনো দাঁত থাকে না।

এই গোত্রের কেবল তিনটি প্রজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যায় বলে বিজ্ঞানীরা বলেছেন। আমি একটি চতুর্থ প্রজাতি সংগ্রহ করেছি। আরো ধারণা করছি, চতুর্থ প্রজাতির সহোদর পঞ্চম প্রজাতিটিও বাংলাদেশে আছে। এ পাঁচটি প্রজাতি মোট তিনটি গণের অধীনে। যথা *Microhyla, Uperodon* এবং *Kaloula*। তিনটি গণ আলাদা করার প্রধান দুটি উপায় হলো (১) গলবিল সম্মুখস্থিত তালুতে চূড়া এবং (২) অগ্রভাগের আঙ্গুলে চাকতির মতো বিস্তৃত চামড়ার উপস্থিতি/অনুপস্থিতি।

মাইক্রোহাইলদের আঙ্গুলে চাকতিবৎ কিছু নেই। নাসারন্ধ্রের ভিতরের অংশের পিছনে বা গলবিলের সামনে কোনো চূড়া নেই। এরা লম্বা ৩৫ মিমি–র কম। এদের দুটি প্রজাতি এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। একটি **চীনা ব্যাঙ** *(Microhyla ornata)* অন্যটি **লাল চীনা ব্যাঙ** *(M. rubra)*। কদাচ ২৫ মিমি–র উপর লম্বা হয়, পায়ের গুটিকা দুটি (Metatarsal tubercle) সাধারণভাবে লক্ষণীয়। আমাদের দেশের ব্যাঙের মধ্যে এটিই দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম। এরা দেশের কোনো আর্দ্র পরিবেশ, পচা লতা পাতার মধ্যে থাকতে পারে। এরা চটপটে। পিপড়া এবং ছোট কীটপতঙ্গ এদের প্রধান খাবার। বর্ষা ঋতু প্রজনন কাল।

লাল চীনা ব্যাঙের দৈর্ঘ্য সদাই ২৫ মিমি–র কম ও দেখতে প্রথমোক্ত প্রজাতির চেয়ে খাটো। পায়ের তালুর গুটিকা বেলচার মতো এবং বেশ বড়। বর্ষা মৌসুমে যে কোনো বৃষ্টির পানিতে এরা ডিম পাড়ে। মাটির ভিতর লুকিয়ে থাকা স্বভাবের কারণে প্রজনন ঋতু ছাড়া এদের দেখা কঠিন। কীট–পতঙ্গ এদের প্রধান খাবার। চীনা ব্যাঙের ডাক ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। পাহাড়ী এলাকাতে এ দুটি প্রজাতি সমভাবে বিদ্যমান। তবে ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য জেলায় প্রথম প্রজাতির চীনা ব্যাঙ আমার নজরে বেশ পড়েছে।

R. limnocharis ; Rana tytleri ; R. temporalis ; R. hexadactyla. * এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এসব ব্যাঙ সচরাচর দেখা যায়। কেবল শেষের প্রজাতিটি বাদে বাকিগুলো দেশের যে কোনো অঞ্চলের পানিতে, পানির ধারে, কচুরীপানা বা জলজ উদ্ভিদের দলের মধ্যে, গাছের কোটরে বা পাতার নিচে পাওয়া যেতে পারে। আমি **ছ'আঙ্গুলে ব্যাঙ** হেক্সাডেকটাইলা দেখেছি সুন্দরবন এবং দেশের উপকূলবর্তী দ্বীপের সামান্য লোনা পানির পুকুরসমূহে। যে দুটি প্রজাতি আমি দেখিনি এবং অন্যরাও এখনো দেখেনি তা হলো *Tomopterina breviceps* এবং *R.crassa*। সোনা ব্যাঙ এবং এ গোত্রের অপরাপর ব্যাঙের পা বেশ মসৃণ। তবে *R. cyanophylictis-* এর গায়ে নরম আঁচিল আছে যা কুনো ব্যাঙের মতন নয়। এদের প্রত্যেকের উপরের চোয়ালে দাঁত এবং জিভের আগা দ্বিখণ্ডিত। চোখের মনি হয় আনুভূমিক, নয় গোলাকার ত্রিকোণী।

সেটা ছিল ১৯৮০ সালের বর্ষণ মুখর জুন মাস। আমি হপ্তা দুয়েকের জন্য গিয়েছিলাম সুন্দর বনের বন্যপ্রাণী দেখতে। তখন আমার বেশ কিছু সময় কাটে চান্দপাই রেঞ্জ অফিসে। সেলা নদীর ছোট খাল চান্দপাই শহর অফিসের সামনে দিয়ে বয়ে গেছে। বাজারের ছোট্ট এক ডোবায় ছিল যৎ সামান্য পানি। দোকানদার এবং মসজিদগামীরা এর পানি ব্যবহার করত। কাঁটা শেওলা, শেওলা এবং ঝাংগিতে ছেয়ে ছিল ডোবাটি। এদের সবুজ রংয়ের সাথে শরীরে সবুজাভ রং মিলিয়ে যে প্রাণীগুলো ফড়িং এবং পাতা ফড়িং *(Dragon & Damsel flies)* খাবার জন্য ঘাপটি মেরে বসে থাকত সে আমাদের সবুজ ব্যাঙ বা ছ'আঙ্গুল ব্যাঙ *(Rana hexadactyla.)*। ঐ ডোবায় ১২টি সবুজ ব্যাঙ ছিল যার কম করে হলেও ৫টি স্ত্রী ব্যাঙ। ডোবা ভর্তি ছিল ব্যাঙাচিতে। লিপ্তপাদ পিছন পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ অবধি বিস্তৃত যা অন্য কোনো মসৃণ ব্যাঙে নেই। সবুজ ব্যাঙের হাতের প্রথম আঙ্গুল দ্বিতীয়টির সমান অথবা একটু বড়। এরা লম্বায় ১৩০ মিমি, দৈর্ঘ্য ও ওজন আমাদের কোলা ব্যাঙের কাছাকাছি। এদের পিছন পা খেতে সুস্বাদু। তবে বাংলাদেশে ওদের ব্যাপক বিস্তৃতি না থাকায় এরা এখনো রপ্তানিপণ্যে পরিণত হয় নি। কপাল ভালো !

ঢাকা শহরের সবচেয়ে নোংরা নর্দমা থেকে শুরু করে বিলের স্বচ্ছ পানির উপর হাত পা ছড়িয়ে মরার মতো ভেসে থাকা ব্যাঙটিকে বলে স্কিপিং ব্যাঙ *(Rana cyanophlyctis)* (চিত্র : ২.৪)। এরা সদাই কট কট শব্দ করে বলে আমি নাম দিয়েছি **কটকটি ব্যাঙ**। লম্বায় কদাচ ৬০ মিমির বেশি হয় না। পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রীর প্রায় অর্ধেক। চোয়াল গোলাকার, হাতের প্রথম ও দ্বিতীয় আঙ্গুল প্রায় সমান সমান ; পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ মোটা এবং গোলাকার। কটকটি ব্যাঙের ব্যাঙাচি সর্বতোভাবে শুককীট ভোজী প্রাণী। এরা মশার এক পরম শত্রু এবং সে কারণে মানুষের পরম উপকারী বন্ধু। এরা সর সর করে পানির উপর দিয়ে অতি দ্রুত লাফিয়ে চলতে পারে। সম্রাট বাবর কটকটি ব্যাঙের ঐ স্বভাবের কথা উল্লেখ করেন ষোড়শ শতাব্দীতে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যাঙ কীট পতঙ্গ

---

* বর্তমানে এসব বৈজ্ঞানিক নামের আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডী প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে। এদের জীবনে শীতনিদ্রার পরিমাণ অল্প বা নেই। কারণ শীতের সময়ও এরা ডোবা–নালা ও নর্দমায় মনের সুখে বাস করে।

কোলা ব্যাঙ *(Rana tigerina*)* (চিত্র : ২.৫) বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের এক বিরাট অর্থকরী প্রজাতি। আশির– দশকে হঠাৎ করে বিদেশীদেরকে ব্যাঙের পিছন পায়ের স্বাদ দিতে এবং দেশে বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার ফুলাতে ফাঁপাতে গিয়ে বেচারা কোলা ব্যাঙের বাংলাদেশে ভৌগলিক বিস্তৃতি ভীষণভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। যতবেশি ডলার ততবেশি করে হ্রাস পাচ্ছে এদের সংখ্যা এ নীতিতেই আজ অবধি এদের হত্যাযজ্ঞ চলে এসেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে কোলা ব্যাঙ এদেশের সবচেয়ে বড় (১৬০ ১৭০ মিমি লম্বা) এবং ব্যাপক বিস্তৃত প্রজাতি। স্ত্রী ব্যাঙ অনেক বড়। পুরুষ ছোট। এদের চোয়াল ভোঁতাভাবে কিছুটা ছুঁচালো, মুখ পেরিয়ে সামনে বেড়ে গেছে। কানের পর্দা খুব স্পষ্ট এবং প্রায়ই চোখের সমান। অগ্রপদের প্রথম আঙ্গুল তৃতীয়টির চেয়ে লম্বা। লিপ্তপাদ পায়ের আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত বিস্তৃত নয়।

কোলা ব্যাঙের ঘ্যাঘু ঘ্যাঘু শব্দ খুবই পরিচিত। এক সময় বৃষ্টি নামলে, ঢাকা শহরের বিভিন্ন মাঠে কোলা ব্যাঙের কোলাহল উৎসব মুখরিত করে রাখত। একটানা বর্ষণের একঘেয়ে দিনগুলোতে এখনও ঢাকা ও অপরাপর শহরে কদাচ কোলাব্যাঙের ডাক শোনা যায়। এরা মে থেকে জুলাই এ তিন মাসে সবচেয়ে বেশি ডিম পাড়ে মার্চের প্রথম এক দু'পসলা বৃষ্টির পর থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রজনন চলতে পারে। নিষেক্তিকৃত ভ্রূণাণু পানির নিচে তলিয়ে যায়। সেখানে ব্যাঙাচির জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটে। ব্যাঙাচি সর্বভুক। তারা পোকা মাকড়ের শুককীট এবং মুককীটসহ নরম শেওলা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ছোট ডোবায় ব্যাঙাচি মশার শুককীট খেতে খুব অভ্যস্ত। বড়রা ফসলের অনিষ্টকারী পোকার বিনাশ সাধনে সদা ব্যস্ত। সেজন্য এরা মানুষের উপকারী বন্ধু। কোলা ব্যাঙের বিরল স্বভাবগুলোর অন্যতম হচ্ছে কীটপতঙ্গ বাদে নানান মেরুদণ্ডী প্রাণী গিলে খাবার ব্যাপরটি। এ পর্যন্ত এই ব্যাঙের পাকস্থলীতে কাকড়া, ইদুর ও চিকা, বুলবুলি আকারের যে কোনো পাখি, মোরগ ছানা, একমিটার (৩৯'' ইঞ্চি) লম্বা সাপ, তক্ষকের মতন বড় টিকটিকি এবং নিজস্ব জ্ঞাতি গোষ্ঠী সহ অপরাপর ব্যাঙ পাওয়া গেছে।

এত বেশি পাওয়া যেত কোলাব্যাঙ যে, ব্যাঙের পা রপ্তানিকারকরা মনে করে প্রতি বছর কয়েক কোটি ব্যাঙের পা বিদেশে পাঠানো যাবে। বিধি এখানে বাম। যারা গ্রামে ও বনের ধারে ব্যাঙ ধরে তাদের সাথে আলাপ করে দেখেছি ব্যাঙের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে এক চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়েছে। ভেক শিকারিরা একটি হ্যারিকেনের আলোতে দুজন মিলে গড়ে ৫০ থেকে ৬০ টা ব্যাঙ ধরতে পারত। এখন (১৯৮১ সালে) সেই পরিশ্রম ও সময়ে কেবল ১২ থেকে ১৫টি কোলা ব্যাঙ ধরা সম্ভব হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং তাঁর উত্তরাধিকারী পরবর্তী সরকার ভেক পণ্ডিতদের পরামর্শে মার্চ থেকে মে মাস অবধি ব্যাঙ ধরা নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞা খাটাবার না ছিল কোনো

* বাংলাদেশের বেশিরভাগ বই -পুস্তককে আছে tigrina / ওটা আসল হবে tigerina

বিশেষজ্ঞ, না ছিল দায়িত্বশীল বিভাগ । ফলে নিষেধাজ্ঞা কার্যত কাগজেই রয়ে গেছে। এত ব্যাপক অঞ্চলে ব্যাঙ ধরা হয় যে ঐ বাধা নিষেধের দণ্ড অত জায়গায় পৌঁছানো বাস্তবিক অসম্ভব ; আর তা আরো অসম্ভব সঠিক কর্ম পন্থার অভাবে।

গ্রামের চাষী মজুর পর্যন্ত বলে দেবে কোলা ব্যাঙ কমেছে। অপরাপর কারণের মধ্যে রপ্তানি ব্যবসা যে এক নম্বর তাও সবাই অকপটে স্বীকার করবেন। পত্রপত্রিকায় প্রায়ই লেখা হয়েছে এদের সংখ্যা হ্রাসের দরুন মশা এবং অনিষ্টকারী পোকার সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে যাচ্ছে। ওদের নির্মুল করার জন্য সরকারকে লক্ষ লক্ষ টাকার রসায়নিক বিষ প্রয়োগ করতে হচ্ছে। এই বিষ আরো ব্যাঙ, মাছ এবং ব্যাঙাচি মেরে ফেলছে। হচ্ছে পরিবেশ কলুষিত। কোলা ব্যাঙ রক্ষার একমাত্র উপায় হলো পুরো পুজনন ঋতুতে একটি নির্দিষ্ট মাপের নিচের আকারের স্ত্রী কোলা ব্যাঙ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সার্কেল নামের বনবিভাগের অফিস তাদের বৈজ্ঞানিক অফিসারের মাধ্যমে প্রদানকৃত সার্টিফিকেট বহনকারী ব্যাঙ চাষীরা কেবল ব্যাঙের চাষ করবে। তারা একটি নির্দিষ্ট কোঠায় ও নির্দিষ্ট আকারের ব্যাঙের পা রপ্তানিকরার সুযোগ পেতে পারে। রপ্তানি হবে বছরের সীমিত সময়ে মাত্র। ব্যাঙ চাষের সাথে সাথে আরো কিছু অর্থকরী প্রাণীর সমন্বিত চাষ হতে পারে। ব্যাঙের খামারে মুরগী এবং কুমীর তার মধ্যে প্রধান। ব্যাঙের দেহের অব্যবহৃত অংশ ওসব পালা প্রাণীকে খাওয়ানো যাবে। শিং মাগুরের চাষও তাতে হতে পারে।

চীনা ব্যাঙ বাদে আমাদের ঘরের কাছে, বাগানে এবং দেশের সর্বত্র লোকের চোখকে এড়িয়ে যে এক চিমটি ব্যাঙ সংখ্যায় এবং বিস্তৃতিতে ব্যাপকাকার ধারণ করে তা হলো **ঝি ঝি ব্যাঙ বা ক্রিকেট ফ্রগ** *(Rana limnocharis)* । এই ব্যাঙ সচরাচর ৩৫ মিমি হয়ে থাকে। স্ত্রী ঝি ঝি ব্যাঙ ৬৪ মিমি পর্যন্ত দীর্ঘে সর্বোচ্চ রেকর্ড রয়েছে। এদের ক্ষুদ্রাকার লীপুপাদ পায়ের আঙ্গুলের অর্ধেক পর্যন্ত বিস্তৃত। পায়ের চতুর্থ আঙ্গুলের বেশিরভাগ অংশে লীপুপাদ নেই। হাতের প্রথম আঙ্গুল দ্বিতীয়টির চেয়ে বড়। চোখের পিছনে চামড়ার একটি করে খাঁজ কাঁধ বরাবর চলে গেছে। এদের নির্দিষ্ট কোনো প্রজনন ঋতু নেই বললেই চলে। তবে অন্যান্যদের সাথে এরাও বৃষ্টির সাথে সাথে প্রজনন চালিয়ে যায় (চিত্র : ২.৬)।

পানা ব্যাঙ *(Rana tytleri)* এবং **গাছ ব্যাঙ** *(Rana temporalis)* নামের আরো দুটি ব্যাঙ আছে এবং দেশের প্রায় সব অঞ্চলে পাওয়া যায়। পানা ব্যাঙ কচুরীপানা এবং জলজ উদ্ভিদে থাকতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। বর্ষণ মুখর সন্ধ্যার পর এদের শব্দে গ্রামের কোনো জলার ধারে কান পাতা যায় না। বর্ষা মৌসুমে দেশের সর্বত্র জলাভূমিতে এদের দেখা যায়। এরা লম্বা ৫০ থেকে ৬০ মিমি। শরীরের উপর ও পশ্চাদ্দেশ মেষে চলে গেছে দু'পাশে দুটো লাইন। গাছ ব্যাঙ থাকে ঝোপ ঝাড় এবং সুন্দরবনসহ দেশের অপরাপর অঞ্চলে। বৃষ্টির সাথে সাথে বনবাদার এদের ডাকে মুখরিত হয়ে উঠে। বৃষ্টি থাকলে দিনের বেলা এবং বৃষ্টি না হলে সন্ধ্যা বেলায় এদের ডাকাডাকি শুরু হয়। গাছ ব্যাঙের কানের পর্দার পিছন থেকে শরীরের শেষ ভাগ অবধি একটি করে মোটা গাঢ়

বাদামী খয়েরী লাইন চলে গেছে। শরীর পানা ব্যাঙের চেয়ে সামান্য মোটা এবং লম্বায় দুটো প্রায় সমান। এ দুটি প্রজাতির প্রত্যেকের আঙ্গুলের অগ্রভাগ চাকতির মতন চামড়ামুক্ত। এদের পায়ে লীপ্তপাদ বিদ্যামান (চিত্র : ২.৭)।

গোত্র : র‍্যাকোফোরিডী *(Rhacophoridae)* : গেছো ব্যাঙ

ইতোপূর্বে রেনিডী গোত্রের যে সব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য করেছি তার সাথে এই গোত্রের খুব বেশি মিল রয়েছে। কেবল গেছো ব্যাঙ গোত্রের ব্যাঙের পায়ের আঙ্গুলের সর্বশেষ দুটি কড়ার মাঝখানে একটি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র তরুণাস্থি সন্নিবেশিত থাকে। এছাড়া এই গোত্রের ব্যাঙের অগ্র এবং পশ্চাৎপদের আঙ্গুলের অগ্রভাগে বেশ বড় এবং গোলাকার চাকতির মতো চামড়া থাকে। ভোমারাইন দাঁত যুক্ত *(Vomerine teeth)* গেছো ব্যাঙ *Rhacophorus* গণের অন্তর্ভুক্ত এবং এই দাঁত বিহীন ব্যাঙ *Philautus* গণের পড়ে।

এ পর্যন্ত এদেশে গেছো ব্যাঙের দুটি প্রজাতি *Rhacophorus leucomystax* ও R. maculatus পাওয়া গেছে। এদের পরিবর্তিত নাম *Polypedates leucomystax* এবং *P maculatus*। সম্প্রতি চট্টগ্রামে বান্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার চিরসুবজ বনে বহু জায়গায় আমি এবং রমুলাস হুইটেকার *Philautus* প্রজাতির ডাক শুনেছি। এখনো পর্যন্ত এ ধরনের কোনো ব্যাঙ ধরতে না পারায় কোন্ প্রজাতিটি বাংলাদেশে আছে তা বলা কঠিন। *Rhacophorus*- এর একটি তৃতীয় প্রজাতি *(R. jerdoni)* সিলেটের টিলা এবং চিরসবুজ বনে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

P. leucomystax এবং *P. maculatus* নামক গেছো ব্যাঙ দুটি দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। অনেক সময় তারা ছনের বা বাঁশের ঘরের ভিতর ও থাকে। মাটি থেকে বেশ উঁচুতে তারা হাত পা গুটিয়ে বিশ্রাম নিতে পছন্দ করে। বৃষ্টির শুরুতেই প্রজনন চালু হয়। পুরুষ ব্যাঙ ভারী গলায় অনেকটা কাশির শব্দ তুলে ডাকে। এদের মিলন হয় গাছের ডালে বা কাণ্ডে থাকা অবস্থায়। সেখানে এক ধরনের ফেনা সৃষ্টি করে তার মধ্যে ডিম ও শুক্রাণু ছেড়ে দেয় পুরুষ ও স্ত্রী ব্যাঙ। এখানে ভ্রূণাণু বড় হয়ে নিচের পানিতে পড়ে। পানি না থাকলে গাছে শুকিয়ে ভ্রূণাণুর মৃত্যু ঘটে।

গেছো ব্যাঙ যে পরিবেশে থাকে তাদের গায়ের রং সেই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে পরিবর্তিত হয়। এরা কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিসংখ্যানে জানা যায় ১৯৭২ সনের জুলাই থেকে ১৯৮০ সনের নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২০ কোটি টাকার কোলা ব্যাঙ ও ব্যাঙের পা বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। মৎস্য সম্পদীয় রপ্তানি পণ্যের মধ্যে এ পরিমাণ শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ । সরাসরি অর্থ রোজগার ছাড়াও প্রতি বছর আমাদের উভচর সম্পদ বহু কোটি টাকার ফসলের অনিষ্টকারী পোকা এবং মশার ডিম খায়, এ ধরনের একটি অর্থকরী সম্পদের উপর ব্যাপক গবেষণা এবং এদের ব্যবস্থাপনা একান্ত দরকার।

তৃতীয় অধ্যায়

সরীসৃপ প্রাণী

সবদিক বিচার করে যদি কোনো শ্রেণীকে বলা হয় সর্বোতভাবে ডাঙা জয়ের প্রথম খ্যাতি অর্জন করেছে, তবে তা হবে সরীসৃপ শ্রেণী। উভচর প্রাণীরা ডাঙা জয়ের পথে ছিল সেকথা আগেই বলেছি। সরীসৃপ শ্রেণীর সদস্যরা এ ব্যাপারে যত রকম বিবর্তন এবং অভিযোজন দরকার তার মাঝ দিয়ে হেঁটে গেছে এবং বলা যায় তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে গেছে। আমাদের দেশে সরীসৃপের অন্তর্ভুক্ত আছে তিনটি বর্গ। কিলোনিয়া *(Chelonia)* বর্গে আছে সকল কাইট্রা, কচ্ছপ এবং কাছিম। স্কুয়ামাটা *(Squamata)* বর্গের প্রজাতিসমূহের প্রধান প্রধান দলগুলিকে প্রথমে দুটি বড় দল, পা যুক্ত এবং পা বিহীন, উপবর্গে ফেলা হয়। টিকটিকিদের উপবর্গে লেছারটিলিয়াতে *(Lacertilia)* আছে টিকটিকি, গিরিগিটি, তক্ষক, আনজন এবং গুইসাপ। এরা সবাই পা যুক্ত। সাপ উপবর্গের নাম অফিডিয়া *(Ophidia)*। এদের কারোও পা নেই। সরীসৃপের তৃতীয় বর্গটির নাম ক্রোকোডিলিয়া *(Crocodylia)* । এই বর্গে আছে কুমীর এবং ঘড়িয়াল। সব সরীসৃপ *REPTILIA* শ্রেণীভুক্ত। চতুর্থ বর্গ রিঙ্কোসিফালিয়া (*Rhynchocephalia*) নিউজিল্যাণ্ডে বিদ্যমান।

অনেক সরীসৃপ পানিতে বাস করলেও কয়েক প্রজাতির সামুদ্রিক ও অন্য কিছু সাপ এবং মেটে ডোরা বা জলডোরা বাদে বাকি সব সরীসৃপই এক অর্থে ডাঙার বাসিন্দা। সামুদ্রিক কাছিম ও কাইট্রা এবং নদীর কাছিম ও কুমীর পানিতে বাস করে। পানি থেকে খাবার সংগ্রহ করে। জলাশয়ের পাড়েই কোথাও রোদ পোহায়। কিন্তু সকল সরীসৃপকে ডিম দিতে হয় ডাঙায় (সামুদ্রিক ও জল সাপ বাদে)। এই সাপ সহ সব প্রজাতিকেই বায়ুবীয় অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয় ; অর্থাৎ পানির নিচে বাস করলেও শ্বাস নেবার জন্য মাঝে মাঝেই পানির উপর উঠে আসতে হবে। তখনই বাতাস থেকে অক্সিজেন ফুসফুসে যাবে। সারা জীবনে একবারও পানিতে না গিয়ে দীর্ঘ সময় ডাঙায় কাটাবার জন্য প্রধান প্রধান অভিযোজনগুলি সরীসৃপের রয়েছে।

অভিযোজন

স্থলভাগে চলতে গেলে একটি প্রাণীর প্রাথমিক প্রয়োজনের অন্যতম হচ্ছে যুৎসই পা ও হাত এবং শরীর যাতে শুকিয়ে না যায় তার জন্য আঁইশ বা বর্মমুক্ত চামড়া। উভচরদের বেলায় আমরা দেখেছি তাদের জোড়া হাত ও পা গায়ের সাথে এমনভাবে সেঁটে থাকে যে ওসব অঙ্গ দিয়ে লাফানোর কাজটি যত সহজে করা যায়, হাঁটার কাজটি তত সহজে হবার নয়। সরীসৃপদের হাত পায়ে কিছু হাড় কমে এবং যুগোপযোগী কিছু নতুন অঙ্গ জুড়ে,

এসব অঙ্গ শরীরের সাথে সেঁটে না থেকে বেশ কিছুটা প্রসারিত হয়েছে। প্রাণী ইচ্ছে করে এবং প্রয়োজনে এসব সামনে পিছনে চালিত করে, দ্রুত বেগে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা বা খাবার সংগ্রহ করতে পারে। সাপের হাত-পা না থাকার অসুবিধা পুষিয়ে দেয় পেটের লম্বা লম্বা পাথালি আঁইশ এবং এঁকে বেঁকে চলার ভঙ্গিমা।

শরীরের বাইরের পরিবেশের সাথে সংযোগ সাধন এবং দেহের পেশীর আবরণীরূপে পেশীকে রক্ষা করে চামড়া (ত্বক শব্দটির পরিবর্তে আমি চামড়া ব্যবহার করছি)। চামড়ার বাইরের দিকে আছে কর্নিয়াম *(Cornium)* স্তর। এর উপরিভাগে থাকে আঁইশ। আঁইশের উপরের দিকে শক্ত অথচ পাতলা এবং স্বচ্ছ এপিডারমাল *(epidermal)* আবরণ থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে, সরীসৃপের আবরণী বা খোলস পরিত্যাগ করে। এটা হতে পারে খণ্ড অবস্থায় বা সাপের মতো একবারে সম্পূর্ণ আবরণী। আঁইশগুলি লম্বাটে (সাপের পেটের), চোখা, ভোঁতা, খসখসে , গুটি বা আঁচিলের মতো হতে পারে। আঁইশসহ চামড়া সরীসৃপের দেহকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। উভচরদের এই ব্যবস্থাটি নেই।

ডাঙ্গায় বাস করতে গিয়ে সরীসৃপরা শক্ত খোলসযুক্ত ডিম পাড়ে। ডিমের এই খোলস ভিতরের ভ্রূণাণুকে রক্ষা করে। ডিমের খোলস এবং ভিতরের ঝিল্লিগুলি আস্রবণশীল। ভ্রূণাণুর শ্বসনের ফলে যে কার্বনডাই অক্সাইড তৈরি হয় তা ডিমের বাইরে এবং বায়ুবীয় অক্সিজেন ভিতরে আনা সচ্ছিদ্র খোলসের প্রধান কাজ। খোলসের কারণে ভ্রূণাণু শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। ডিমের ভিতরে এমনিয়ন এবং এলানটয়েস নামের দুটি ঝিল্লি ভ্রূণাণুকে ঝাঁকুনি খাওয়া থেকে রক্ষা করে। আর ভ্রূণাণু রেচনকৃত বহ্য পদার্থসমূহ ধরে রাখে।

উপরের সবগুলি অভিযোজনের পরিমাণ সরীসৃপের সব বর্গে বা বর্গস্থিত উপবর্গে এক নয়। বিবর্তনের ক্রমধারায় এই পরিবর্তন বিভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হৃৎপিণ্ডের কথা। উভচরদের তিন প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড সরীসৃপের টিকটিকি এবং সাপ উপবর্গে পরিবর্তিত হয়ে অনেকটা সাড়ে তিন (!) প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি করেছে। উভচরের এক নিলয় সরীসৃপের দুটি নিলয়ের দিকে বিবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ নিলয় অসম্পূর্ণভাবে দ্বিখণ্ডিত। কুমীর বর্গে এই নিলয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ডিত। তবে আন্তঃনিলয় পর্দার মাঝখানে সামান্য একটি ছিদ্র আছে। কাজেই এমন সরীসৃপের হৃৎপিণ্ডকে চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট বলা চলে না।

উভচরের মতন সরীসৃপকে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য দীর্ঘ সময় মাটির গর্তে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে থেকে গভীর শীতনিদ্রা যেতে হয় নি। সে জায়গায় মাঝে মাঝে আগুন পোহানোর মতো করে রোদ পোহানো *(basking)* এবং অধিক গরমের হাত থেকে শরীরকে রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে ছায়াঘন পরিবেশে, পাথরের আবডালে গা আড়াল করার দরকার হয় মাত্র। অসম্পূর্ণ আন্তঃ নিলয় পর্দা অক্সিজেনযুক্ত এবং কার্বনডাই অক্সসাইডযুক্ত রক্তের মিশ্রণ ঘটাতে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করে। ফলে একটি সরীসৃপের আকারের উভচর প্রাণীর দেহে যে পরিমাণ শক্তি তৈরি হবে সরীসৃপের দেহে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি উৎপন্ন হবে। সে কারণে সরীসৃপ উভচরের চেয়ে অধিক কর্মচঞ্চল এবং পরিবেশগত টানাপোড়নের সাথে খাপ খাওয়ার ক্ষমতার অধিকারী। এ

অধ্যায়ের অনেক ছবি জে. সি. ডানিয়েল রচিত "দি বুক অফ ইণ্ডিয়ান রেপটাইলস" (১৯৮৩) নামক বই থেকে নেওয়া হয়েছে। বন্ধনীতে লেখকের নাম ব্যবহৃত হয় নি এমন ছবি আমার তোলা। সরীসৃপ সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য ধার নিয়েছি চল্লিশ দশকে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত স্মিথের লেখা "দি ফোনা অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" সিরিজের বই থেকে।

কাছিম বর্গ

বাংলাদেশ একটি কাছিম সমৃদ্ধ দেশ বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। উত্তরের তেঁতুলিয়া থেকে দক্ষিণের জিঞ্জিরা দ্বীপ, পশ্চিমের রাইমঙ্গল নদী থেকে পূর্বে নাফ নদী পর্যন্ত বাংলাদেশে যত প্রাকৃতিক পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে তার সর্বত্র কাছিম আছে। কেবল নেই মানুষের ঘর-দোরে। তবে তার বাড়ির পাশের ডোবাতে কাছিম আছে। পানি যুক্ত ইরি খেতেও কাছিম বাস করতে পারে।

কাছিম, কাইট্টা, বা কচ্ছপ মিলে সৃষ্টি হয়েছে কিলোনিয়া বর্গ। কোনো কোনো দেশের লোকজন একে চিলোনিয়া *(Chelonia)* বলেও উচ্চারণ করে থাকেন। সাধারণ ইংরেজি নাম *Turtle* ও *Tortoise* যেমন আমাদের মনে কাছিম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তেমনি বিভ্রান্তি বাংলা নাম কাছিম, কাইট্টা বা কচ্ছপও। আমরা যদি প্রথমেই ঠিক করে নেই কোন দলের কাছিমকে কি নামে ডাকব তাহলে সমস্ত গোলমাল এড়ানো সম্ভব। বাংলা নামের ব্যাপারে সে অধিকার আমাদের আছে।

গ্রাম দেশের যে কোনো লোক, চাষী-মজুর বা জেলেকে কাছিমের যে কোনো একটি দেশী প্রজাতি দেখিয়ে নাম জিজ্ঞাসা করলে সে তাৎক্ষণিক একটি দেশী নাম বলে দেবে। অনেকের সাথে আলাপ করলে দেখা যাবে নরম বর্মের অধিকারীদেরকে তাঁরা বলেন 'কাছিম, পানিতে বাস করা শক্ত বর্মের অধিকারীদের 'কাইট্টা', ডাঙায় বাস করা শক্তবর্মের প্রজাতিকে 'কচ্ছপ' এবং সমুদ্রে বাস করা প্রজাতিকে 'সামুদ্রিক কাছিম'। এই চারটি সাধারণ নামই আমরা সানন্দে গ্রহণ করতে পারি। তবে আমাদের কিছু কিছু কাইট্টা কেবল ডাঙায় বাস করতে পারে। সেজন্য তাদেরকে কচ্ছপ বলা যেতে পারে। কিলোনিয়া বর্গের সকল সদস্যদেরকে এক কথায় কাছিম বলা যেতে পারে। কারণ প্রজাতি নামের সাথে যখন কাছিম শব্দটি ব্যবহৃত হবে তখন এর আগে বসবে প্রজাতির নাম। যেমন ধূম কাছিম, সুন্দী কাছিম, ছিম কাছিম, ইত্যাদি। ইংরেজি ভাষাতেও এমন একটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ড. পিটার সি. এইচ. প্রিচারডের লেখা, ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত, 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব টারটলস'-এ সকল কিলোনিয়া প্রজাতির উল্লেখ আছে। কাছিমকে কোনো কোনো এলাকার জলখাসী বলে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে এবং অপরাপর সকল বন্যপ্রাণীর মধ্যে কেবল কাছিমের দেহই গোলাকৃতির। এরা খুব শক্ত বা কিছুটা নরম খোলা বা খাপড়ার ভিতর শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লুকিয়ে রাখতে বা ঢেকে রাখতে পারে। গোলাকৃতির দেহের উপরিভাগে উত্তলের মতো কৃত্তিকাবর্ম *(Carapace)* এবং নিচের দিকে আছে চ্যাপটা বক্ষস্ত্রাণ *(Plastron)*। কৃত্তিকাবর্ম এবং বক্ষস্ত্রাণ কাছিমের সামনের এবং পিছনের এলাকা গুটানোর

ক্ষমতা সম্পূর্ণ। এখানে ঘাড়, অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ, এবং অবসারণী ছিদ্রসহ মেরুদণ্ড ও লেজ থাকে। এ ছাড়া দেহের দু'পাশের বাকি অংশে কৃন্তিকার্বম ও বক্ষস্ত্রাণ জোড় লাগানো থাকে। কাছিমের চোয়ালে কোনো দাঁত নেই। তবে চোয়ালগুলি এমনভাবে ঢেউ খেলানো ও উঁচু উঁচু চূড়ার অধিকারী যে এর সাহায্যে খাবার শক্ত করে ধরে রাখার বা চুরমার করে দেবার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। কাছিমের আঙুল নখরযুক্ত। এদের বুকের কশেরুকা ও পাঁজর কৃন্তিকাবর্মের ভিতর পিঠের সাথে এমনভাবে জুড়ে গেছে যে, এরা অপরাপর প্রাণীদের মতন পাঁজরের হাড়ের ইচ্ছানুযায়ী সংকোচন ও সম্প্রসারণ করে শ্বসনকার্য পরিচালনা করতে পারে না। ফলে ভয়ার্ত কাছিম যখন হাত-পা লেজ ও মাথা খাপড়ার ভিতর গুটিয়ে নেয় তখন এদেরকে জায়গা করে দেবার জন্য ফুসফুস থেকে প্রচুর পরিমাণে বাতাস বের করে দিতে হয়। এই অবস্থা বেশিক্ষণ চললে ফুসফুসে ধরে রাখা সামান্য বাতাস অল্প সময়েই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ফলে, ফুসফুস এবং রক্তের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বাড়বে। কাছিম অতিরিক্ত দূষিত পদার্থ রক্তে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। কাছিমের রক্তের বাইরে মাংশপেশীর মাইওগ্লোবিন *(Muscular myoglobin)* অক্সিজেন ধরে রাখে। ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালানো ছাড়াও পানিতে বাস করা কাছিম তাদের অবসারণী ছিদ্রের পাশের রক্ত সংরক্ষণ নালিকা যুক্ত পর্দার সাহায্যে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে।

সাধারণভাবে পুরুষ কাছিম মেয়ে কাছিমের চেয়ে চ্যাপ্টা, এদের লেজ লম্বাটে। মেয়েদের শরীর ভারী এবং লেজ খুব মোটা হয়। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পৃথিবীর প্রথম আদিম কাছিমের জন্ম হয়েছিল ট্রায়াসিক কালে *(period)*। সেটা আজ থেকে বিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে। বলতে হবে, এরা সেই প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসোরদের আমলের প্রাণী। ডাইনোসোর প্রকৃতিরসাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর বিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে কাছিম কিছুটা নতুন অঙ্গ সংস্থাপনের মাধ্যমে আজও বেঁচে আছে।

কাছিমের সবচেয়ে অভিনব অভিযোজন হলো এরা অল্প জায়গায় বেশি মাংসে ধরে রাখার ক্ষমতার অধিকারী। একটি ৫/৭ মন (২০০-৩০০ কেজি) ওজনের কাছিমের শরীরের দৈর্ঘ্য খুব অল্প ক্ষেত্রেই ১০০০ মি.মি. হয় ; অথচ ঐ দৈর্ঘ্যের একটি মানুষের ওজন হবে বড় জোর ৪০ কেজি।

বাংলাদেশী কাছিম

সারা ভারতবর্ষে ৩১/৩২টি প্রজাতির কাছিম আছে। কাছিমের জন্য বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এত বেশি উপযুক্ত যে, আমাদের দেশে ২৫টি প্রজাতি আছে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের মতো একটি ছোট দেশে এত কাছিমের সমারোহ কাছিম বিজ্ঞানীদেরকে কিছুটা বিচলিত করে বৈকি। কাছিম এ দেশের একটি অর্থকরী ফসলের মতোই। বিগত ১৯৭৯ সালের জুলাই থেকে ১৯৮২ সালের জুন মাস পর্যন্ত কাছিম রপ্তানির মাধ্যমে প্রায় তিন-চার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে। ড. রবার্ট অলিভিয়ার নামে একজন বৃটিশ বিজ্ঞানী ফাওকে *(FAO, Rome)* প্রদত্ত বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর উপর এক রিপোর্টে বলেছেন, বাংলাদেশে যে পরিমাণ কাছিম সরকারি নিয়ন্ত্রণে রপ্তানি

করে, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ চোরা পথে ভারতে পাচার হয়। ভারত নাকি সেগুলি পুনঃ রপ্তানি করে। এ বক্তব্যের পিছনে যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে। মাঝে মাঝেই আমরা দেখি পত্রিকায় খবর বের হয় সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে বি. ডি. আর বা পুলিশ ট্রাক ভর্তি কাছিম উদ্ধার করেছে। সোজা এবং বাঁকা পথে রপ্তানি বাণিজ্যের বাইরে দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু, খ্রিস্টান সম্প্রাদায়, গারো, চাকমা, বৌদ্ধ ও অন্যান্য উপজাতীয়রা ব্যাপকহারে কাছিম নিধন করে এবং খায়। বিভিন্ন খোলা বাজারে জ্যান্ত কাছিম কেটে কেটে আট থেকে ষোল টাকা কিলো (কিলোগ্রাম) দামে বিক্রি করে। বর্তমানে দাম একশ ত্রিশ টাকা কেজি।

অতএব যে অর্থকরী ফসল এই কাছিম সম্পদ তার উপরে এদেশে কোনো ব্যাপক গবেষণা হয় নি। বাজারের অবস্থা কেবল এই রপ্তানির সাথে যুক্ত এবং সামান্য কিছু সংগৃহীত নমুনার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা ছিটেফোঁটা প্রবন্ধ বের করেছেন। এর মধ্যে সর্ব প্রথম ১৯৬৫ সালে তৎকালীণ পূর্বপাকিস্তানের মৎস্য বিভাগের পরিচালক, নাজীর আহমেদ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত ৯টি কাছিম প্রজাতির উপর কিছু তথ্য দেন। এরপর, তথ্য দেন ১৯৭৬ সালে মোঃ শফি এবং মিঁয়া মোঃ আবদুল কুদ্দুস। নাজীর আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত ৯টি প্রজাতির সাথে ২টি কাছিম এবং ৫টি সামুদ্রিক কাছিমের নাম সংযোজন করে বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটিতে কতকগুলো কাছিমের নাম সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন *Chrysemys picta, Chelonia emys* ও *C. amboinensis* । লেখকদ্বয় *Chelonia* এবং *Chilone* এই দুটি বানানই ব্যবহার করেছেন। এ দেশে এসব প্রজাতির কোন কাছিম নেই বা এগুলি ভারতেও নেই। উপরন্তু তাঁদের দেওয়া *Emyda granosa* নামের প্রজাতিটি এখন *Lissemys punctata* নামের অন্য একটি প্রজাতির উপপ্রজাতি, *Lissemys punctata granosa* হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। তাঁদের প্রবন্ধের এই অসংলগ্নতা বাদ দিলে দেখা যাবে যে এদেশে আছে ১০টি কাছিম ও কাইট্রা এবং ২টি সামুদ্রিক প্রজাতির কাছিম।

এরপর ১৯৭৯ সালে অধ্যাপক হোসেন ঐ একই বিজ্ঞান পত্রিকায় কাছিমের উপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি প্রজাতি চিহ্নিত না করে *Testudo* গণের একটি কাছিমের নাম সংযোজন করেন। এ *Testudo*'র কৃত্তিকাবর্ম পরীক্ষা করার পর আমি ওটাকে *Geochelone emys* বলে সনাক্ত করি। এসব মিলিয়ে প্রজাতির সংখ্যা দাঁড়ালো ১৩টিতে। উপরের লেখকগণের প্রবন্ধে কাছিমের যেসব বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহৃত হয়েছে তার অনেক নাম ও নামের বানান আর চালু নেই। লেখকবৃন্দ সেসব দিকে অমনোযোগী ছিলেন বলেই মনে হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৫টি গোত্রের ২৫টি প্রজাতির কাছিম আছে। এদের মধ্যে ১২টি ইমাইডিডী, ২টি টেস্টুডিনিডী, ৬টি ট্রায়োনিকিডী, ৪টি কিলোনিডী এবং একটি ডারমোকেলিডী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

মজার কথা হলো, এ সবগুলি প্রজাতি এবং উভচর থেকে স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীদের যে ৮৫০টি প্রজাতির প্রাণী আছে যা বাংলাদেশে পাওয়া যায় তার মধ্যে কেবল দুটি প্রজাতির কাছিম পুরোপুরি বাংলাদেশের বাসিন্দা। কারণ এ দেশের বাইরে এই দুই প্রজাতির কাছিম

আর কোথাও পাওয়া যায় না। অন্তত আজ পর্যন্ত যত বই কাছিমের উপর প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রজাতিদ্বয় হচ্ছে **বায়েজীদ বোস্তামীর পুকুরের কাছিম** (*Aspidertes nigricasn*) এবং হলদে কাইট্টা (*Morenia petersi*)। তবে আমার ধারনা হলদে কাইট্টা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের এবং মেঘালয়ের বাংলাদেশ সংলগ্ন জেলাসমূহে পাওয়া যেতে পারে। ভারতের বোম্বে নেচারাল হিস্ট্রী সোসাইটির (বি. এন. এইচ. এস) জার্নালে বাংলাদেশের কাছিম সংরক্ষণের উপর ১৯৮২ সালে আমার একটি নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বের হয়। ঐ একই সোসাইটির 'হর্নবীল" নামক জার্নালে ১৯৮০ সালের ৪র্থ সংখ্যায় বায়েজীদ বোস্তামী কাছিমের উপর আমার অন্য একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কাছিমের সর্বশেষ শুদ্ধ বানানসহ বৈজ্ঞানিক নাম* সন্নিবেশিত হলো। বাংলাদেশের কাছিম চেনার জন্য কেবল কাছিমের রঙ এবং কৃত্তিকাবর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যাতে কাছিম না কেটেও তারা কে কোন্ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সেটা সনাক্ত করা যায়। বিশেষ করে মাঠে কাজ করার সময় তা অতি জরুরি।

গোত্র : ইমাইডিডী *(Family : Emydidae)* : কাইট্টা

এই গোত্রের সকল কাছিমের কৃত্তিকাবর্ম খুবই শক্ত। লোহার মতো শক্ত। কাইট্টার কৃত্তিকাবর্মের উপরিভাগে সারি সারি এপিডারমাল শীল্ডে আবৃত থাকে। এই শিল্ডের তিনটি সারি আছে। মধ্য সারি, কশেরুকার ঠিক উপর বরাবর, ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সংখ্যা পাঁচ। এই মধ্য সারির প্রত্যেকটি শীল্ডকে বলা হয় মেরুদণ্ডীয় *(Vertebrals* বা *Centrals)* বা মেরুশীল্ড। মেরুশীল্ডের দুপাশের দুসারিতে চারটি করে, মোটা আটটি পাঁজরার *(Costal)* শীল্ড। এদের নিচে অর্থাৎ কৃত্তিকাবর্মের কিনারা বরাবর বক্ষস্ত্রাণের সাথে সংযুক্ত, প্রত্যেক পাশে ১১টি করে, মোট ২২টি প্রান্তীয় *(marginal)* শীল্ড রয়েছে। এই তিন সারি বাদে ঠিক মেরু শীল্ডের সামনে এবং ঘাড়ের উপর আছে চিকন একটি লম্বাটে ঘাড়ের *(nuchal)* শীল্ড। অবস্থা দেখে এটিকে মনে হতে পারে মেরু অথবা প্রান্তীয় শীল্ডের অংশ। আবার মেরু শীল্ডের পিছনে এবং প্রান্তীয় শীল্ডের সারি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান এবং লেজের উপর পাশাপাশি আছে একটি জোড়া অধিলেজের *(subcaudal)* শীল্ড। বক্ষস্ত্রাণের শীল্ডগুলি সবই জোড়া জোড়া। মোট ছজোড়া শীল্ডের প্রথমটিকে বলে কণ্ঠ *(gular)* শীল্ড। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ জোড়াকে যথাক্রমে হিউমেরাল বা প্রগণ্ডাস্থি *(humeral)*, তৃতীয় জোড়াকে বক্ষোপরি *(pectoral)*, উদরি *(abdominal)*, উর্ব *(femoral)* শীল্ড এবং পায়ু *(anal)* শীল্ড বলা হয়। কখনো কখনো কণ্ঠ ভেঙে মোট তিনটি টুকরো হয়ে যেতে পারে। তখন দুটি কণ্ঠ শীল্ডের মাঝখানে মধ্য কণ্ঠ নামে *(Intergular)* একটি তৃতীয় শীল্ড থাকতে পারে।

ইমাইডিডী গোত্রের বাইরের সব গোত্রের কাইট্টা এবং সামুদ্রিক কাছিমের কৃত্তিকাবর্মে বিভিন্ন শীল্ড আছে। কেবল নেই আদি কাছিম গোত্র বা ট্রায়োনোকিডীতে। এই শীল্ডের বিভিন্ন আকার, এতে রঙের সমাহার এবং সংখ্যা ও কিছু আনুষঙ্গিক আঙ্গিক পরিবর্তনের

---

* বর্তমান দশকে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক নামের পরিবর্তন হয়েছে। Das (1994) দেখুন।

উপর ভিত্তি করে কাছিমের প্রজাতি পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব। তবে কাছিমের বয়সের তারতম্যের দরুন এই শীল্ডের আকার এবং রঙের পরিবর্তন হতে পারে।

ইমাইডিডী গোত্রের অপরাপর যে বৈশিষ্ট্য সাধারণত একজন পাঠকেরও চোখ এড়াবে না তাহলো কাইট্রার সামনের পা গদারমতো বা পায়ে নজরে পড়ার মতো আঙ্গুল থাকবে। আর প্রত্যেক পায়ে চার পাঁচটি করে নখর থাকবে। কাইট্রার বক্ষস্ত্রাণে মধ্যকণ্ঠা শীল্ড থাকবে না এবং সেই শীল্ডের সংখ্যা সবসময় আটটির বেশি হবে। বক্ষস্ত্রাণের বক্ষোপরি বা উদরিশীল্ড অথবা এতদ উভয়ের সাথে কৃত্তিকাবর্মের প্রান্তীয় শীল্ডের সংযোগ থাকবে। কাইট্রার পিছনের পায়ের অন্তত একটি আঙ্গুলে হলেও দুটির বেশি অঙ্গুলিনলক থাকবে *(Phalanges)*।

বাংলাদেশের কাইট্রার প্রজাতির সংখ্যা ১২। এদের বেশ কিছু প্রজাতির কথা প্রথমবারের মতো এখানে উল্লেখিত হচ্ছে। এরা যে বাংলাদেশে আছে বা এদের এখানে পাওয়া যেতে পারে তা আমার আগে আর কারো জানা ছিল না বলেই বিশ্বাস । আমার সদ্য প্রকাশিত ১৯৮২ লেখা চেকলিস্ট এবং কাছিমের উপরের প্রবন্ধে আমি অবশ্য এদের কথা বলেছি। নিচে কাইট্রার সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশিত হলো।

কালি কাইট্রা *(Hardella thurji)*

বাংলাদেশের কাইট্রার মধ্যে এই প্রজাতি সহজলভ্য। শীতকালে প্রচুর কালি কাইট্রা বাজারে উঠে। দেশের প্রায় সর্বত্র নদী-নালায়, বিলে, বদ্ধ পানিতে পাওয়া যায়। ঢাকা এবং কুমিল্লাতে এরা প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়ে। আধারযুক্ত ফেলা একক বড়শী অথবা লম্বা রশিতে কয়েক সেন্টিমিটার দূরে দূরে বসানো আধারবিহীন হাজার বড়শীর সাহায্যে এদের ধরা হয় এবং কুমিল্লার দাউদকান্দি, ঢাকার নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ, তাঁতি বাজার, ঠাটারি বাজার, শ্যাম বাজার ও ফার্মগেটে এদের বেচাকেনা হয় (চিত্র : ৩.১)।

মেয়ে কালিকাইট্রা ৫৩০ মিমি লম্বা এবং ওজন ৯ থেকে ১৫ কেজি (কিলোগ্রাম) হতে পারে। পুরো কাইট্রা দেখতে প্রায় কালোই বলা চলে। তাই নাম হয়েছে কালিকাইট্রা। একদম বুড়োগুলিকে বাদ দিলে বাকি সবার কৃত্তিকাবর্মের চার কিনারা ঘেঁসে একটি এবং পাঁজরার ও প্রান্তীয় শীল্ডের মাঝখান দিয়ে অন্য একটি হলুদ মোটা রেখা চলে গেছে। বক্ষস্ত্রাণের হলুদের মাঝে মাঝে কালোর ছোপ রয়েছে। মাথাটা বেশ বড় ও কালচে। তুণ্ড *(snout)* উপরের চোয়ালের চেয়ে কিছুটা লম্বা। একটা মোটা ডোরা নাকের পিছন থেকে শুরু করে চোখের উপর দিয়ে ঘাড়ে গিয়ে গলার দিকে নেমে গেছে। নাকের নিচে এক ছোপ হলুদ, চোখের ঠিক নিচে হসন্তেরমতো একটি ছোট কালো দাগ ; নিচের চোয়াল হালকা হলুদ : পা গুলি কালো।

কালি কাইট্রার ঘাড়ের শীল্ড চিকন ; অগ্রভাগ সরু ও পশ্চাদভাগ প্রশস্ত। বাচ্চাদের মেরুশীল্ড লম্বার চেয়ে প্রশস্ত বেশি, ঢেউ খেলানো বা সামান্য উঁচু কাঁটাযুক্ত *(keeled)*। বড়দের মেরুশীল্ড বাচ্চাদের চেয়ে সামান্য সরু। তাদের পিঠ কাঁটাযুক্তও নয়। লেজ ক্ষুদ্রাকার এদের আঙ্গুল লিপ্তপাদ যার মানে হলো এরা স্থলচর নয়, জলচর। কালিকাইট্রা একেবারেই নিরামিষাশী। বর্ষার শুরুতে বালুচরে ডিম পাড়ে।

চিত্র ৩.১ : কালি কাইট্টা Hardella thurji (জে. বিজয়া)।

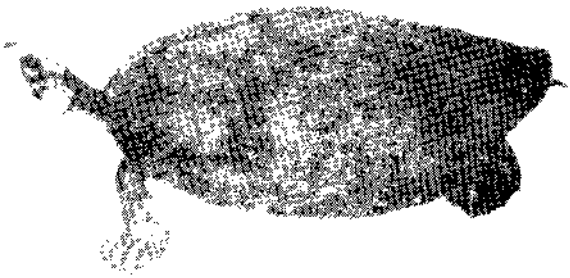

চিত্র ৩.২ : বড় কেটো Batagur baska (গ্রে/ডানিয়েল)

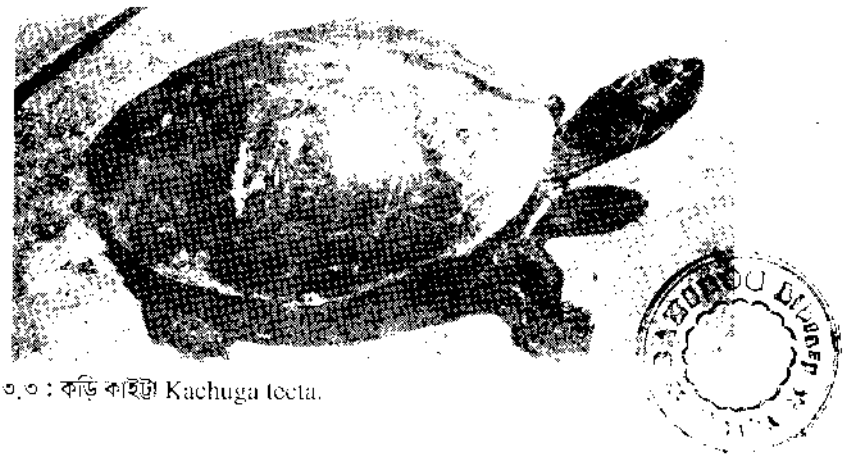

চিত্র ৩.৩ : কড়ি কাইট্টা Kachuga tecta.

চিত্র ৩.৪ : মাঝারি কাইট্টা Kachuga tentoria.

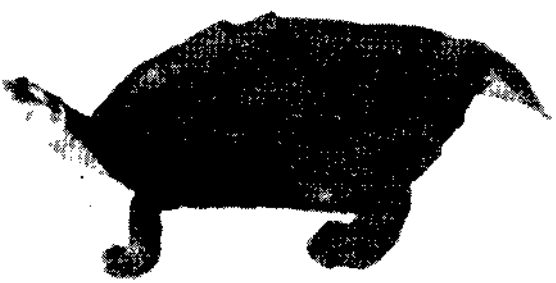

চিত্র ৩.৫ : বড় কাইট্টা Kachuga dhongoka (গ্রে/ডানিয়েল)।

চিত্র ৩.৬ : আদি কড়ি কাইট্টা Kachuga kachuga (গ্রে/ডানিয়েল)।

চিত্র ৩.৭ : শীলা কচ্ছপ Melanochelys tricarinata. টেকনাফের কুদুমগুহা থেকে পাওয়া প্রথম নমুনার ছবি।

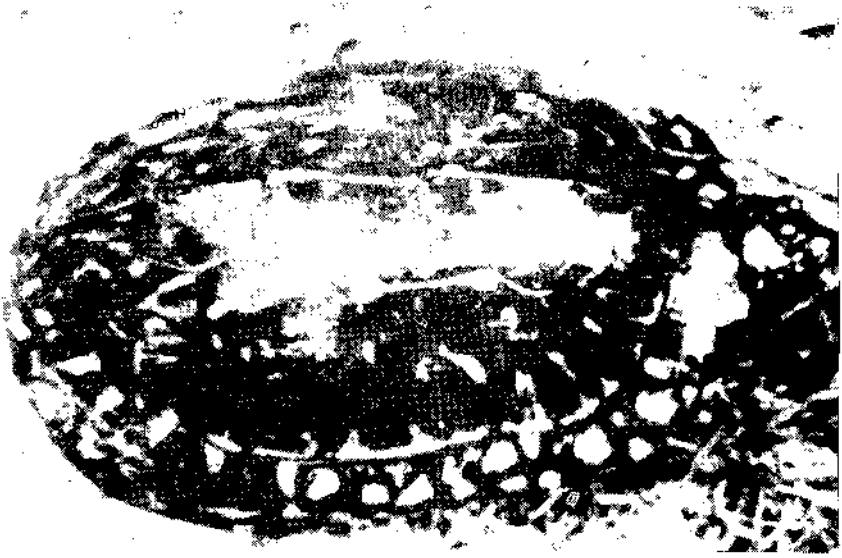

চিত্র ৩.৮ : মগম Geoclemys hamiltoni (এস. আর. সানি)।

চিত্র ৩.৯ : পাহাড়ি কচ্ছপ Geochelone emys (এডওয়ার্ড মল)।

চিত্র ৩.১০ : হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ Geochelone elongata (এডওয়ার্ড মল)

চিত্র ৩.১১ : খালুয়া কাছিম Trionyx gangeticus (এডওয়ার্ড মল)।

চিত্র ৩.১২ : ধুম কাছিম Trionyx hurum.

চিত্র ৩.১৩ : বোস্তামী কচ্ছিম Trionyx nigricans. ১৯৭৫।

চিত্র ৩.১৪ : ছিম কচ্ছিম Chitra indica.

বড় কেঠো *(Batagur baska)*

বড় কেঠো সম্পর্কে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণা ছিল না। কাছিমের উপর প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে প্রথম বারের মতো উল্লেখ করেছি যে, এই প্রজাতি বাংলাদেশের সুন্দরবনের নদীতে আছে। সুন্দরবনের বন বিভাগের [illegible] রেঞ্জের *(Rango)* দক্ষিণভাগের প্রায় সব নদীতে এই কেঠো আছে। সারা বছর নদীতে ঘোরাফেরা করলেও বর্ষার মৌসুমে ডিম পাড়ার জন্যে মোহনার সৈকতে চলে যায়। সুন্দরবন এলাকার হিন্দু এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় এ প্রজাতির মাংস খায়। সারা উপমহাদেশে কেবল সুন্দরবনে এ প্রজাতি আছে। অবশ্য বর্তমানে [illegible] সংসদ সদস্য [illegible] ঢাকা চিড়িয়াখানাকে একটি জ্যান্ত বড় কেঠো দান করেন। বন্ধুবর রসুলসহ একবার চিড়িয়াখানায় গিয়ে একটি জ্যান্ত বড় কেঠো প্রথম দেখি। ওটা ছিল একটা মস্ত কাছিম লম্বায় প্রায় ৫০০ মিমি। ওটির মৃত্যু হয়েছে [illegible] সালে। সাধারণত এরা ৬০০ মিমির বেশি লম্বা হয় না। কাছিমের মধ্যে এর চেয়ে বড় এবং ভারী আর কোনো প্রজাতি নেই। ওজন ২৫ থেকে ৩০ কেজি হতে পারে (চিত্র : ৩.১)।

বড় কেঠোর উপরের এবং নিচের খোলসের প্রতি পাশে তিনটি করে উঁচু চূড়া রয়েছে। এদের দুটি চূড়ায় খাঁজ কাটা যা দেখতে অনেকটা দাঁতের মতো। এদের সামনের পায়ে অবশ্যই চারটি করে নখর থাকবে, বয়স্ক কাছিমের কৃত্তিকাবর্ম বা বক্ষস্ত্রাণ দেখে মোটেও টের পাওয়া যাবে না যে এদের উপরে শীল্ড ছিল। বয়স্কদের কৃত্তিকাবর্ম মসৃণ, [illegible]।

বড় কেঠোর [illegible]

গণ কাছিম (Genus Kachuga)

সবচেয়ে বেশি প্রজাতি [illegible] Kachuga গণের অন্তর্গত। এদের মধ্যে সবাধিক পরিচিত এদেশের সর্বত্র বিরাজমান, [illegible] কড়ি কাইট্টা। [illegible] কড়ি কাইট্টা, [illegible], এবং বড় কড়ি কাইট্টা। অল্প বিস্তর পাওয়া যায় কাচুগা। কাচুগা সিলেটেনসিস পাহাড়ী এলাকায় পাওয়া যায়। ১৯৮৩ সালে প্রথম দিকে সিলেট থেকে একটি কৃত্তিকাবর্ম সংগ্রহ করেছি।

কাচুগার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এদের পিঠ খুব উঁচু, দুপাশে ঢালু, দেখতে অনেকটা ঘরের চালের মতো। তাই এদের ইংরেজি নাম হয়েছে Roofed Turtle। এই গণের প্রায় প্রত্যেকটি মেরুশীল্ডের পিছন দিকটা বেশ সরু ও লম্বাটে। অনেকটা কাঁটার মতো। প্রায় সব প্রজাতির মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ মেরুশীল্ডের সংযোগস্থল সবাধিক সরু। চতুর্থটির অগ্রভাগে অত্যন্ত সরু হয়ে মিশেছে তৃতীয়টির পিছনভাগের সরু কাঁটার মতো প্রলম্বিত অংশের নিচে। চতুর্থ মেরুশীল্ড প্রায়ই লম্বাটে। প্রথম আঙুলে সব সময় তিনটি করে [illegible]; বক্ষস্ত্রাণের আলম্ব খুবই শক্ত। কৃত্তিকাবর্ম [illegible] সাজাবার কাজে ব্যবহার করা যায়।

কড়ি কাইট্টা (*Kachuga tecta*)

সবচেয়ে ছোট খাপড়ার এবং পিঠে অনেক ভোঁতা কাঁটাযুক্ত কড়ি কাইট্টা দেশের সর্বত্র মিঠা পানির জলায় পাওয়া যায়। ডোবায়, পুকুরে এবং বিলে জাল দিয়ে এদেরকে ধরা হয়। কড়ি কাইট্টা বিক্রি হয় ডজন বা শতকরা হিসেবে। নোয়াখালীর বহু খ্রিস্টান বাড়িতে পুরাতন কেরোসিনের টিনে ডজনে ডজনে রাখা হয় এই কাইট্টা। সীতের মৌসুমে এরা বেশি ধরা পড়ে। ঐ সময় জলাশয় শুকিয়ে যাবার ফলে এদের ধরা সহজ (চিত্র : ৩,৩)

একটি স্ত্রী সর্বাধিক ১৮০ মিমি লম্বা এবং দু কেজি ওজনের হতে পারে। সকল প্রজাতির মধ্যে কড়ি কাইট্টার কৃত্তিকাবর্ম প্রান্তীয় দেশ একদম চ্যাপ্টা, মেরু শীল্ডের তৃতীয়টির উপরে পিঠের কাঁটা সব চেয়ে লম্বা এবং সবসময় দ্বিতীয়টির থেকে সবচেয়ে উঁচু এবং তাবুর মতন, পৃষ্ঠদেশ পিরামিডের মতো। কৃত্তিকাবর্ম প্রান্তীয় দেশ একদম চ্যাপটা, মেরু শীল্ডের তৃতীয়টির পিঠের কাঁটা সবচেয়ে লম্বা এবং সবসময় দ্বিতীয়টির থেকে অথবা নিদেনপক্ষে সমান, কখনো ছোট নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ মেরুশীল্ডের সংযোগস্থল খুবই সরু, চতুর্থ মেরুশীল্ড সবচেয়ে লম্বা, খোলা বাদামী, টুই বরাবার একটি লালচে দাগ। বক্ষস্ত্রাণ গোলাপী হলুদ, প্রত্যেক শীল্ডে দু'তিনটে কালো ছোপ। কৃত্তিকাবর্মের প্রান্তীয়দেশ হলুদ অথবা গোলাপী। চোখের পেছনে লালচে মোটা অর্ধচন্দ্র থাকে। ঘাড়, গলা এবং থুতনি দিয়ে লম্বা লম্বা অনেক চিকন হলুদ ডোরা ; পা হলুদ চিতিযুক্ত। কড়ি কাইট্টা নিরামিষভোজী। তবে একুরিয়ামে রাখার সময় এদেরকে গুড়া চিংড়ী খেতে দেখেছি। গ্রামের জলাশয়ে ডুবিয়ে রাখা নৌকার গলুয়ের উপর রোদ পোহানো এবং লোক দেখা মাত্র পানিতে টুপ করে পড়ে যাওয়ার দৃশ্য ভুলবার নয়।

মাঝারি কাইট্টা *(Kachuga tentoria)*

মাঝারি কাইট্টা বাংলাদেশে পাওয়া যায় এ কথা অনেকের অজানা ছিল। যার দরুন ইতোপূর্বে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে এদের উল্লেখ নেই। কড়ি কাইট্টার মতো এরাও স্রোতের নদীর চেয়ে মরা গাং ডোবা পুকর ও জলাশয় বেশি পছন্দ করে। মধ্য বাংলাদেশে এদেরকে যত দেখা যায় অন্যত্র মাঝারি কাইট্টা তত দেখা যায় না। সংখ্যায়ও এরা কড়ির চেয়ে কম। বাংলাদেশে এ দুটি প্রজাতি সিমপেটরিক (sympatric) অর্থাৎ এরা একই স্থানে অবস্থানকারী প্রাণী (চিত্র : ৩.৪)।

আকারে এবং ওজনে কড়ির মতো হলেও মাঝারি কাইট্টাকে কড়ি থেকে সহজেই আলাদভাবে চেনা যায়। মাঝারির দ্বিতীয় মেরুশীল্ডের কাঁটা সবসময় তৃতীয়টির থেকে লম্বা, অথবা সমান, কিন্তু কখনো ছোট নয় (কড়ি কাইট্টার বিপরীত)। চোখের পিছনের লালচে অর্ধচন্দ্রটি প্রায় নেই বললেই চলে। সেখানে আছে কেবল একটি ছোট গোলাপী ফোঁটা। পায়ে কোনো চিহ্নও নেই এবং ঘাড় ও গলার হলুদ ডোরার সংখ্যা কম। উপরন্তু আমার মনে হয়, এদের কৃত্তিকাবর্মের টুই পিরামিডের মতো অত উঁচু নয়। এদের স্বভাব আগের প্রজাতির মতো। এরা বেশির ভাগ উদ্ভিদ খেলেও চিংড়ী ও মাছ পছন্দ করে।

ভাইটাল বা স্মিথির কাইট্টা *(Kachuga smithi)*

আগের দুটি প্রজাতির চেয়ে ভাইটালের বিস্তৃতি বাংলাদেশে খুব অল্প। মাঝে মাঝে এদেরকে পদ্মায় দেখা যায়। কদাচ রাজশাহী বাজারে বিক্রি হয়। শীত মৌসুমে ভারতীয়রা এসে পদ্মা থেকে এদেরকে ধরে নিয়ে যায়। রাজশাহী শহরের বিপরীতে চর খিদিরপুর সংলগ্ন এলাকায় এমন একজন জেলেকে হাজার বড়শী নিয়ে ভাইটাল কাইট্টা ধরতে দেখেছি।

ভাইটাল লম্বায় প্রায় ২৫০ মিমি. স্ত্রী বড়, পুরুষ ছোট ; ওজনে ৬ থেকে আট কেজি। এদের পিঠ পিরামিডের মতো উঁচু নয়। মেরুশীল্ডের কাঁটা খুব বেশি বর্ধিত নয়। প্রথম দুটি মেরু শীল্ড অপেক্ষাকৃত খাটো, তৃতীয় এবং চতুর্থ খুবই লম্বা এবং সামান্য জায়গায় এদের সংযোগ ঘটে। কৃত্তিকাবর্ম বাদামী, মেরু শীল্ডের মাঝখান দিয়ে গাঢ় বাদামী বা কালো ছাপ ; পিঠের কাটা অস্পষ্ট। বক্ষস্ত্রাণ একদম কালো, এর শীল্ডের বাইরের ঘের আবার সাদাটে। দেহের মুক্ত চামড়ার রঙ হাল্কা হলুদাভ বা বাফ (buff) বা ধূসর ; মাথার উপরে গাঢ়। চোখের পিছনে একটি করে স্পষ্ট গোলাপী বা লালচে ফোঁটা আছে। গলায় ও ঘাড়ে লম্বা লম্বা ডোরা। তুণ্ড নিচের চোয়ালের চেয়ে প্রলম্বিত, এর অগ্রভাগ ফুটো করে বেরিয়ে গেছে দুটো নাসারন্ধ্র। চোয়াল বেশ খাঁজ কাটা ; নিচের চোয়াল লম্বা ছুঁচালো ডগাযুক্ত, সবগুলি পা লিপ্তপাদ ; পায়ের আঁইশগুলো আড়াআড়িভাবে বর্ধিত। লিপ্ত পদাঙ্গুলির কারণে এরা খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারে এবং বহুলাংশে মাংসাশী।

বড় কাইট্টা *(Kachuga dhongoka)*

আমার প্রবন্ধে আমিই প্রথম এ প্রজাতির কাইট্টার কথা উল্লেখ করেছি। ঢাকার বুড়ি গঙ্গা, ধলেশ্বরীতে যেহেতু পাওয়া যায় তাই আমার মনে হয় দেশের আধমরা বা মজে যাওয়া নদীর যে অংশে পানি আছে সেখানে বড় কাইট্টা পাওয়া যেতে পারে। তবে বিরল (চিত্র : ৩.৫)।

কেঠো এবং কালি কাইট্টার চেয়ে ছোট এই বড় কাইট্টা সব কাচুগার মধ্যে বড়। লম্বায় স্ত্রী ৪০০ মিমি'র উপর, পুরুষ ২৫০ মিমি পর্যন্ত হয় ওজনে আট দশ কেজি। কৃত্তিকাবর্ম অন্যদের মতো উঁচু নয় বরং চ্যাপ্টাকৃতির ও রঙ বাদামী বা কালচে বাদামী। মেরুশীল্ডের মাঝ বরাবর কাঁটা ভোঁতা হলেও উপস্থিতি বোঝা যায় ও এর উপর দিয়ে দাগ অগ্র পশ্চাৎব্যাপী বিস্তৃত। বক্ষস্ত্রাণ কৃত্তিকাবর্মের তুলনায় ছোট এবং হলুদ। বাড়ন্ত বাচ্চাদের বক্ষস্ত্রাণের প্রতিটি শীল্ডে বেশ বড় লালচে–বাদামী ছোপ থাকে। শরীরের নরম অংশ বাদামী বা হলুদ। একটি সাদা অথবা হাল্কা হলুদ ডোরা নাসারন্ধ্রের পেছন থেকে চোখের উপর দিয়ে ঘাড় অবধি চলে গেছে। বড় কাইট্টা লিপ্তপদাংঙ্গুলি যুক্ত। এরা সর্বভুক।

আদি কড়ি কাইট্টা *(Kachuga kachuga)*

পূর্ববর্তী প্রজাতির মতো বিরল এ প্রজাতিটি পদ্মা এবং যমুনা উভয় নদীতে বাস করে। কেঠো ভুক লোকজনদের পছন্দের কারণে এদের সংখ্যা কমছে। ইতোপূর্বে কেউ বলেন নি যে এ প্রাজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যায় বলে তারা মনে করেন (আহমদ, হোসেন, শফি ও কুদ্দুসের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। স্ত্রী লম্বায় ৩৭৫ মিমি থেকে ৪০০ মিমি, পুরুষ অপেক্ষাকৃত ছোট। ওজন দশ কেজি। কৃত্তিকাবর্ম অনেকটা চ্যাপ্টাকৃতি। কৃত্তিকাবর্ম জলপাই বা বাদামী। মেরুদণ্ডের মধ্যকার কাঁটা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির উপর স্পষ্ট। তৃতীয়টির পিছন এবং চতুর্থটির সম্মুখ ভাগের মিলন ঘটেছে লম্বা জায়গা নিয়ে। বক্ষস্ত্রাণ হলদে। প্রজনন ঋতুতে পুরুষের ঘাড়ে সাতটা লাল বা লালচে বাদামী লম্বালম্বি ডোরা হয়। গলায় একজোড়া লাল অথবা হলুদ আয়ত ফোঁটা ; মাথার উপরি ভাগ উজ্জ্বল লাল এবং পাশটা হয় নীলাভ। এ প্রজাতির নামের উপর ভিত্তি করে কাচুগাগণ স্থাপিত হয়। তাই আমি এর নাম দিয়েছি আদি **কড়ি কাইট্টা** (চিত্র ; ৩.৬)।

সিলেটী কড়ি কাইট্টা *(Kachuga sylhetensis)*

বাংলাদেশে সিলেটী কড়ি কাইট্টার প্রথম নমুনা ১৯৮৩ সালে পাওয়া গেছে। এটি সিলেটের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকা এবং সেই এলাকা সংলগ্ন মোমেনশাহী জেলার উত্তরপূর্ব অংশেও থাকতে পারে। ভারতীয় গারো এবং খাসিয়া পাহাড়মালায় এ প্রজাতি আছে। সংগৃহীত নমুনা এসেছে সিলেট থেকে। ভারতবর্ষের কাছিমকুলের মধ্যে এটা বিরলতম।

স্ত্রী লম্বায় ১৭০ থেকে ১৮০ মি.মি. এবং ওজনে এক দেড় কেজি। এদের পৃষ্ঠদেশ খুবই উঁচু এবং পিরামিডের মতো। মেরু শীল্ডের উপর খুবই স্পষ্ট কাঁটা আছে। এই কাঁটা তৃতীয় শীল্ডের পিছনে সর্বাদিক প্রলম্বিত। প্রথম দুটি মেরুশীল্ডের কাঁটা খুব খাটো। তৃতীয় এবং চতুর্থটির কাঁটা খুবই লম্বা, তাদের মাঝের মিলনক্ষেত্র খুবই সরু। সকল কাইট্টার মধ্যে কেবল এ প্রাজাতির ১২ জোড়া প্রান্তীয় শীল্ড আছে (অন্য সবার আছে ১১ জোড়া) অর্থাৎ ঘাড়ের এবং অধিলেজের শীল্ডসহ প্রান্তিক এলাকায় শীল্ডের সংখ্যা ২৭টি, অন্য সবার আছে ২৫টি।

সিলেটী কড়ি কাইট্টা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এখনো সম্ভব হয় নি।

শীলা কচ্ছপ *(Melanochelys tricarinata* এবং *M. trijuga)*

আমার একজন ছাত্র মোমেনশাহীর নাসিরাবাদ কলেজের সংগৃহীত একটি মেলানোকেলীসের কৃত্তিকাবর্ম নিয়ে আসে। জেলার কোন্ এলাকা থেকে কে সংগ্রহ করেছিল এবং কখন তা জানা যায় নি। তবে নুমনাটি যে এ জেলারই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। কৃত্তিকাবর্ম দেখে মনে হয় ওটা মেলানোকেলীস ট্রাইকেরীন্যাটা। আমি বিগত ১৯৮২ সালের অক্টোবরে কক্সবাজার টেকনাফ সড়কের ৫৫–৫৬ কিলোমিটার দূরে ওয়াইকং বন বিট অফিসের অদূরে কুদুমগুহায় এক জোড়া শীলা কচ্ছপ সংগ্রহ করি। চাকমারা ওটাকে ঐনামেই ডাকে (চিত্র : ৩.৭)।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শীলা কচ্ছপ জামালপুর থেকে, পাহাড়ি অঞ্চল হয়ে সিলেট এবং সেখান থেকে কুমিল্লা, নোয়াখালী হয়ে সুদূর টেকনাফ পর্যন্ত পাহাড়ি এলাকার মধ্যে বিস্তৃত ছিল। প্রিচারডের এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে মনে হয় দ্বিতীয় প্রজাতিটি হয়ত বা দেশের উত্তরাঞ্চলের শুষ্ক এলাকায় থাকতে পারে।

প্রথম প্রজাতির কৃত্তিকাবর্মের রঙ শুকনো খোরমা বা আলুবোখারার মতো ; লম্বায় ১৫০ মি.মি. ; এবং প্রায় এক কেজি ওজন। মেরু অঞ্চলস্থ ও তার পাশে তিনটি উঁচু সারি খুবই স্পষ্ট। এদের রঙ গাঢ়ো বাদামী, কৃত্তিকাবর্ম লম্বাটে এবং মেরু এলাকায় উঁচু বক্ষস্ত্রাণ হলুদে-বাদামীতে মিশানো। মাথা এবং পা গাঢ় আলুবোখারার রঙ অথবা কালো। মাথার পাশ দিয়ে নাসারন্ধ্র থেকে কানের পর্দা পর্যন্ত একটি মোটা লাল দাগ আছে। নিচের চোয়ালের ত্রিকোণ ঘিরেও একটি লাল মোটা ডোরা বিদ্যমান। পায়ে কখনো কখনো হলুদ ফোঁটা থাকে।

ট্রাইজুগা প্রজাতির বক্ষস্ত্রাণ হয় একদম কালো অথবা বাদামী, খোলাও হয় সম্পূর্ণ কালো অথবা বাড়ন্ত নমনীয় ঘাড় বাদামী রঙ হতে পারে। নাসিরাবাদ কলেজের ট্রাইকেরীন্যাট্যার প্রান্তদেশীয় শীল্ডের বাইরের দিক অনেকটা ঢেউ খেলানো।

ডিবা কচ্ছপ/কাছিম *(Curora amboinensis)*

বিগত ১৯৮১ সালের জুলাই মাসে বন্ধুবর রমুলাস হুইটেকারের সাথে কক্সবাজার এলাকায় হন্যে হয়ে রামগদি বা রিং লিজার্ড নামক গুঁই সাপ খুঁজছিলাম। পাম ওয়েল বাগানের পাশে, আরাকান রাস্তার উপর হঠাৎ দেখলাম একটা প্রাণী রাস্তা পার হচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে ওটা উদ্ধার করলাম। রমুলাস এবং জাপানী বিজ্ঞানী টমি হিকিদা দুজনেই চিৎকার করে উঠলো 'বক্স টারটল' বলে। এই হলো বাংলাদেশে ডিবা কচ্ছপের উপস্থিতি সম্পর্কে প্রথম নজির। শুধু তাই নয় মালয়ান বা এশিয়াটিক বক্স টারটল নামের এ কচ্ছপটি আজ পর্যন্ত পূর্ব বার্মার টেনাসসেরীম অঞ্চলের পশ্চিম এলাকায় পাওয়া প্রথম নজির। **বাংলাদেশ এবং ভারতীয় উপমহাদেশে এদের উপস্থিতির জন্য আমার সংগৃহীত নমুনাটি প্রথম প্রমাণ।**

স্বভাবতই ডিবা কচ্ছপ আমার দেয়া বাংলা নাম। ডিবা বা বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিলে যেমন ভিতরের মালসামান সব নিরাপদ, এ কচ্ছপটিরও তাই। এদের বক্ষস্ত্রাণের শীল্ড এবং তার নিচের হাড়গুলির মাঝখানে একটা কব্জির মতো আছে। ফলে যে কোনো কারণে ভয় পেলে শরীরের সর্বাংগ খাপড়ার ভেতর ঢুকে যায়। বক্ষস্ত্রাণ তখন খোলার সাথে সেঁটে যায়। দেখতে মনে হয় একটা ডিবা বা বাক্স। সংগৃহীত কচ্ছপটির খোল কালো। বক্ষস্ত্রাণ-এর শীল্ডের উপর কালো কালো ছাপ আছে। মাথা, গলা ঘাড়ে বিভিন্ন রঙ এবং ডোরা আছে। কচ্ছপটি ছিল স্ত্রী । এবং এক বছর ধরে সে আমার বাসায় ছিল। প্রথমে শুধু কলা খেত পরে সে মাছ এবং চিংড়ী খুব পছন্দ করত। বুনো কচ্ছপ পারতোপক্ষে কলা খায় না। আমার বাসায় আসার মাস খানেকের মাথায় সে একটা ক্যাপসুলাকৃতির প্রায় ৩০ মি.মি. লম্বা সাদা ডিম পেড়েছিল। তবে ডিবা কাছিমের চেয়ে অধিক চঞ্চল আমার সাড়ে তিন বছরের মেয়ে মুনিয়া সে ডিমকে আর বাড়তে দেয়নি।

হলদে কাইট্টা *(Morenia petersi)*

বই পুস্তক থেকে মনে হয় হলদে কাইট্টা বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র পাওয়া যায় না। প্রিচারডের এনসাইক্লোপিডিয়ার মতে এ প্রজাতি পাওয়া যায় যশোহর জেলা, ঢাকা জেলা এবং বাংলাদেশের ফতেহগড়ে। অতএব এ প্রজাতি আমাদের নিজস্ব এবং এদেশের স্থানীয় প্রাণী। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় প্রবন্ধ থেকে জানা গেছে এ প্রজাতি ভারতে বেশ পাওয়া যায় (ব্যক্তিগত আলাপ : ইন্দ্রনীল দাশ, কলিকাতা)। পটুয়াখালী সংলগ্ন সুন্দরবন এলাকা থেকে মোমেনশাহীর গারো পাহাড় পর্যন্ত এবং সমুদ্রপোকূল ও খাড়ি অঞ্চল বাদে সর্বত্র হলদে কাইট্টা পাওয়া যেতে পারে। এ কাইট্টা মোমেনশাহী জেলার ভালুকা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। খেতেও নাকি সুস্বাদ।

স্ত্রী প্রায় ২০০ মিমি লম্বা হয়। পুরুষ ছোট। স্ত্রীদের দেহ পিরামিডাকৃতি। পুরুষের পৃষ্ঠদেশ অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টা। আমি এ পর্যন্ত যতগুলো নমুনা পেয়েছি তার প্রায় প্রত্যেকটিতে অস্পষ্ট চোখাকৃতির ফোঁটা (ocelli) বিদ্যমান ছিল । কাইট্টার কৃত্তিকাবর্ম খুবই শক্ত এবং মোটামুটি হলুদাভ। প্রকৃতিতে মিশ্র খাবার খেলেও একুরিয়ামে চিংড়ী ও মাছ খেতে পছন্দ করে। নদীর চেয়ে বদ্ধ জলাশয়ে বেশি পাওয়া যায়।

মগম বা কালো কাইট্টা *(Geoclemys hamiltoni)*

মগম দেশের বিল-বাওর ও হাওর এবং পুরাতন পুকুর ও পরিষ্কার পানির জলাশয়ে বিস্তর পাওয়া যায়। দেশের হিন্দু সম্প্রদায় এদের খেয়ে থাকে। বড়শী দিয়ে বা শীতকালে কাদার নিচ থেকে এদের ধরা হয় (চিত্র : ৩.৮)।

মগম ৩৫০ মি.মি. লম্বা এবং সাত আট কেজি ভারী হয়ে থাকে। কৃত্তিকাবর্ম যথেষ্ট উচু এবং মেরু দেশীয় শীল্ডের কাঁটার সংখ্যা তিন। কৃত্তিকাবর্ম সম্পূর্ণ কালো। এর পাঁজরার এবং প্রান্তদেশীয় শীল্ডের উপর হলুদের ছোপ বা চিহ্ন থাকতে পারে। বক্ষস্ত্রাণ হলুদাভ। মাথা ভারী এবং কালো। মাথা, গলা এবং সবগুলো পায়ে হলুদের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হয়। তবে এ সবই হাল্কা। প্রায় প্রতি শীল্ডের মাঝে একটি বড় খাদ আছে। সামনের পাগুলির সামনের দিক প্রশস্ত ফিতাকৃতির আঁইশে মোড়া। এরা মাংসাশী এবং শামুক এদের প্রিয় খাদ্য।

গোত্র : টেস্টুডিনিডী (Family Testudinidae)

সব কাছিমের মধ্যে কোনোটিকে যদি প্রাগৈতিহাসিক বলে মনে হয় তবে তা হবে সম্পূর্ণভাবে ডাঙায় বাস করা কচ্ছপদেরকে। ভারী শরীর নিয়ে অত্যন্ত শম্ভুক গতিতে চলে। বিরাট দেহ নিয়ে অত্যন্ত ধীরে যদি কোনো প্রাজাতিকে চলতে দেখা যায় তবে তাকে ডাইনোসর আমলের বলতে মন্দ লাগবে না। পৃথিবীর প্রাচীনতম কাছিমের জীবন্ত প্রজাতি এই কচ্ছপ গোত্রের অন্তর্গত।

কাছিমের আবির্ভাবের উষালগ্ন থেকে আজ অবধি বেঁচে আছে কচ্ছপদের বেশির ভাগ প্রজাতি। এই বেঁচে থাকার জন্য এদের দেহের ভিতরকার অঙ্গসংস্থানসমূহের আদৌ কোনো পরিবর্তন হয় নি। তবে এরা বহু কোটি বছরের ধকল সইলো কি করে?

প্রকৃতির সকল খামখেয়ালির সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য কচ্ছপরা যা করেছে তা হলো গতিহীনতা এবং শরীর লোহার মতো শক্ত বর্মে ঢেকে রাখা। সব কাছিম প্রজাতির চেয়ে কচ্ছপদের কৃত্তিকাবর্ম শক্ত এপিডারমাল শীল্ডের উপর গোলাকৃতি বা বলয়াকৃতি (annuli) গভীর দাগ বসে থাকে। সাধারণভাবে প্রতিটি বলয় এক এক বছর নির্দেশ করে। সামনের পা চ্যাপ্টা ; পায়ের সামনের দিকে খুব বড় বড় শক্ত আঁইশ আছে। পিছনের পা হাতির পায়ের মতো গোলাকৃতি ও থামের মতো ; প্রচুর পরিমাণ ঢিলা চামড়া আছে পায়ের উপরে ; চলাচলের সময় এগুলোর ভাঁজ খোলা ও পা গোটানো পরিষ্কার নজরে পড়ে। এদের কণ্ঠশীল্ড এমনভাবে উঁচু এবং অধিলেজুর শীল্ড নীচু হয় যে যখন এদের হাত, পা ও খাটো লেজ গুটিয়ে বর্মের ভিতরে নেয় তখন শরীরের নরম মাংস বাইরে থেকে স্পর্শ করার কোনো ক্ষমতা কারোর নেই। কৃত্তিকাবর্মের ভিতর ঢুকানো মাথাটার কিছু অংশ উন্মুক্ত থাকে। সামনের পা গুটানোর সময় কনুই খোলা এবং বক্ষস্ত্রাণের সম্মুখ ভাগের, অগ্রপশ্চাৎ বরাবর সেটে যাবার সময় দুদিক থেকে মাথাকে ঢেকে ফেলে।

সব কচ্ছপের পিছন পায়ের আঙ্গুলে দুটোর বেশি কোনো কড়া নেই । কাইট্রাদের ক্ষেত্রে অন্তত একটি আঙ্গুলে দুই এর বেশি কড়া আছে। মাথার সামনে বেশ আঁইশ আছে। সামনের পায়ে আঁইশের সংখ্যা অনেক। উরু শীল্ডে বড় গুটিকা আছে। সামনের এবং পেছনের নখের সংখ্যা যথাক্রমে পাঁচ এবং চার। লেজের অগ্রভাগে কোনো নখর নেই। খোলা বা বক্ষস্ত্রাণের কোনো কব্জি নেই। পৃষ্ঠাদেশ বেশ উঁচু।

পাহাড়ি কচ্ছপ *(Manouria emys)*

বাংলাদেশে যেসব প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায় এটা তাদের অন্যতম। পৃথিবীতে প্রজাতিটি সর্বাধিক ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। জিওকিলোন গণের দুটি করে প্রজাতি আফ্রিকা মহাদেশে, একটি ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ এশিয়ায় দুটি, সিলেবিসে একটি, পশ্চিম আমেরিকায় একটি এবং গালপ্যাগোজ দ্বীপপুঞ্জে বহু উপ-প্রজাতিসহ একটি প্রজাতি আছে। এই গণ বাংলাদেশে পাওয়া যায় একথা অধ্যাপক হোসেন প্রথম উল্লেখ করেন। তিনি যে খোলাটি বান্দরবন জেলার রাইংখিয়ং রির্জাভ বন থেকে সংগ্রহ করেন সেটি আসলে হচ্ছে জিওকিলোন ইমাইস। টেস্টেভু নামটির পরিবর্তে বর্তমানে এদেরকে জিওকিলোন বলে (ও নাম পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান নাম *Manouria)*। পাহাড়ি কচ্ছপ বনাঞ্চলে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর বনাঞ্চলে খুবই কম। ধরা অত্যন্ত সহজ বিধায় পাহাড়িরা এদেরকে খুব সহজে ধরে ও মজা করে খায়। যার ফলে কচ্ছপদের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমে গেছে। এখন খুবই বিরল। বৃটিশ এবং অপরাপর বিজ্ঞানীরা মনে করতেন আসাম থেকে বার্মা হয়ে বোর্নিও দ্বীপ পর্যন্ত অঞ্চলে পাহাড়ি কচ্ছপ পাওয়া যেত (চিত্র : ৩.৯)।

এশিয়ার কচ্ছপদের মধ্যে এটি সর্ব বৃহৎ। পাহাড়ি কচ্ছপের কৃত্তিকাবর্মের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ মি.মি. ওজন ২০ থেকে ৩০ কেজি। কৃত্তিকাবর্ম বাদামী বা কালো। ঘাড়ের শীল্ড দৃষ্টিগোচর, অধিলেজুর শীল্ড এক জোরা। বক্ষস্ত্রাণের রং বেশ হাল্কা। কণ্ঠশীল্ড এমনভাবে প্রলম্বিত যে, কৃত্তিকাবর্ম এবং বক্ষস্ত্রাণের দৈর্ঘ্যে খুব বেশি একটি হেরফের

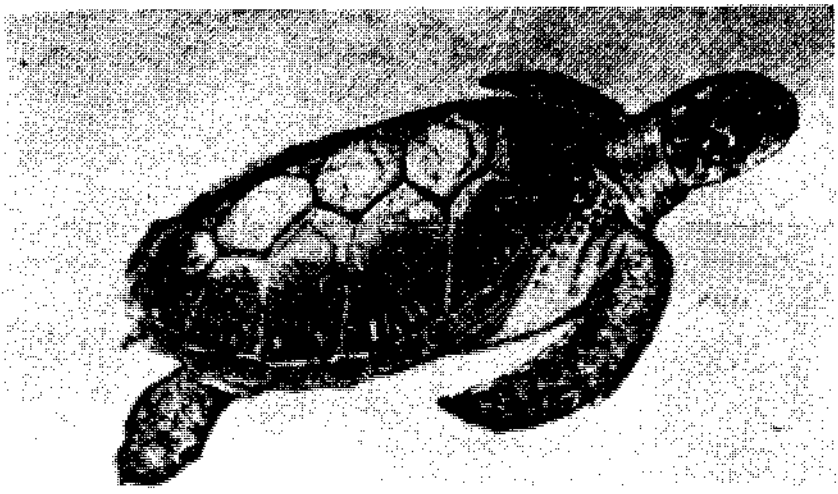

চিত্র ৩.১৫ : সবুজ কাছিম Chelonia mydas (এ. ঘনশেখর)।

চিত্র ৩.১৬ : জলপাইরঙা কাছিম Lepidochelys olivacea. নভেম্বর ১৯৮৪, সেন্টমার্টিন্স।

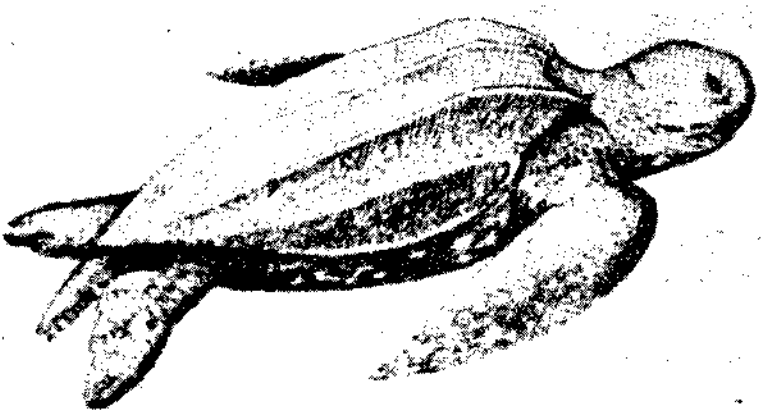

চিত্র ৩.১৭ : লেদারব্যাক টারটল Dermochelys coriacia (এ. ঘনশেখর)।

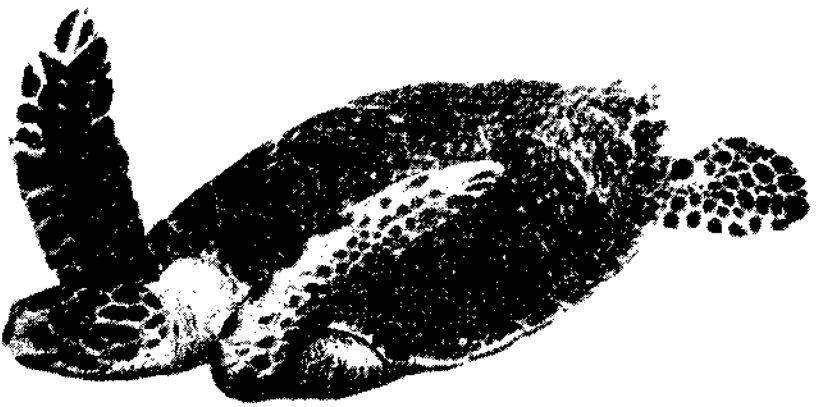

চিত্র ৩.১৮ : হক্‌সবিল টারটল Eretmochelys imbricata (বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল)।

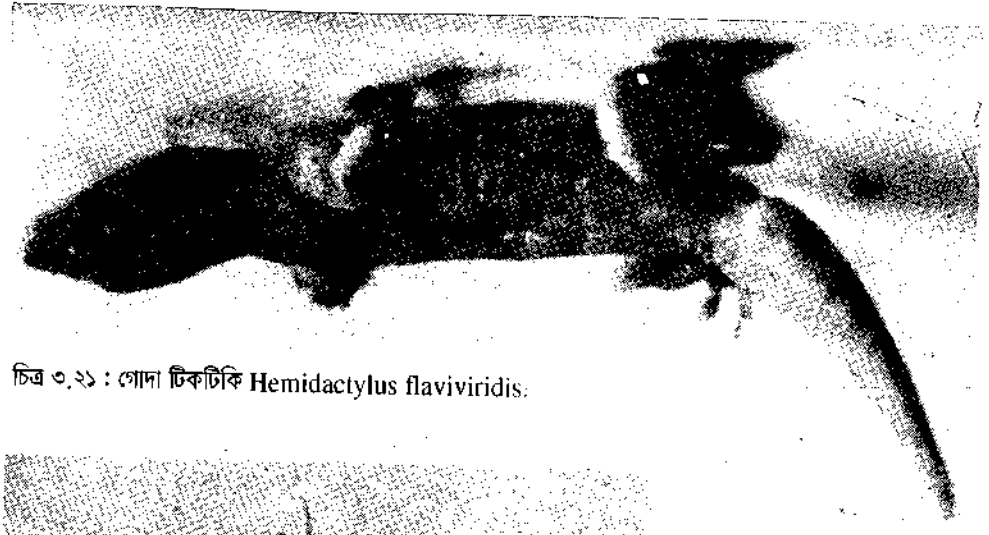

চিত্র ৩.২১ : গোদা টিকটিকি Hemidactylus flaviviridis.

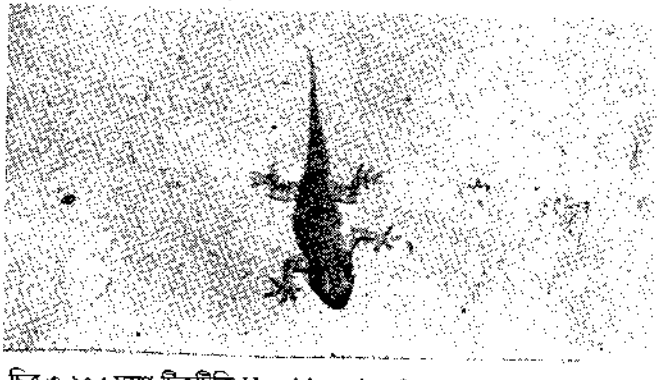

চিত্র ৩.২০ : মসৃণ টিকটিকি Hemidactylus frenatus.

চিত্র ৩.১৯ : খসখসে টিকটিকি
Hemidactylus brooki.

চিত্র ৩.২২ : তক্ষক Gekko gecko (এস. আর. সানে)।

চিত্র ৩.২৩ : রক্তচোষা Calotes versicolor (নিউম্যান এবং ডেনজাও)।

চিত্র ৩.২৪ : আনজন Mabuya carinata (আনিসুজ্জামান খান)।

চিত্র ৩.২৫ : তিন প্রজাতির গুই সাপ। শালনা, গাজীপুর, ১৯৮০।

চিত্র ৩.২৬ : সোনা গুই Varaus flaviscens, বরিশাল, ১৯৮০।

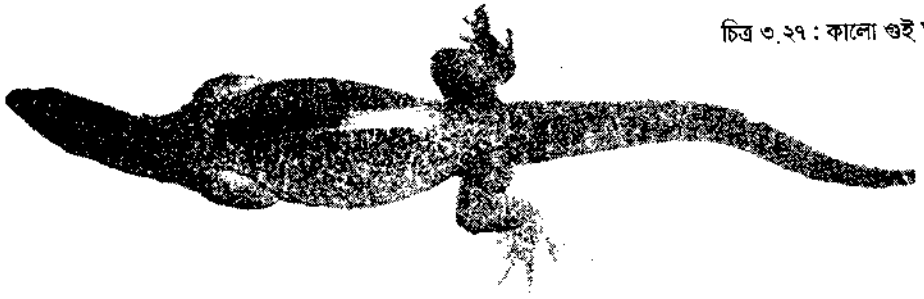

চিত্র ৩.২৭ : কালো গুই Varanus bengalensis. ঢাকা, ১৯৮১।

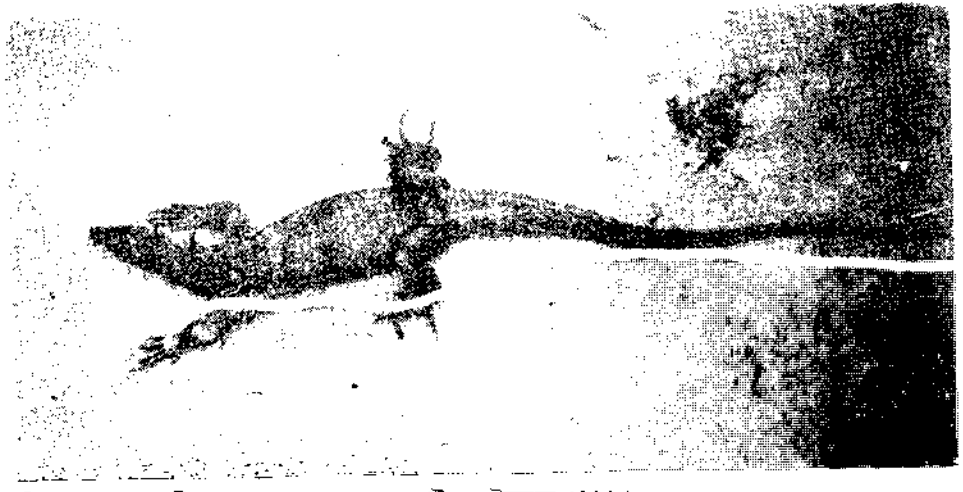

চিত্র ৩.২৮ : রামগদি Varanus salvator. ওয়াইকং, টেকনাফ, ১৯৮১।

হয় না। বক্ষোপরি শীল্ড একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ফাঁকযুক্ত, যে ফাঁক প্রায় দখল করেছে উদরি এবং প্রগণ্ডাস্থিত শীল্ডের অংশ। সামনে পায়ের সম্মুখভাগ মোটা, ভারী, সুঁচালো আঁইশ একে অপরকে আংশিক আবৃত করে রাখে।

পাহাড়ী কচ্ছপের প্রজনন এবং স্বভাব সম্পর্কে দুনিয়াতে খুব সামান্য কাজ হয়েছে। এরা তৃণভোজী প্রাণী।

হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ *(Indotestudo elongata)*

এই প্রজাতিটির আমার প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয় ১৯৭৮-এর এপ্রিল মাসে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাবলাখালী এলাকার একজন চাকমা ধরেছিল কচ্ছপটি। এর পর থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে কয়েকটি বান্দরবন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার গভীরবন দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ এই দুটি জেলার বনেই অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। এরা পাহাড়ি কচ্ছপের মতো এত বিরল নয়। তবে সংগ্রহ করা সহজ বিধায় এদের সংখ্যাও দিনদিন কমছে (চিত্র : ৩.১০)। ইদানিং, বৃহত্তর সিলেটে এটি পেয়েছি। হলদে পাহাড়ি কচ্ছপ লম্বায় প্রায় ২০০ মি.মি. এবং দেড় থেকে দু'কেজি ভারী হতে পারে। এ কচ্ছপের দেহ অপেক্ষাকৃত সরু। দেখতে হলুদাভ। এ কচ্ছপের কৃত্তিকাবর্মের প্রায় সব শীল্ডেই কিছু কিছু কালোর ছাপ দেখা যায়। মাথায় এবং সামনের পায়ে প্রচুর আঁইশ আছে। এ-কচ্ছপ ফল খেতে পছন্দ করে।

প্রজনন ঋতুতে সঙ্গমের সময় পুরুষ এক ধরনের জোর শব্দ করে যা শুনতে আমাদের কাশির শব্দের মতন মনে হয়। সিলেটবাসীরা এ শব্দ থেকে প্রজাতি চিহ্নিত করে।

গোত্র : ট্রাইওনিকিড়ী (Family Trionychidae)

এই গোত্রের সব কাছিমকে অন্য গোত্রের সকল কাছিম থেকে আলাদা করা যায়। এ কাছিমদের কৃত্তিকাবর্মের সব অংশই অপেক্ষাকৃত নরম। কৃত্তিকাবর্মের প্রান্তীয়দেশ খুবই নরম দোলন ক্ষমতাসম্পূর্ণ এবং অনেকটা ফ্ল্যাপ আকৃতির (flap)। সে থেকে এ কাছিমদের ইংরেজি নাম হয়েছে Flapshell। এদের প্রত্যেক পায়ে কেবল ৩টি করে নখর আছে। একটি বাদে বাকি সব গণের নাসারন্ধ্র বেশ লম্বা বৃত্তের মাথায় স্থাপিত। এ গোত্রের দুটি প্রজাতির তিনটি একই গণের এবং বাকিরা ভিন্ন গণের অধীনে। এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে।

সুন্দী বা চিতি কাছিম *(Lissemys punctata)*

সুন্দী কাছিম নদীর চেয়ে বদ্ধ পানিতে বেশি থাকে। দেশের সর্বত্র উপযুক্ত পরিবেশে এই কাছিম যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। শীতের প্রারম্ভে পুকুরের পানি টান দিতেই সুন্দী কাছিম কাদার ভিতর ঢুকে যায়। তখন কাছিম-ধরা এসে কোচ দিয়ে সমানে পুকুরের পাড় ছিদ্র করত। কোচের ফলা গিয়ে বিধতো সুন্দীর কৃত্তিকাবর্মে। সঙ্গে সঙ্গে তারা নরম মাটি সরিয়ে সুন্দী বের করত।

সুন্দী হচ্ছে নরম চামড়ার সব চেয়ে ছোট প্রজাতি। স্ত্রী ২০০ থেকে ২৭০ মি.মি. এবং ওজনে বড় জোর পাঁচ কেজি। সুন্দী সবচেয়ে সুন্দর। এদের মাথা, গলা এবং খোলা হলুদ দাগ ও ফোঁটায় ছেয়ে থাকে। অন্য সব প্রজাতির চেয়ে এদের পিঠ উঁচু। কৃত্তিকাবর্মের ফ্ল্যাপ অতো প্রশস্ত নয়। নাসিকার বৃন্ত বেশ খাটো। সবার মধ্যে এরা কেবল হাতগুলো এবং মাথা এমনভাবে খোলসের ভিতর গুটিয়ে নিতে পারে যে বাইরে থেকে আঘাত হানা কঠিন। একাজে অতিরিক্ত সহায়তা করে বক্ষস্ত্রাণের সম্মুখভাগ যা উপরের দিকে বেঁকে যায়। তখন খোলসের বর্ধিত সম্মুখভাব হয় নীচু। ঠিক একই কায়দায় বক্ষস্ত্রাণের এবং খোলার শেষ প্রান্ত একে অপরের দিকে ঝুঁকে খোলসের অংশ ঢেকে দেয়। লেজ ছোট হওয়ার ফলে এ কাজটি আরো সহজ হয়েছে। বক্ষস্ত্রাণ সাদা। সর্বমোট সাতটি (তিন জোড়া এবং এককভাবে একটি) বক্ষস্ত্রাণ কড়া (callosities) আছে। অন্যদের আছে ৪টি। বর্ষার আগে ডিম পাড়ে। এরা সর্বভুক হলেও মাছ খেতে খুব পছন্দ করে। খুলনা ও বরিশাল জেলার হাটে বাজারে প্রচুর বিক্রি হয়। মাংস সুস্বাদু।

খালুয়া বা গঙ্গা কাছিম (*Aspideretes gangeticus*)

পাহাড়ি নদী বাদে বাংলাদেশের সকল বড় বড় নদীতে এবং বর্ষার শাখা নদীসমূহে খালুয়া কাছিম পাওয়া যায়। মিঠা পানির কাছিমের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ এই প্রজাতি সাধারণত ৫০০ মিমি হলেও বয়স্কা স্ত্রী কখনো ৭০০ মিমি এবং ওজনে ১০০/১১০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এদের দেহ তুলনামূলকভাবে চ্যাপ্টা। কৃত্তিমাবর্মের ফ্ল্যাপ পিছন দিকে বক্ষস্ত্রাণ থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। এদের জলপাই রঙের মাথার উপরে ও পাশে রেখাকৃতির দাগ থাকে যা আর অন্য কোনো প্রজাতিতে নেই। অন্তত আমাদের দেশে পাওয়া যায় ট্রাইওনিক্সের এমন কোনো প্রজাতি নেই। এদের নাসারন্ধ্রের বৃন্ত বেশ লম্বা এবং দৃষ্টিগোচর। বক্ষস্ত্রাণ রঙহীন এবং সাদা। কেবল ৪টি বক্ষস্ত্রাণ কড়া আছে। পিঠের রঙ জলপাই বা সবুজাভ। খালুয়া কাছিম সাঁতারে খুব পটু। এরা প্রাণী, উদ্ভিদ এবং গলা–পচা শব খেয়ে জীবন ধারণ করে। দীর্ঘ সময় বালুচরায় রোদ পোহায় অথবা পানির উপর মুখ তুলে ভেসে থাকে। নরম চামড়ার বৃহদাকার সব কাছিমের মতো এটিকে শক্ত টেটার সাহায্যে গেঁথে, বড়শী দিয়ে বা জালের সাহায্যে ধরা হয়। দেশে ও বিদেশে এদের যথেষ্ট কদর আছে। বরিশালে এক কেজি ১৪/১৬ টাকা, ঢাকাতে ২০ এবং চটগ্রামে ১৬ টাকা কেজি বিক্রি হয় । এ দাম এখন অনেক বেড়েছে। (চিত্র ; ৩.১১)।

ধুম কাছিম (*Aspideretes gangeticus*)

ধুম কাছিম ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের নদী নালায়, বিল বাওরে পাওয়া যায়। প্রায় সারা বছর এ কাছিম বাজারে উঠে। যদিও শীতের মৌসুমে এদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। শফী এবং কুদ্দুস তাঁদের প্রবন্ধে বলেছেন যে এদের কম পাওয়া যায় ও খাওয়া হয় ; একথা বোধ হয় মোটেই ঠিক নয় (চিত্র : ৩.১২)।

ধুম কাছিম দৈর্ঘ্যে ৩০০ থেকে ৩৫০ মিমি এবং ওজনে ১৫ থেকে ৩০ কেজি। ধুম কাছিমের কৃত্তিকাবর্মের রঙ হালকা বাদামী বা মেটে রঙের। এদের মাথার উপর, চোখের

পাশে এবং নাসারন্ধ্রের গোড়ায় বিদ্যমান হলুদাভ ছোপ বা ফোঁটা থেকে এ প্রজাতিকে অন্য সব প্রজাতি থেকে আলাদা করা যায়। এ সব ফোঁটা অন্য প্রজাতিতে নেই। বক্ষস্ত্রাণ সাদা, বক্ষস্ত্রাণ-কড়া চারটি এবং নাসারন্ধ্র-বৃত্ত বেশ লম্বা।

বাচ্চা খালুয়া কাছিম খুবই সুন্দর। পিঠের জলপাই রঙের উপর হলুদ তিলক ও দাগ। কৃত্তিকাবর্মের উপর থাকে একটি অতি দর্শনীয় চোখাকৃতির ফোঁটা।

এরা সর্বভুক প্রাণী। সারা দেশের যত বাজারে ঘুরেছি তার মধ্যে ধুম কাছিমের সংখ্যা সর্বাধিক দেখেছি। প্রতিনিয়ত পাওয়া যায় বলে এর দাম অপেক্ষাকৃত কম। বরিশালে দশ থেকে বারো টাকা, ঢাকায় চৌদ্দ থেকে পনের টাকা এবং চট্টগ্রামে বারো থেকে চৌদ্দ টাকা কেজি। রপ্তানিকারকেরা এ প্রজাতির কচ্ছপ সবচেয়ে বেশি বিদেশে পাঠায়। বর্তমানে প্রতি কেজি ১৩০ থেকে ১৫০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

বোস্তামী কাছিম *(Aspideretes nigricans)*

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরতলীর হযরত বায়েজীদ বোস্তামী মাজার সংলগ্ন পুকুরে যে কাছিমটি পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে **বোস্তামী কাছিম**। নামটি দিয়েছি আমি। আন্তর্জাতিক কাছিম বিশারদরা এসব নাম গ্রহণ করেছেন। বোস্তামী কাছিম পৃথিবীর কোথাও, এমনকি বাংলাদেশেরও অন্যত্র পাওয়া যায় না। তবে নিঃসন্দেহে বায়েজীদ বোস্তামী এলাকার অন্যান্য পুকুরে বোস্তামী কাছিম আছে। এ পর্যন্ত অন্তত দুটি জায়গায় এ কাছিম দেখেছি (চিত্র : ৩.১৩)।

একটি স্ত্রী বোস্তামী কাছিম ৮০০-৯০০ মিমি এবং ২০ থেকে ৩০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এই কাছিমের রং কালো। তবে এদের মাথায়, ঘাড়ে, পিঠে ও পায়ের চামড়ার উপর যে সাদা অংশ তা আসলে এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন বোস্তামী কাছিমের উদ্ভব হয়েছে সম্ভবত খালুয়া কাছিম থেকে। দীর্ঘ সময় পুকুরের মধ্যে নতুন প্রজাতি হবার মতন সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এসে গেছে। উপরন্তু এ পুকুরের কাছিমের সাথে খালুয়া কাছিমের মুক্ত মিলন আর সম্ভব নয় বলেই এদের সে বৈশিষ্ট্যসমূহ টিকে থাকছে।

স্থানীয় বাসিন্দা এবং ভক্তেরা অবশ্য মনে করেন হযরত বায়েজীদ তাঁর আদেশ অমান্যকারীদেরকে (জীন) কাছিমের মূর্তিতে পুকুরবন্দি করে রেখেছেন। লোকজন বোস্তামী কাছিমকে বলে গজারী ও মাদারী। পুকুরের কাছিমকে কাঠির মাথায় গেঁথে দেয়া কলা, শুটকী, মুড়ী, পাউরুটি ও ফুসফুস ইত্যাদি যা খাবার দর্শনার্থীরা দেয় তা খেয়েই ওরা জীবন ধারণ করে। এ-কাছিম বর্ষার আগেই পুকুরের পাড়ে উঠে ডিম পাড়ে। পুকুরে ২৫০ থেকে ৩০০টি কাছিম আছে বলে আমার ধারণা। দু' দু'বার আমি এগুলি গোনার চেষ্টা করেছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আমার প্রাক্তন ছাত্র ড. ফরীদ আহসান ও তাঁর ছাত্ররা এদের উপর ব্যাপক গবেষণা করছেন।

ছিম বা চিত্রা কাছিম *(Chitra indica)*

পদ্মা, যমুনা এবং মেঘনার চরাঞ্চলে যে বিশাল আকৃতির কাছিম পড়ে পড়ে রোদ পোহাতে থাকে তারাই হচ্ছে ছিম কাছিম। একটি ছিম কাছিম ৯০০ থেকে ১০০০ মিমি লম্বা এবং ১৫০ থেকে ২০০ কেজি বা তারও বেশি ওজনের হতে পারে। এর চেয়ে বড় আর কোন কাছিম আমাদের দেশে নেই। এদের কচিৎ দেখা যায়। জেলেদের জালে খুব অল্পই উঠে। বাজারে আমার চোখে পড়েনি (চিত্র : ৩.১৪)। ১৯৮৮ সালে দিনাজপুরের বাজারে কয়েকটি নুমনা দেখেছি।

ছিম কাছিমের মাথা দেখে অন্য কাছিম থেকে আলাদা করা যায়। মাথা লম্বা, অপেক্ষাকৃত সরু ও চোখ দুটি মাথার খুব সামনের দিকে নাসারন্ধ্রের একদম পিছনেই। কৃত্তিকাবর্মের সামনে, ঘাড়ের উপর V-আকৃতির ডোরা আছে। সারা কৃত্তিকাবর্মে হাল্কা সবুজ প্রচুর হলুদাভ দাগ আছে। এরা মাংসাশী। মাছ এবং শামুক এদের প্রধান খাদ্য। ছিম কাছিম টেঁটা দিয়ে মারা হয়।

জাতা কাছিম *(Pelochelys bibroni)*

বাংলাদেশের পদ্মা এবং যমুনায় বিরল জাতা কাছিম পাওয়া যায়। বিল-বাওরে অল্প বিস্তর এবং মাঝে মধ্যে মোহনাতে পাওয়া যেতে পারে।

প্রায় ৬০০ মিমি লম্বায় এবং ১৫ থেকে ২০ কেজি ওজনের জাতা কাছিম হাল্কা সবুজ রঙের। বক্ষস্ত্রাণ রঙ বিহীন। এদের মাথা মোটা, তুন্ড ছোট এবং গোলাকার, নাসারন্ধ্রের বৃন্ত খুবই ছোট। এরা সর্বভুক স্বভাবের হলেও মাছ এদের সবচেয়ে পছন্দ। জাতা কাছিমের মাংস সুস্বাদু।

সামুদ্রিক কাছিম

বাংলাদেশে যে পাঁচ প্রজাতির সামুদ্রিক কাছিম আছে তার চারটি হচ্ছে কিলোনিডী *(Chelonidae)* গোত্রের। বাকি একটি ডারমোকেলিডী *(Dermochelyidae)* গোত্রাধীন। ইতোপূর্বে মৎস্যবিজ্ঞানী শফি ও কুদ্দুস পাঁচটি সামুদ্রিক কাছিমের নাম প্রকাশ করেছেন এবং বন্যপ্রাণী বিশারদ জাকির হোসেন তা সমর্থন করেছেন। এদের প্রবন্ধ বাংলা একাডেমীর বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শফি ও কুদ্দুসের প্রবন্ধে আলোচিত কেবল দুটি প্রজাতি যথা ডারমোকেলিস কোরিয়াসিয়া *(Dermochelys coriacea)* এবং ইরিটমোকোলিস ইমব্রিকাটা *(Eretmochelys imbricata)* ছাড়া বাকি তিনটি প্রজাতির সাথে বাংলাদেশের সামুদ্রিক কাছিমদের কোনো সম্পর্ক নেই। শফি ও কুদ্দুস সংযোজিত বাকি তিনটি কাছিম হচ্ছে কিলোনি ইমিস *(Chelone emys)*, কিলোনি অ্যামবয়নেনসিস্ *(Chelone amboinensis)* ও ক্রিছিমিস পিক্টা *(Chrysemis picta)* । কাছিমের উপর সর্বশেষ প্রকাশিত বিশ্বদলিল প্রিচারড প্রণীত এনসাইক্লোপিডিয়াতে সামুদ্রিক কাছিমের তালিকায় এ তিনটি প্রজাতির কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে জিওকিলোন ইমিস এবং কিউরোরা এমবয়নেনসিস বলে দুটি কাইট্টার প্রজাতি আছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে শফি ও কুদ্দুস কিলোনি ইমিস-এর জায়গায় যে ছবি ব্যবহার করেছেন তা আসলে

জিওকিলোন নামক কচ্ছপেরই ছবি। উত্তরে কানাডা থেকে দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত নদ-নদী, জলাশয় হ্রদ এবং সমুদ্র মোহনায় ক্রিছিমিসগণের সকল কাছিমের বাস। অন্তত প্রিচারডের এনসাইক্লোপিডিয়া তাই বলে। কাজেই ক্রিছিমিস পিকটা হচ্ছে নিউ-ওয়ার্লডের প্রাণী। যদি কোনো লোক এদেরকে সুদূর আমেরিকা থেকে বয়ে আনে, তবেই আমেরিকার বাইরে এদের পাওয়া যেতে পারে।

ক্রিছিমিসের ব্যাপারে আমার কাছে যেটা অবাক লাগছে সেটা হলো শফি এবং কুদ্দুস কি করে বলেন যে, "সেন্ট মার্টিন দ্বীপ হতে সংগৃহীত প্রজাতির ওজন ৭ পাউণ্ড !" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে শফি ও কুদ্দুস সংগৃহীত নমুনার মধ্যে যে সব কৃত্তিকাবর্ম আছে তাতে ক্রিছিমিস নেই। সম্ভবত লেখকদ্বয় ভুল পরিচয় দিয়েছেন।

আসলে বাংলাদেশে যে পাঁচটি প্রজাতির সামুদ্রিক কাছিম পাওয়া যায় তারা হচ্ছে কিলোনিয়া মাইডাস *(Chelonia mydas)* বা গ্রিন টারটল, কেরেটা কেরেটা *(Caretta caretta)* বা লগারহেড টারটল, লেপিডোকেলিস অলিভেসিয়া *(Lepidochelys olivacea)* বা অলিভ রিড্‌লেটারটল এবং শফি ও কুদ্দুস উল্লেখিত উপরের প্রথম দুটি প্রজাতি। এখানে আমি যে তিনটি প্রজাতির উল্লেখ করছি তা ইতোপূর্বে শফি ও কুদ্দুস বা হোসেন উল্লেখ করেন নি। বি. এন. এইচ. এর জর্নালে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, Khan 1982a দ্রষ্টব্য।

আমাদের সামুদ্রিক কাছিম পশ্চিমে হরিণভাঙা এবং রাইমঙ্গল নদীর মোহনা থেকে পূর্বের নাফ নদীর মোহনা অবধি বিস্তৃত সমুদ্র সৈকত এবং দেশের ভৌগোলিক সীমার মাঝে বঙ্গোপসাগরে বাস করে। সুন্দরবনের দক্ষিণের বালুবেলা এবং দ্বীপাঞ্চল, সাগর ঘেষা দক্ষিণ বাংলার দ্বীপমালা, সন্দীপ, কুতুবদিয়া সোনাদিয়া, মহেষখালী এবং কক্স বাজার সমুদ্র সৈকত থেকে শাহপরী দ্বীপ এবং সেন্টমার্টিন্স প্রবাল দ্বীপের বা বালুবেলায় এরা ডিম পাড়ে, রোদ পোহাতে আসে। শীতকাল থেকে বর্ষার শুরু পর্যন্ত এদের ডিম পাড়ার সময়। স্থান ও প্রজাতি ভেদে দিন-ক্ষণ পরিবর্তন হয়। আমি কেবল সবুজ সামুদ্রিক কাছিম এবং রীড্‌লেটারটলকে ডিম পাড়তে দেখেছি সোনাদিয়া, কক্সবাজার এবং সেন্টমার্টিন্সের সৈকতে। তাই বাকি প্রজাতির প্রজনন সম্বন্ধে আমার সম্যক জানা নেই। অপরাপর তিনটি প্রজাতির কৃত্তিকাবর্ম সৈকত থেকে সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। কারণ জেলেদের এবং ট্রলার চালিত জালে বেঁধে প্রতি বছর প্রচুর কাছিম মারা যায়। সেসব মৃতদেহ ভেসে আসে সৈকতে। প্রায়ই মরা পচা দেহ সৈকতে পাওয়া যায়। কারণ জেলের জালে যখন বেঁধে যায় তখন এদের পাগুলি বা গলা ধারাল দা বা ছোরা দিয়ে কেটে দেওয়া হয়। এজন্য খাপড়া বাদে বাকী সব অংশ এক এক সময়ে এক একদিকে পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক কাছিমদের বৈশিষ্ট্য : গোত্র কিলোনিডী (Family Chelonidae)

সবার কৃত্তিকাবর্ম একটি অবিভক্ত মোটা চামড়ায় মোড়া (কাছিমের বেলায় যেমন। তবে কাইট্রা ও কচ্ছপদের মতো নয়)। সামনের পা দুটি বৈঠা বা ফ্লিপারের মতো। কোনো আলাদা আংগুল নেই। সবগুলি এক মোড়কের ভিতর বন্দি হয়ে একটি বৈঠার সৃষ্টি

করেছে। সামনের প্রত্যেক পায়ে একটি অথবা দুটি আধ লুকানো নখর আছে। মাথার উপরিভাগে কোনো ছিদ্র নেই (কাছিম, কাইট্টা ও কচ্ছপদের আছে)। বক্ষস্ত্রাণের কণ্ঠাস্থির gular মাঝখানে মধ্যকণ্ঠাস্থি আছে। কোনো সামুদ্রিক কাছিম পা এবং গলা খাপড়ার ভিতর টেনে নিতে পারে না। মাথা ও গলা মোটা এবং যথেষ্ট শক্ত। যাতে সহজে শত্রুরা ঘায়েল করতে না পারে।

কিলোনিডী গোত্রের চারটি প্রজাতি বাংলাদেশে আছে। এদেরকেও বহিঃচরিত্রের উপর ভিত্তি করে আলাদা করা চলে।

সবুজ সামুদ্রিক কাছিম, গ্রিন টারটল (*Chelonia mydas*)

সবুজ সামুদ্রিক কাছিম এ দেশের সমুদ্রতীরবর্তী সকল এলাকায় পাওয়া যায়। মগ চাকমাসহ অপরাপর উপজাতীয়রা এদের ডিম খেয়ে থাকে। এরা সমুদ্রে মাছ ধরে। পাড়ে মাছ শুকাতে এসে গর্ত খুঁড়ে কাছিমের ডিম বের করে এবং সেসব মহা উৎসবে খায়। বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যত্র এদের মাংসের খুব কদর। সবুজ কাছিম সামুদ্রিক সকল প্রজাতির চেয়ে সর্বাধিক শক্ত কৃত্তিকাবর্মের অধিকারী। বৃহদাকার প্রাণীদের কৃত্তিকাবর্ম সবুজ এবং বক্ষস্ত্রাণ সাদা অথবা হাল্কা হলুদ রঙের (চিত্র : ৩.১৫)।

এরা দৈর্ঘ্যে সাধারণত ১০০ মিমি এবং ওজনে ১৫০ থেকে ২০০ কেজি হয়। এদের পাঁজরার শীল্ডের সংখ্যা চার জোড়া। পাঁচটি আছে মেরু শীল্ড ; এগারো জোড়া প্রান্তদেশীয় ; একজোড়া অধিলেজুড় (subcaudal) এবং একটি প্রসস্ত ঘাড়ের শীল্ড আছে। শীল্ডগুলি নরম এবং পাশাপাশি সাজানো (একটি অন্যটির উপর উঠেনি)। মাথা বিশেষ সরু নয় সামনের দিক গোলাকৃতি ; চোয়াল খাঁজাকাঁটা ; মাত্র একজোড়া ললাট-পূর্ব আঁইশ। বক্ষস্ত্রাণে একটি বা দুটি মধ্য কণ্ঠা, কখনো খুব সরু মধ্যবক্ষ শীল্ড থাকে। এদের চার জোড়া করে প্রান্তনিম্নস্থ (inframarginals) শীল্ড আছে। প্রায়শঃই চতুর্থ এবং পঞ্চম মেরুশীল্ডের মাঝে একটি অতিরিক্ত মেরুশিল্ড দেখা যায়। প্রথম পাঁজরার শীল্ডের সাথে ঘাড়ের শীল্ডের যোগাযোগ নেই। ডুবন্ত সামুদ্রিক গাছের বন থেকে বিভিন্ন উদ্ভিদ, জেলিফিশ, ঝিনুক বা সামুদ্রিক শামুক, ইকিনোর্ডাম বা স্পঞ্জ খায়। বাংলাদেশের সমুদ্র-সৈকতে এরা শীতকালে ডিম পাড়ে। মগসম্প্রদায় ডিম খায়।

লগারহেড (*Caetta caretta*)

লগারহেডের মাথা খুবই বড়। অবশ্য তার জন্য এরা যে অধিক মগজের অধিকারী সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই। মোটা মাথার পাশে ঘাড়ের খুব পুরু এবং মোটা পেশী যুক্ত হয়েছে। সে জন্য মাথাটা ভারী দেখায়। লগারহেডের খোলা লালচে বাদামী রঙের। এদের খাপড়া সামনে থেকে পিছন দিকে ক্রমশ সরু ও নিচু হয়ে গেছে। পাঁচটি মেরু এবং পাঁচ জোড়া পাঁজরার শীল্ড বিদ্যমান। অধিলেজুর শীল্ড বাদে প্রান্তদেশীয় শীল্ড ১১ বা ১২ জোড়া। এদের খাপড়া খুব পুরু। খোলার উপরকার শীল্ডগুলি পাতলা এবং পাশাপাশি সাজানো। খোলার পিছনের কিনারা খাঁজ-কাটা। বক্ষস্ত্রাণ হলুদ। এদের তিন জোড়া প্রান্তদেশীয় নিম্নস্থ ছিদ্রবিহীন শীল্ড আছে। অর্ধ প্রাপ্তবয়স্ক লগারহেডের মেরু শীল্ডের

উপর একটি স্পষ্ট কাটার সারি আছে। বাংলাদেশে এদেরকে অল্প বিস্তর দেখা যায়। এরা সর্বভূক প্রাণী হলেও সিলেনটারেট, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, চিংড়ী খেতে পছন্দ করে। এরা লম্বায় ৮০০ মিমি এবং ওজনে ৫০ থেকে ১৫০ কেজি হতে পারে। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে হাতীয়ার কচ্ছপিয়া দ্বীপে একটি মৃত নমুনা পেয়েছিলাম।

জলপাইরঙ্গা কাছিম বা রীড্‌লের সামুদ্রিক কাছিম, অলিভ রীড্‌লে টারটল, (*Lepidochelys olivacea*)

রীড্‌লের সামুদ্রিক কাছিম ৬০০ থেকে ৭৫০ মিমি লম্বা এবং ৪০ থেকে ৫০ কেজি ওজনের হতে পারে। এই প্রজাতির কাছিম ধূসরে সবুজে মিশানো বা জলপাই সবুজ রঙের। এদের খাপড়া খুব প্রশস্ত। প্রান্তনিম্নস্থ শীল্ডের উপর ছিদ্র থাকে। রীডলের কাছিমের মাথা অপেক্ষাকৃত হাল্কা। এদের মেরু অঞ্চল বেশ উঁচু। পিছন দিক চ্যাপটা। এদের পাঁজার শীল্ড তৈরী করে। ফলে এই সংখ্যা পাঁচ জোড়া থেকে ৯ জোড়া অবধি যেতে পারে। মাঝে মাঝে মেরু শীল্ডগুলি ভেঙ্গে পাঁচটার জায়গায় ৮/৯টা হয়ে যায়। সাধারণত এদের দেহে ৬ জোড়া করে পাঁজারার শীল্ড থাকে। মধ্যকণ্ঠাস্থি থাকতে পারে, না-ও পারে। বাংলাদেশে বেশ দেখা যায়। এরা আমিষভোজী তবে শেওলাও খেতে পারে। সেন্টমার্টিন্স দ্বীপে শীতের সময় ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসে, জোৎস্না রাতে বালুবেলায় ডিম পাড়ে। ডিমের শ'বিক্রি হতো ২৫ টাকা করে। টেকনাফ যার দাম ছিল ৪০ টাকা। বার্মা এবং বাংলাদেশের মগ সম্প্রদায় এ ডিম খায়। গড়পরতায় প্রতি বাসায় ১২০টি করে (১০০-১৬০) ডিম পাওয়া যায়। ডিম চুরির ফলে গেলো পাঁচ-সাত বছর কোনো বাচ্চা ওখান থেকে সমুদ্রে নামেনি (চিত্র : ৩.১৬)।

বাজ ঠোঁটো কাছিম, হক্‌সবিল টারটল *(Eretmochelys imbricata)*

হক্‌সবিল কাছিমের মোটামুটি রঙ সবুজ ও বাদামীতে মিশানো থেকে কালো-বাদামী মিশানো হতে পারে। এদের কৃত্তিকাবর্মে মোট ৪টি করে ৮টি পাঁজরার শীল্ড আছে। কৃত্তিকাবর্মের সব শীলড একটি অন্যটির কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত, Imbricate, অন্যদের মতন কাছাকাছি নয়। তবে বাচ্চা এবং বুড়োদের শীল্ড পাশাপাশি হতে পারে। এদের খাপড়া দুপাশ থেকে অপেক্ষাকৃত চাপা এবং পিছন দিকে খাঁজযুক্ত। তবে বুড়োদের খাঁজ নাও থাকতে পারে। বুড়াদের মেরু পাঁজরার শীল্ডের পিছন ভাগ ক্ষয় হয়ে একটার উপর অন্যটা না উঠে, পাশাপাশি থাকতে পারে। বক্ষস্ত্রাণের শীল্ডগুলি হয় একদম হলুদ নয় কমলা-হলুদে মিশানো। চার জোড়া প্রান্তনিম্নস্থ শীল্ড আছে। মাথা অপেক্ষাকৃত সরু, দু'পাশ সমান্তরাল এবং তুণ্ডাগ্র ক্রমশ সরু হয়েছে। চোয়াল ঢেউ তোলা ও খাঁজযুক্ত। তবে পাখির ঠোঁটের মতন বাঁকা নয়। ললাটের সামনে ৬ জোড়া আঁইশ আছে। ঘাড়ের শীল্ডের সাথে প্রথম শীল্ডের যোগাযোগ নেই। গলা অপক্ষাকৃত লম্বা। মাথায় এবং সামনের পায়ের আঁইশগুলি খুবই স্পষ্ট। এগুলি হয় গাঢ় বাদামী অথবা কালো। এরা প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ মিমি লম্বা এবং ওজনে ৫০ থেকে ৮০ কেজি হতে পারে। বাজ-ঠোঁটো কাছিম আমিষভোজী। বাংলাদেশ এই প্রজাতি বিরল (চিত্র : ৩.১৭)

গোত্র : ডারমোকেলিডী (Family Dermochelyidae) এবং

প্রজাতি বৃহত্তম কাছিম লেদারব্যাক টারটল *(Dermochelys coriacea)*

এক গোত্র, এক গণ এবং এক প্রজাতি এই গোত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃত্তিকাবর্ম খুব উঁচু উঁচু সরু সাতটি চূঁড়ায়যুক্ত অনেকটা টিনের ঢেউয়ের মতো। এদের উপরের চোয়াল সূচালো ডগাযুক্ত। এদের পায়ে কোনো নখর নেই। লেদার ব্যাক্‌দের নেই কোনো শীল্ড বা চামড়ার আঁইশ। কৃত্তিকাবর্ম সংকোচনশীল এবং বক্ষস্ত্রাণ অত্যন্ত নরম মনে হবে। এদের কৃত্তিকাবর্ম খুব সুন্দরভাবে মিশে গেছে মোটা এবং ভারী কাঁধ ও ঘাড়ের সাথে। মাথা ভীষণ ভারী, চোখ তির্যকভাবে অবস্থিত। নিচের চোয়ালের সংগমস্থান একটা বাঁকা আংটার মতো হয়েছে ; উপরের চোয়োলের অগ্রভাগের দ'পাশের দুটি চূঁড়া এবং তার পাশে আছে দুটি গর্ত। এদের সম্মুখের পাখনা ফ্লিপার খুবই লম্বা। পিছনের ফ্লিপার চামড়া দিয়ে লেজের সাথে সেঁটে থাকে। এ কাছিম পূর্বাপর কালো রঙের হলেও এদের সর্বত্র সাদা চিতি থাকতে পারে (চিত্র : ৩.১৮)।

পৃথিবীর বৃহত্তম জীবন্ত কাছিম প্রজাতি হচ্ছে লেদারব্যাক। এরা গড়ে ১৩৫০ থেকে ১৫০০ মিমি লম্বা এবং সর্বোচ্চ ৬০০ কেজি পর্যন্ত ওজন হতে পারে বলে প্রিচার্ডের ধারণা। বংলোদেশে এর প্রজাতি সংগৃহীত না থাকায় এ ব্যাপারে তথ্য প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। বৃহদাকার লেদারব্যাকদের একটির মাথা থেকে অন্যটির মাথা পর্যন্ত সামনের ফ্লিপারের দৈর্ঘ্য ২৭০০ মিমি বা নয় ফুট। সমুদ্রকূলে হেঁটে গেলে বালুর উপর ১৮০০ মিমি থেকে প্রায় ২০০০ মিমি পাশযুক্ত দাগ পড়ে। এরা মূলত জেলি ফিশ জাতীয় ও সিলিনটারেট জাতীয় প্রাণী এবং ইউরোকরডেট খায় ; অর্থাৎ এরা মাংসাশী লেদারব্যাক বাংলাদেশে অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।

কাছিম শিকার এবং নিধন

কাছিমের মাংস এবং ডিম খাওয়া বাংলাদেশের জনবসতির একাংশের বহু প্রাচীন খাদ্যাভাস। তিন চার যুগ আগেও নিম্ন বিত্তের হিন্দু এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় কাছিম খেত। কাছিম যারা ধরত তারাও ছিল নিম্নবৃত্তের লোকজন। এই লোকগুলি শীতের শুরুতেই কোঁচ হাতে এবং মাজায় এক ধরনের মোটা ফোকরের জাল বেঁধে আসত কাছিম মারতে। তারা গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। বর্ষার পানি নেমে যাওয়া পুকুর পাড়ে, কাদার মাঝ দিয়ে কোঁচ দিয়ে বা কচুরি পানায় ঢেকে থাকা পাড়ে সমানে আঘাত হানত। কোঁচের আঘাত কাছিমের পিঠে লাগার সাথে সাথে ওসব কেঁঠোধরাদের মুখে হাসি ফুটে উঠত। তারা উৎফুল্ল হতো। এরা কাদা সরিয়ে তুলে আনত নরম খোলের কাছিম। তারা আজও একই ধারায় কাছিম ধরছে।

আরও এক শ্রেণীর লোক, মূলত মুচি শ্রেণী, ৩/৪ মিটার লম্বা, চিকন বাঁশের মাথায় তিন ফলাযুক্ত দেশী টেঁটা বেঁধে নিতো। বাঁশের অন্য মাথায় বাঁধতো দীর্ঘ, হাল্কা, শক্ত এবং একই সাথে চিকন রশি। ছোট্ট নৌকার গলুইতে একজন ঐ টেঁটা হাতে দাঁড়িয়ে থাকত। নৌকায় ১০ থেকে ১৫ মিটারের মধ্যে কোনো কাছিম মাথা তোলার সাথে সাথে সজোরে চালিয়ে দিত টেঁটা। কিন্তু আবার টেঁটা সরাসরি কাছিমের দেহে না মেরে এমনভাবে তাক

করে উর্ধ্বাকাশে মারত যে সেটা পরবর্তী সময়ে অধিক শক্তিতে কাছিমের গলা, মাথা বা শরীরের নরম কৃত্তিকাবর্মে আঘাত হানত। তারপর রশিটিকে ধরে টেনে আনত টেঁটায় গাঁথা কাছিম।

কেউ কেউ টেঁটা কালের সাথে রশি বেঁধে দিতো। ফলে টেঁটা কাছিমের গায়ে বিঁধার সময়ে কাছিম যে উল্টাবাজি করত তাতে টেঁটার কাল বাঁশ থেকে খুলে যেত। অন্যরা টেঁটার কাল তিনটির গোড়া শক্ত করে বেধে বাঁশের ভিতর ঢুকিয়ে স্থায়ীভাবে আটকিয়ে দিত রশি বাঁধা বাঁশের অন্য মাথায়। টেঁটা গায়ে বিঁধার সময়ে কাছিমকে বাঁশসহ পালাতে দেখা যেত।

টেঁটা দিয়ে শীতকালে যমুনা, ধলেশ্বরী নদীর এমন সব জায়গায় কাছিম শিকার হয় বা হতো যেখানে কোনো স্রোত নেই। যেখানে পানি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং বাতাস যে পানিতে ঢেউ তোলে না এমন সব জায়গায়। ময়মনসিংহ, টাংগাইল এবং মানিকগঞ্জের কিছু কিছু এলাকার মুচি বা ঋষিরা এখনও এ কায়দায় কাছিম মারে।

ইদানিং হাজার বড়শী বেঁধে কাছিম ধরা চালু হয়েছে। প্রায় ৩০০ থেকে ১০০০ মিটার লম্বা নাইলনের রশিতে দেড়/দুই সে: মি: দূরে দূরে কয়েক হাজার বড়শী ঝুলানো হয়। ঐ লম্বা রশি নদীর পানিতে নির্দিষ্ট গভীরতায় ডুবান হয়। তার জন্য বয়া জাতীয় জিনিস এবং পাথরের ভার ব্যবহার করা হয় নচেৎ বড়শী গিয়ে ঠেকবে মাটিতে। এখানে নির্দিষ্ট গভীরতায় বড় বড়শী ঝুলনোর অর্থ হলো ঐ গভীরতায় কাছিম বা যে কোনো বড় প্রাণী সাঁতার কাটলে বড়শীতে এলোপাথড়িভাবে গেঁথে যাবেই । ৩/৪ ঘন্টা পর পর রশি টেনে বড়শীতে যা উঠেছে খুলে নিয়ে আবার তা নদীতে ফেলা হয়।

খুব লম্বা প্রায় ৫/৬ সেন্টিমিটার লম্বা বিশেষ বড়শীতে মোটা কেঁচো বা চিংড়ি গেঁথে প্রতিনিয়ত কাছিম ধরছে এক শ্রেণীর জেলে। এভাবে কাছিম এবং কাইট্টা সবচেয়ে বেশি ধরা হয় মেঘনাতে। জাল দিয়েও আজকাল কাছিম ধরা হচ্ছে। বিশেষ করে নাইলনের জাল চালুর পর থেকে।

পাহাড়ি কচ্ছপ ধরা সবচেয়ে সহজ। সিলেট, চট্টগ্রাম, বান্দরবন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় পাহাড়িয়া সম্প্রদায় চিরসবুজ বনাঞ্চলে যত কাছিম পাওয়া যায় তা ধরে এবং খায়। সামুদ্রিক কাছিম এদেশের লোকেরা খায় এমন নজির আমার জানা নেই। তবে মহেশখালী থেকে সোনাদিয়া, কক্সবাজার থেকে সেন্টমার্টিন্স দ্বীপে এবং সুন্দরবনের দক্ষিণ দ্বীপমালার এবং সৈকতে যে সব মগ মাছ ধরতে যায় এবং নিম্ন বিত্তের হিন্দু জেলে যারা অস্থায়ীভাবে একটানা কয়েকমাস সময় ব্যয় করে ওসব অঞ্চলে বাস করে এবং মাছ ধরে তারা সামুদ্রিক কাছিমের ডিম খায়। পুরা শীত মৌসুমে সেন্টমার্টিন দ্বীপে কাছিমের ডিম সংগ্রহ করা হয়। কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে ভ্রমণকারী পর্যটক এবং স্থানীয় রাখাল বালক ও অর্বাচীনরা গর্ত খুড়ে কাছিমের ডিম বের করে তা দিয়ে খেলা করে এবং অবহেলা ভরে কুকুরকে খেতে দেয়। আগের মতো কক্সবাজার সৈকতে কাছিমেরা ডিম পাড়ে না। অতিরিক্ত জনসমাগম এবং সৈকত ঘিরে মোহাজেরদের ঘর-বাড়ি উঠার ফলে অনেক কুকুর সৈকতে বিচরণ করে। বিশেষ করে রাতের শেষভাগে যখন কাছিম ডিম দিবে তখন। সামুদ্রিক মাছ ধরার জালে এবং ট্রলার চালিত জালে অসংখ্য কাছিমের প্রাণনাশ হয়।

কাছিম রপ্তানি

প্রতিবছর হাজার হাজার নয় লাখ লাখ কাছিম রপ্তানি হয় এদেশ থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। কাছিম বন্যপ্রাণী হওয়া সত্ত্বেও কেবল অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকার ফলে মৎস্য বিভাগ কাছিমকে তাদের মৎস্য সম্পদের আওতাভুক্ত করে ফেলেছে। কাছিম দেদার বিদেশে পাঠাচ্ছে। কাছিম যেহেতু মাছ সেহেতু কাছিম রপ্তানিতে সরকারের কোনো আপত্তি নেই। এর জন্য নাকি কিছু রয়ালটি বনবিভাগকে দেওয়া হয়। মজার ব্যাপার হলো, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী কাছিম ধরা নিষিদ্ধ।

নাজির আহেমদ ষাটের দশকের পরিসংখ্যান দিয়ে লিখেছেন ওই সময় থেকেই কাছিমের ব্যবসা হতো পাঁচ/সাত লাখ টাকার। তখনকার লাখ এখনকার কোটিকে ছাড়িয়ে যাবে তা কে না বুঝে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিসংখ্যান মতে ১৯৭৪–৭৫ সাল থেকে, ১৯৭৫–৭৬ অর্থ বছর বাদে, ১৯৮০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ যথাক্রমে টা: ১০০০.০০, টা: ১১,৮৭০০০.০০, টা: ৫৫,২০,০০০.০০, টা: ৬৯,১৪,০০০.০০, ১,২৯,৪৮,০০০.০০ এবং টা: ৫৯,৯৯,০০০.০০ এর জীবন্ত কাছিম রপ্তানি করেছে। এ সময়ে কৃত্তিকাবর্ম এবং মাংস রপ্তানি হয়েছে টা: ১২,৩২,০০০.০০। আমার ধারনা ১৯৮০ সালের নভেম্বরের পর থেকে চলতি সাল পর্যন্ত আরো ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকার কাছিম রপ্তানি হয়েছে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে পরিমাণ রপ্তানি হয় অন্তত তার দ্বিগুণ কাছিম দেশের ভিতরে খাওয়া হয়। অথবা চোরা পথে পাশের দেশে চলে যায়।

ঢাকার মিরপুর, উত্তরা ; নারায়ণগঞ্জ পঞ্চবটী, টেকনাফ, চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরসহ, বহুশহরে রপ্তানির জন্য কাছিমের আড়ত রয়েছে। সেখান থেকে রপ্তানি কারকরা কাছিম কিনে।

অতএব, কাছিম মূলধন ছাড়া ব্যবসার এক বিরাট মাধ্যম। না মৎস্যবিভাগ, না বনবিভাগ এদের উন্নতির জন্য একটি কড়ি খরচ করেছেন। লাখ লাখ টাকার এমন ব্যাবসার আর কি কোনো মসলা বাংলাদেশে আছে?

কাছিমের হাট

ঢাকার নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, বৈদ্যের বাজার, ঠাটারী বাজার, শাখারী বাজার, শ্যাম বাজার, কুমিল্লার চাঁদপুর এবং দাউদকান্দি, চট্টগ্রামের রিয়াজুদ্দিন বাজার, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, লামা, রুমা বাজার, মোমেনশাহীর কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুসং-দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ, ফরিদপুরের বিভিন্ন হাট, খুলনার বড়দল মংগলা, চালনা, চিলা এবং রংপুরের ফুলছড়িতে প্রচুর কাছিম বেচা কেনা হয়। জ্যান্ত কাছিম নৌকা এবং ট্রাকে করে দেশের প্রত্যন্ত কোণ থেকে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় আসে। ঢাকার ও চট্টগ্রামের আড়তদার এবং রপ্তানিকারকরা প্যাকিং করে বিমান যোগে বিদেশে প্রেরণ করে। পরিবহণের সময় প্রচুর কাছিম মারা পড়ে।

কাছিম কমার কারণ

কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টির ফলে যে বনাঞ্চল পানিতে ডুবেছে তাতে প্রথম আত্মাহুতি দিয়েছে অত্যন্ত ধীর ও মন্থর গতিতে চলা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন পাহাড়ি কচ্ছপ। আমরা জানি ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ এবং আসাম ও মেঘালয়ে, এবং বাংলাদেশের নানা বনে ব্যাপক ধ্বংসের ফলে নিম্নাঞ্চলের নদীসমূহে স্রোতহীনতা দেখা দিচ্ছে। বন না থাকার ফলে হঠাৎ করে ওসব এলাকার মাটি নেমে আসছে আমাদের বিভিন্ন এলাকায়। সে কারণে মজে গেছে বহু নদী। শীতে শুকিয়ে যায় খরস্রোতা পদ্মা পর্যন্ত। মরা নদীর মধ্যে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র এবং ধলেশ্বরী অন্যতম। পানি নেই তো কাছিম থাকবে কোথায়? খাবে কি?

সকল গ্রাম ও গঞ্জের পুকুর ডোবা ও বিল-হাওর ভরে উঠছে পলি এবং বালু পড়ে। উপরন্ত গ্রামের পর গ্রাম গাছ বিহীন হয়ে পড়েছে। বৃষ্টি ধুয়ে সব মাটি জমা পড়ছে জলাশয়ে। শীতকালেও সামান্য যে এক-দু'জায়গায় পানি থাকছে তাতে চাষাবাদ, মাছ ধরা, গরু চড়ানো এবং অধিক জনসমাগমের ফলে কাছিমের প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নদীরই কি এমন কোনো বালু বেলা আছে যেখানে হাজার লোকের পদ চিহ্ন না পড়ছে? জ্ঞাতসারে অথবা অজান্তে গ্রামবাসীরা ধ্বংস করছে ডিম।

এর উপর আছে কাছিম খাওয়া, রপ্তানি এবং চোরা চালান। অতএব, কাছিমের সংখ্যা না কমে উপায় কি?

কাছিম রক্ষার উপায়

বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩ বিচার করলে দেখা যায় যে, এর-প্রথম এবং দ্বিতীয় তপসীলে কাছিম নেই। অর্থাৎ এদেরকে মারার ঢালাও পরিমিট নেই। আরও মজার কথা বেশ কটি প্রজাতি তৃতীয় তপসীলাধীন হওয়ায় ওসব ধরা, মারা ও ব্যাবসা নিষিদ্ধ। কিন্তু, কাছিম রপ্তানি হচ্ছে কি করে?

সম্ভবত সামান্য রয়ালটির কাছে বন বিভাগের সাথে কাছিম ব্যবসায়ীদের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং কাছিমের উপর বন বিভাগের কোনো কর্তৃত্ব নেই। প্রথমেই বন বিভাগের বন্যপ্রাণী সার্কেলের পুরো কাছিম ব্যাবসা নিয়ন্ত্রণের ভার নিজ হাতে তুলে নিতে হবে। প্রাথমিকভাবে পাঁচ বছরের জন্য কাছিম রপ্তানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। দেশী লোকের চাহিদা মিটানোর জন্য কোন্ প্রজাতির কাছিম, কি আকারের অর্থাৎ কত বড় এবং বছরের কোন্ সময় কোন্ এলাকায় সে সব প্রজাতি ধরা বা শিকার করা যাবে তার জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে হবে।

সমুদ্র সৈকতে বা বালু বেলায় কাছিমের ডিম সংগ্রহ করা বা ধ্বংস করার জন্য শাস্তির বিধান দিতে হবে। কাছিম রপ্তানি বন্ধের সাথে সাথে তাদের উপর ব্যাপক গবেষণার দরকার হবে। প্রথমেই দেখতে হবে কি কি প্রজাতি কোন্ এলাকায় কত পরিমাণ আছে। তারপর ঠিক করতে হবে বাণিজ্যিকভাবে কোন প্রজাতি দেশে এবং কোন্ প্রজাতি বিদেশে পাঠালে দেশের মঙ্গল এবং প্রজাতির স্বাভাবিক প্রজনন ব্যাহত হবে না। কাছিম চাষের উপরও ব্যাপক গবেষণা দরকার। কাছিমের মতো অর্থকরী বন্য প্রাণীর সংখ্যা সীমিত।

সময় থাকতে এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে যে কোন্ প্রজাতি বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে যেতে পারে।

টিকটিকি-গিরগিটি

প্রতিদিন যে বন্যপ্রাণীর সাথে আমাদের পরিচয়, যাদের নিঃশব্দ বিচরণ প্রায় চোখ এড়িয়ে যায়, যাদের টিক্ টিক্ শব্দ দুপুর এবং নিঃসঙ্গ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙে সে হলো ঘরে বাস করা ছোট টিকটিকি।

টিকটিকি, গিরগিটি বা রক্ত চোষা, ও তকখক, আঞ্জন বা আঁচিলা এবং গুই সাপ বা গুইল সরীসৃপ শ্রেণীর স্কয়ামাটা বর্গের উপবর্গ লেসারটিলিয়ার অর্ন্তগত। টিকটিকি এবং তক্ষক মানুষের ঘরদোরে এবং ঘরের বাইরের গাছ-গাছালি ও বন-বাদাড়ে পাওয়া যায়। বাকিদের ঘরের বাইরে বাগানে, আদ্র এলাকায়, জল জমা-জমিতে বন-বাদাড়ে এবং সমুদ্র সৈকতে পাওয়া যায়।

লেসারটিলিয়ানের সবার মাঝে এত মিল এবং সেই সাথে ব্যাপক গড়মিল যে, প্রচুর অভিজ্ঞতা ছাড়া এদের একটি প্রজাতিকে অন্যটি বলে ভুল হতে পারে। সাধারণভাবে সবার ধারণা টিকটিকির পা থাকবে। কিন্তু গ্লাসস্নেক বা গ্লাসলিজারড নামের টিকটিকির কোনো পা নেই। কতকগুলি আঞ্জন আছে যাদের পা খুব সরু। মনে হবে পলিও হবার ফলে পাগুলি যেন চিকন হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত প্রজাতি এ অঞ্চলে নেই।

মোটামুটি সব লেসারটিলিয়ানদের শরীর শুষ্ক আবরণ বেষ্টিত আঁশে ঢাকা। আমাদের দেশের সব প্রজাতির টিকটিকির পা আছে। পায়ের সংখ্যা চার। পা অবশ্য মোটা বা চিকন হতে পারে। সবার বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের লেজ আছে। এদের মাথার অগ্রভাগ ত্রিকোণাকৃতির। অগ্র প্রান্তে মুখছিদ্র এবং উপর ও নিচে দুটি চোয়াল। উভয় চোয়ালে ছোট ছোট প্লুরোডন্ট বা একরোডনট দাঁত খাবার ধরে রাখতে সাহায্য করে। দাঁতগুলি এক সারিতে সাজানো। এই ক্ষুদ্রাকৃতির সুচালো একই ধরনের সব দাঁত পিছন দিকে বাঁকানো। মুখ ছিদ্রের পিছনে পৃষ্ঠ দেশের দুপাশে দুটি নাসারন্ধ্র ঘনিষ্টভাবে অবস্থিত। নাসারন্ধ্রের পিছনে একটি করে বেশ বড় চোখ আছে। চোখ উপপল্লব সম্বলিত। এর কাজ হলো ধুলা বালি এবং রোদ থেকে চোখের মনিকে রক্ষা করা। দু'টি চোখের পিছনে দুটি গোলাকৃতির গর্ত মসৃণ চামড়ায় মোড়া। এদেরকে বলে কানের পর্দা বা কর্নপটহ। সাপের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে এই পর্দা নেই। সাপের মতো টিকটিকিরা ত্বক নির্মোচন করে না। ত্বক ভেঙে ভেঙে টকুরো করে নির্মোচিত হয়। লেসারনিটলিয়ানদের পায়ুপথ বা অবসারণী ওদের দেহ যেখানে লেজে মিশেছে সেখানে এবং পিছনের দুপায়ের মধ্যে ঠিক আড়াআড়িভাবে বিদ্যমান।

বাংলাদেশে লেসারটিলিয়ানদের চারটি গোত্র আছে : গেকেকোনিডী (Gekkonidae), এগামিডী (Agamidae), সিনসিডী (Scincidae) এবং ভেরানিডী (Varanidae) প্রথম গোত্রে আছে টিকটিকি ও তক্ষক, দ্বিতীয়টিতে উড়ন্ত টিকটিকি এবং গিরগিটি, তৃতীয়টিতে আঞ্জন বা আঁচিলা এবং চতুর্থতে গুইসাপ। বাংলাদেশের টিকটিকির উপর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন হোসেন। তিনি এদেশের ১৫ প্রজাতির লেসারটিলিয়া পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তবে প্রবন্ধের ভিতরে তিনি কেবল ১৪টি নাম দেন। হোসেনের ব্যবহৃত *Mabuya*

elegans- এর নাম পরিবর্তিত হয়ে এখন *Lygosoma punctata* হয়েছে। এ প্রজাতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "এটা হয়ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যেতে পারে।" প্রবন্ধে যে ছবি ব্যবহৃত হয়েছে তাতে অবশ্য এলিগেন্সের একটি ছবিও ছিল।

হোসেন তার প্রবন্ধে চার প্রজাতির গুইসাপের কথা বলেছেন। কিন্তু এদেশে পাওয়া যায় মোট তিনটি প্রজাতি। চতুর্থটি ভারতের গরম আবহাওয়া এবং আধামরুময় অঞ্চলের বাসিন্দা। এছাড়াও তার দেয়া একটি প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নামে গড়মিল আছে।

হোসেন এর পর রমুলাস হুইটেকার, আমার ছাত্র ড. ফরীদ আহসান ও মোখলেসুর রহমান এবং বন্যপ্রাণী সার্কেলের একজন গবেষণা কর্মকর্তা এবং আমি নিজে লেসারটিলিয়ানদের নিয়ে কিছু কাজ করি। রমুলাসের সাথে আমার প্রবন্ধ ভারতের 'হামাদ্রিয়াদ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও আমার লেখা বইতে এদের উল্লেখ আছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রায় ২০ প্রজাতির লেসারটিলিয়ান আছে বলে আমার ধারণা। স্মিথের লেখা ফনা অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সিরিজের সরীসৃপ খণ্ডে (১৯৩৫ সালে প্রকাশিত) কিছু কিছু প্রজাতির বিস্তৃতি হিসাবে গারো পাহাড় বা উত্তরবঙ্গ বলা হয়েছে। এদেশে ঐ ধরনের দু একটি প্রজাতির অস্তিত্ব একেবারে অস্বাভাবিক নয়।

বাংলাদেশে যে সব প্রজাতি পাওয়া যেতে পারে সেগুলি হচ্ছে : গেক্কোনিডী গোত্রে **খসখসে টিকটিকি,** হাউস লিজার্ড *(Hemidactylus brooki* ; **মসৃণ টিকটিকি,** কমন হাউস, সিজার্ড, *H. frenatus,* **গোদা টিকটিকি,** হাউস লিজার্ড *H. flaviviridis* এবং ছোট টিকটিকি, হাউস লিজার্ড *H. bowringi* ; তক্ষক, *Gekko gecko* তক্ষক বা ওয়াল লিজার্ড। এগামিডী গোত্রে আছে *Draco maculatus* নতুন নাম *Blanfordii.* উড়ন্ত টিকটিকি বা ফ্লাইং লিজার্ড, *Calotes versicolor,* রক্তচোষা বা গার্ডেন লিজার্ড, সবুজ গিরগিটি, গার্ডেন লিজার্ড *C. jerdoni* এবং গিরগিটি *C. emma*। সিনসিডী গোত্রে আছে আঞ্জন স্কিংক *Mabuya dissimilis, M. macularia* ও *M. carinata*। লাইগোসোমা *Lygosoma maculatum* ছোট আঞ্জন, *Leiolopisma sikkimense* এবং সরু আঞ্জন *Riopa punctatus* এবং *R. vosmaeri*। ভেরানিডী গোত্রে আছে ধূসর গুইসাপ, বেঙ্গল লিজার্ড *Varanus bengalensis* ; সোনা বা হলদে গুই, ইয়েলো বা কমন লিজার্ড *V. flavescens* ও বড়গুই বা রামগদি, রিং বা মনিটর লিজার্ড *V. salvator*।

টিকটিকি

চার প্রজাতির মধ্যে আমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে যে টিকটিকি সচারচর দেখা যায় সেটি হলো মসৃণ টিকটিকি। বাইরের আদল দেখে এক প্রজাতি থেকে অন্যটিকে আলাদা করা কঠিন। তবুও প্রতিদিনের পরিচয় এবং দু'একটি বাহ্যিক চরিত্র থেকে কিছু কিছু প্রজাতি আলাদা করা সম্ভব। উপরন্তু কোনো গণের অধীনই চারটির বেশি প্রজাতি নেই। টিকটিকিদের প্রধান চরিত্রের উপর নজর দেয়া যাক।

সবার প্রসারণশীল জিহ্বা মোটা এবং খাটো, উপরে সরু, উঁচু উঁচু পিড়কা (Villose papilla) থাকে। চামড়া নরম। প্রায়ই পিঠের দিকে ঢাকা থাকে নরম বা দানাদার আঁইশ যা সাধারণভাবে একটি অন্যটির উপর উঠে না। এদের অবস্থান পাশাপাশি ; তবে পেটের

দিকেরগুলির একটি অন্যটির উপর উঠতে পারে। মাথার উপরের বর্ম বা শীল্ডগুলিতে বেমিল বেশি। চোখের পাতা সাধারণত সম্প্রসারণশীল নয়। দাঁত প্লুরোডোন্ট এবং বেলনাকৃতির। লেজ খসে যেতে পারে। এরপর দ্বিতীয়বার যে লেজ গজাবে তাতে কোনো মেরুদণ্ড থাকবে না। তা হবে কেবল মাংসল একটি লেজ। সবার আঙ্গুলের গোড়া প্রশস্ত ; সোজা, এবং নখরযুক্ত। আঙ্গুলের পট্ট (Lamella) বা নীচের দিকের পাত দ্বিখণ্ডিত যে জন্য এ গণের নাম হয়েছে হেমীডেকটিলাস। তক্ষকের পট্ট অবিভক্ত। সব টিকটিকি সারা বছরে একবার একজোড়া ডিম পাড়ে। ডিমের যত্ন নেবার কেউ নেই। ভ্রূণ আপনা থেকে বেড়ে উঠে এবং বাচ্চায় রুপ নেয়।

খসখসে টিকটিকি, *Hemidactylus brooki*

এদের পিঠের উপরের গুটিকা বেশ উঁচু উঁচু ও বড়, পিঠের আঁইশের গুটিকা ছোট এবং ১৮ থেকে ২০ সারিতে সাজানো ; লেজের উপরে আঁইশ ও গুটিকা খুবই খসখসে, গোলাকার আংটির মতো আবর্তে সাজানো ; আঙ্গুলগুলি লিপ্তবাদ নয় : মুক্ত ; পিছনের ৪র্থ আঙ্গুলের নিচে ৮ থেকে ১০টি এবং ১ম আঙ্গুলে ৫–৬টি পট্ট আছে। এদের পিঠে কালো ফোঁটাও থাকে। পুরুষের অবসারণী ছিদ্রপূর্ব এবং উর্বাস্থিত ছিদ্রের সংখ্যা, প্রতিপাশে, ৭ থেকে ১২ (১৬) টি। দেহ ৫৮ মিমি এবং লেজ ৭৫ মিমি (চিত্র ৩ : ১৯)।

খসখসে টিকটিকি দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। সুদূর সেন্টমর্টিনস থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত প্রত্যেক এলাকার বাড়ি ঘরে এবং গাছ–গাছালিতে এরা বাস করে। রমুলাসের ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে এ প্রজাতি ঘরের চেয়ে গাছে পাওয়া যায় বেশি। সম্ভবত স্বরযুক্ত মসৃণ প্রজাতিকে এড়িয়ে চলা এবং প্রতিযোগিতা কমানোর জন্য এ ব্যবস্থা। খসখসে টিকটিকির পুরুষেরা স্বরহীন বলে আমাদের ধারণা। আমরা দুজন বেশ কিছু টিকটিকিকে রাবার ব্যাণ্ডের আঘাতে ধরাশায়ী করেছি। বিশেষ করে ঘরে বা দোকানে কোনো টিকটিকি ডেকে উঠলে আমরা তা ধরার চেষ্টা নিয়েছি। ধরে দেখেছি ডেকে উঠা প্রাণীটি কোন্ প্রজাতির। সব বারই কেবল মসৃণ প্রজাতি ডেকেছিল।

বসত বাড়ি বা ঘরে টিকটিকি দিনের বেলায় বাথরুমে, আলমারি, বুকশেলফ, মিটসেফ, পর্দার আড়ালে, কখনো বা বেসিন এবং সিস্টার্নের পিছনে লুকিয়ে থাকে। রাতে তাদের আনাগোনা বাড়ে। ঘরের মশা মাছি, তেলাপোকাসহ অন্যসব পোকামাকড় যা আলোর আকর্ষণে ঘরে ঢুকে তার প্রায় সবাই জায়গা করে নেয় টিকটিকির পাকস্থলীতে। বর্ষার আগে স্ত্রী ও পুরুষ টিকটিকি যথেষ্ট র‍্যালা করে। এদের পূর্বরাগও চলে কয়েকদিন ধরে। সঙ্গমরত অবস্থায় এরা প্রায় একাধিক ঘন্টা কাটায়। টিকটিকির ডিম এবং বাজারে যে মুনমুন মিঠাই বিক্রি হয় তা দেখতে প্রায় একই থাকে তবে ডিম সাদা। অভিধান ও অন্য মোটাসোটা যে সব বই বুক শেলফে পড়ে থাকে তার বাঁধাইয়ের কাপড়ের ফাঁকে বা ঘরের প্রাচীরের যে কোনো জায়গায় সামান্য ফোঁকর আছে সেখানেই এরা ডিম পাড়ে। আলমারিতে অতি যত্নে ভাঁজ করে রাখা কাপড়ের মধ্যেও ডিম পাড়ে। অযত্নে রাখা ডিমের *ভিতরের এক চিমটি বাচ্চা বড় হয়ে ডিমের খোসা ফেটে বাইরে বেরিয়ে এসে প্রথম একটি*

নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে। পরে খাবার সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করে। ঢাকা শহরে এদের বাচ্চা বেশি চোখে পড়ে জৈষ্ঠ্য–আষাঢ়ে।

মসৃণ টিকটিকি, *Hemidactylus frenatus*

এটা বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে মসৃণ টিকটিকি ঘরের বাইরে অন্য কোথাও বাস করতে পারে। আর সে ঘর হতে পারে মানুষের, গরু–ছাগলের, ঘোড়ার, হাতির অথবা গুহাবাসী কোনো জন্তু জানোয়ারের। ঘরের ভিতর রাতদিন যে প্রাণীটি টিক্–টিক্ করে ডাকে সেটা হলো মসৃণ প্রজাতি। কেবল পুরুষ টিকটিকি ডাকে। স্ত্রী প্রায় স্বরহীন (চিত্র : ৩. ২০)।

মসৃণ টিকটিকির পিঠের গুটিকা খুব বড় নয়। সারিবদ্ধ ও নয়। উপরন্তু মসৃণ। লেজের আঁইশ আবর্তে সাজানো। ভিতর দিকের (প্রথম) আঙ্গুলে মুক্ত কড়ার অগ্রভাগ ঐ আঙ্গুলের সবচেয়ে প্রশস্থাংশের অর্ধেকের কম। খসখসে টিকটিকিতে যা অর্ধেকের বেশি। পুরুষের অবসারণী ছিদ্রপূর্ব এবং উর্বাস্থিত ছিদ্রের সংখ্যা ২৬–৩৬ যা প্রতি আঁইশে একটি করে বা ক্রমাগতভাবে সাজানো। দেহ ৬০ মিমি এবং লেজ ৬৫ মিমি লম্বা। সারা দেশে এরা সমভাবে বিস্তৃত।

গোদা টিকটিকি (*Hemidactylus flaviviridis*)

যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে বাংলাদেশের সব জেলাতে পাওয়া গেলেও আমি সবচেয়ে বেশি দেখছি যশোহরে এবং রাজশাহীতে। যশোহরের বাসস্ট্যাণ্ডের তারিক পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজারের ছোট্ট কুঠরিতে কমপক্ষে ১০টি এবং বাথরুমে ২টি ছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী হাউসে আছে প্রায় ২০–২৫টি। ঘরে বাস করা টিকটিকির মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে গোদা টিকটিকি। এরা মোটা, চ্যাপ্টা এবং অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি (চিত্র : ৩. ২১)।

গোদা টিকটিকির পিঠে সাধারণত কোনো গুটিকা থাকে না। থাকলেও তা মসৃণই হয়। প্রথম আঙ্গুলের মুক্ত কড়ার অগ্রভাগ সবচেয়ে প্রশস্তাংশের মুক্ত অর্ধেকের বেশি। প্রথম আঙ্গুলের নিচে ৭–১০ এবং ১১–১৪টি পট্ট আছে। এই আঙ্গুল দ্বিতীয়টির অর্ধেকের চেয়ে বেশি। লেজের গোড়া খুব মোটা ও চ্যাপ্টা। উর্বাস্থিত ছিদ্র দুটি আঁইশ পরে পরে সাজানো, প্রতিপাশের সংখ্যা ৫–৭টি। দেহ এবং লেজ ৯০ মিমি করে।

যমুনার পূর্ব পাড়ে এ প্রজাতি দেখিনি। পশ্চিম পাড়ে মসৃণ এবং গোদা টিকটিকি ঘরে বাস করে। আর পূর্ব পাড়ে সাধারণত মসৃণ ও খসখসে প্রজাতি পাশাপাশি অবস্থান করে। গেল ১৯৯৫ সালে ঢাকার নিউমার্কেট এলাকার বলাকা দালানের ২য় তলার এক বাথরুমে প্রথমবারের মতো এ টিকটিকি দেখি।

ছোট টিকটিকি (*Hemidactylus bowringi*)

যদিও আকার ও আকৃতিতে গোদা টিকটিকির ধারে কাছে নেই তবুও প্রতিবেশ সাম্যের (ecological equivalence) দিক থেকে ছোট টিকটিকির সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। সেটি হলো দুয়ের বিস্তৃতি। ছোটটি যমুনার পূর্বদিকে কেবল চট্টগ্রাম বিভাগে সামান্য পরিমাণে

বিদ্যমান। এদের সংখ্যা কোথাও বেশি নয়। চট্টগ্রাম বিভাগেও মসৃণ প্রজাতির সংখ্যা বেশি নয়। ছোট টিকটিকির আস্তানা ঘরদোর, গাছপালা এবং পুলের গার্ডরে।

ছোট টিকটিকির লেজের গোড়া মোটা নয়। লেজের আঁইশ প্রায় আবর্তহীন। পিঠ দানাদার। আঙ্গুলগুলি মুক্ত এবং মোটামুটি প্রশস্ত ; পায়ের ভিতরের আঙ্গুল বেশ বর্ধিত। এতে ৫–৬টি পট্ট এবং চতুর্থাঙ্গুলের নিচে ৯–১১টি পট্ট আছে। পিছনের পা প্রায় বগল পর্যন্ত লম্বা হয়। লেজ কিছুটা চ্যাপ্টা ; উপরিভাগ সমমাপের আঁইশ দিয়ে ঢাকা, নিচের মাঝ বরাবর বেশ প্রশস্ত, আড়াআড়িভাবে সাজানো এক সারি পট্টিকা (plates) আছে। পুরুষের একেক পাশে উর্বাস্থিত ছিদ্রের সংখ্যা ১২–১৫ ; এদের পাশাপাশি দুটির মধ্যে ফাঁকের পরিমাণ ২ থেকে ৪টি আঁইশ। দেহ ৫০ মিমি এবং লেজ ৫৫ মিমি।

তক্ষক *(Gekko gecko)*

তক্ষক বা শাণ্ডা। পাকিস্তান আমলে যে প্রাণীটি শাণ্ডা বলে পরিচিতি ছিল সেটা আসলে আধামরু বা শুষ্ক অঞ্চলের প্রাণী। ঐ প্রাণীরা ভারত পাকিস্তানসহ আরবদেশে আছে। তবে রাস্তার ধারে বাঙ্গালি ব্যবসায়ীরা শাণ্ডার তেল এখনো বিক্রি করে। তাদের পক্ষে পাকিস্তান থেকে শাণ্ডা আমদানি সম্ভব নয়। অতএব জন্ম হলো দেশী শাণ্ডার। তাই আমাদের তক্ষকের পাকিস্তানী আমলের শাণ্ডা নামটি এখনো চালু আছে (চিত্র : ৩.২২)।

তক্ষ–তক্ষ বা টেকে টোকে অথবা গেক্‌কো–গেক্‌কো শব্দে ডাকে তক্ষক। এদের ডাক থেকেই এসব নামের উৎপত্তি হয়েছে। ঢাকা শহরে থেকে শুরু করে দেশের সর্বত্র অল্প হলেও তক্ষক পাওয়া যায়। বনে বাদড়ে এবং পুরান গাছবহুল গ্রামে সর্বাধিক পাওয়া যায়। রমনা পার্কের বটগাছের ফাঁক–ফোকর অথবা আর কোনো গাছের অথবা দালানের অনুরূপ নিভৃত এবং নির্জন আলো–আঁধারী তাদের খুব পছন্দ। একই ফোকর বছরের পর বছর দখল করে থাকে একজোড়া তক্ষক। দিনের বেলা তারা গর্তের মুখে এসে মাথাটা বাইরের দিকে বের করে থাকে। পরিচিত গর্তের মুখে এদেরকে রোজই দেখা সম্ভব। তক্ষক দেখেছে খুব অল্প লোকে। ডাক শুনেছে হাজারো লোক। ডাকের ব্যবহারিক রুপ দু'টি। অন্ধকার ফোকরে থাকার ফলে স্ত্রী পুরুষের যোগাযোগের জন্য ডাক অপরিহার্য। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাসস্থানের দখল বজায় রাখা। মাঝে মাঝে ডাক ছেড়ে পাশের পুরুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যার যার অস্তিত্ব, অর্থাৎ "আমার সীমানায় তোমার (পুরুষের) অনুপ্রেবেশ দণ্ডণীয়।" গৌণভাবে হলেও কুমার টিকটিকির ডাক, প্রথমদিকে একজন কুমারীকে আকর্ষণ এবং তার সাথে জুটি বাঁধতে সাহায্য করে। তক্ষক আমাদের টিকটিকির মধ্যে সবচেয়ে মোটা এবং ভারী। দেহ ১৭০ মিমি এবং লেজ ১৭০ মিমি। মাথা, পেট ও আঙ্গুল মোটা। মাথার উপরে বহুকোণাকৃতি আঁইশ ; পিঠে পাশাপাশি সাজানো, চ্যাপ্টা আঁইশ এবং বড় অবকোণাকৃতি গুটিকা ১২টি সারিতে সাজানো। সাধারণত দুটি পরপর গুটিকার ভিতর ৩ থেকে ৫টি করে আঁইশ। পেটের আঁইশগুলো বড় ও গোলাকৃতি এবং একটির কিছু অংশ অন্যটির উপর চলে গেছে। আঙ্গুলগুলো সাধারণত লিপুপাদ নয়, তবে আঙ্গুলের গোড়ায় এর কিছুমাত্র থাকতে পারে। প্রথমাঙ্গুলে নখর নেই, বাকিগুলিতে

আছে। চতুর্থ পদাঙ্গুলির নিচে ২০ থেকে ২৩টি অবিভক্ত পট্ট থাকে। পুরুষের অবসারণী পূর্ব ছিদ্রের সংখ্যা সর্বমোট ১০ থেকে ২৪। আমাদের তক্ষকের রঙ সাধারণত ধূসরে–সবুজে বা নীলে মিশান, সারা শরীরে চিতি থাকে। অনেক সময় এগুলি মিলে আড়াআড়িভাবে ডোরার সৃষ্টি করতে পারে। এক ফোকরে বাবা মা'র সাথে বাচ্চাদেরকেও অনেক সময় দেখা যায়। তক্ষক ঘরে বাস করার সময় অপরাপর টিকটিকি, পোকামাকড়, নেংটি ইঁদুর ; এমনকি ঘরগিন্নী সাপ পর্যন্ত খায়। এদের চোয়াল খুব শক্ত এবং দাঁত দিয়ে যথেষ্ট জোরে কামড়ে দিতে পারে।

গিরগিটি

গিরগিটি গোত্রের (এগামিডী) আমাদের দেশী প্রজাতির অন্যতম হচ্ছে রক্তচোষা এবং অত্যন্ত বিরল উড়ন্ত টিকটিকি। প্রথম প্রজাতির গিরগিটি দেশের যে কোনো জায়গায় পাওয়া যেতে পারে। শহরের বাগান এদের খুব পছন্দ। রক্তচোষার সহযোগী প্রজাতি এবং কেবল চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিভিন্ন জেলার চিরসবুজ বনে বিরল উড়ন্ত টিকটিকি পাওয়া যায়।

গিরগিটি গোত্রের সবার জিহ্বা মোটা ও খাটো, উপরিভাগ হয় মসৃণ অথবা সরু ও উঁচু পিড়কা দিয়ে ঢাকা থাকে। পিঠের আঁইশগুলো প্রধানত একটি আরেকটির অংশ জুড়ে থাকে বা ইমব্রিকেট। চোখের পাতা উঠানামা করতে পারে এবং দাঁতগুলো এক্রোডন্ট এবং বিভিন্ন আকৃতির।

উড়ন্ত টিকটিকি বা ড্রাগন *(Draco blanfordii)*

সেটা ছিল ১৯৭৮ সালের মে মাস। বন্যপ্রাণীর ক'জন ছাত্র এবং একজন ব্যবস্থাপনার ছাত্রসহ চট্টগ্রাম জেলার বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলাম। চট্টগ্রাম থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে বারিয়াঢালা বনরেঞ্জ। সেখান থেকে হাজারিখিল প্রায় ১২ কিলোমিটার। বৃষ্টিতে ভিজে আমরা যখন হাজারিখিল পৌঁছলাম তখন বিকেল হয়েছে। পাহাড়ের টিলার উপরের বহুদিনের অব্যবহৃত বিশ্রামাগারটি পড়োবাড়ির মতো দেখাচ্ছিল। তার পাশের প্রাকৃতিক বনের সাথে মিলে গেছে বিশ্রামাগারের সংলগ্ন অযত্নে বেড়ে উঠা গাছ-গাছড়া। সামনে ছিল একটি উঁচু ইউকেলিপটাস গাছ। তার নিচে অবহেলিত আনারসের ঝাড়। একজন ছাত্রের কাছে ছিল একটি এয়ারগান (আসল মালিক বিজ্ঞান যাদুঘর)। চত্বরে তখন খুব ভিড় করেছিল একজোড়া বৃহদাকার স্পাইডারহান্টার নামক এক ধরনের মৌটুসী পাখি। তার একটি সংগ্রহের লোভ সামলাতে পারছিলাম না। কারণ আমাদের সংগ্রহে এ প্রজাতির পাখি নেই। এয়ার গান হাতে যখন ঘুরছিলাম তখন মনে হল হঠাৎ করে কি যেন উড়ে গিয়ে বসল ইউকেলিপটাস গাছে। লক্ষ্য করে দেখলাম প্রায় ৬–৭ মিটার উপরে গাছের বাকলের সাথে মিশে আছে রক্তচোষার মতন এক লম্বা টিকটিকি। বুঝতে মোটেই কষ্ট হলো না যে, ওটা একটা উড়ন্ত টিকটিকি। তখনো সে মাথা কাত করে তার গলার ঝুলন্ত থলিটি ফুলাচ্ছিল। এয়ার গান তাক করে গুলি ছুঁড়লাম। মনে হলো গুলি খেয়ে সেটা পড়ল নিচে, গাছের গোড়ায়। জোরে ডাকাডাকির ফলে সব ছাত্র চলে এল। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে ঐ টিকটিকি আমরা পরে উদ্ধার করতে পারিনি। আমার ধারণা ওটা শুধু আহত

হয়েছিল। তাই মাটিতে পড়ে সে দৌড়ে চলে গেছে। বাংলাদেশে ড্রাকো দেখার এটাই প্রথম রেকর্ড। প্রজাতিটি ম্যাকুলেটাস বলে আমি ধরে নিয়ছি এজন্য যে ওটাই পার্শ্ববর্তী আসাম রাজ্যের চিরসবুজ বনে আছে। বাংলাদেশের চিরসবুজ বনে এদের তল্লাশী দরকার।* চট্টগ্রামের হাজারিখিল খুবই উৎকৃষ্ট চিরসবুজ বন। বন্দর নগরীর কাছে এত ভালো বন আর নেই। সিলেট বিভাগের বনে এক সময় বেশ ছিল। বর্তমানে বিরল।

ড্রাকোদের প্রধান চরিত্র দুটি। এদের উর্বাস্থিত ছিদ্র নেই। পাঁজারার হাড়গুলি বর্ধিত এবং এই অংশের সাথে বর্ধিত চামড়ার মোড়ক ড্রাকোর গায়ে দুটা ডানার সৃষ্টি করেছে যার সাহায্যে এরা শরীরকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখতে পারে। তবে সেটা সম্ভব উঁচু স্থান থেকে নিচুর দিকে লাফ দিলে। এরা উড়তে পারে না, গ্লাইড করতে পারে। উপরন্তু, এদের গলায় আছে একটা থলে যা মাঝে মাঝেই বড় হয়। ড্রাকো গাছে গাছে থাকে ও কীটপতঙ্গ খায়।

রক্তচোষা *(Calotes versicolor)*

রক্তচোষা, গিরগিটি এবং কাকলাস একই প্রজাতির বিভিন্ন বাংলা নাম। কাকলাস শব্দটি চট্টগ্রাম এলাকাতে বেশি ব্যবহৃত হয়। রক্তচোষা সারা দেশে পাওয়া যায়। গিরিগিটি নামটি বইপুস্তকে বেশি ব্যবহার করা হয়। প্রায় পনর বছর আগে দৈনিক আজাদের মুকুলের মহফিলে "রক্তচোষা রক্ত চুষে না" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। রক্তচোষা নামটি যে কারণে হয়েছে সম্ভবত সেই একই কারণে ইংরেজি নাম হয়েছে Blood sucker। দুটো ভাষাতেই রক্তচোষার দেহের কিছু অংশ লালচে বর্ণ ধারণ করার জন্য লোকজন মনে করেন, এ রক্তচোষা তার (মানুষের) দেহ থেকে রক্ত শুষে নিচ্ছে। তাই রক্তচোষার দেহ লাল হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটি অন্য রকম (চিত্র : ৩ : ২৩)।

রক্তচোষার উপরের স্তরে নানা বর্ণের শুষ্ক কোষ আছে। বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা ক্রোমাটোফোরেও (Chromatophore) থাকতে পারে। রঞ্জক-কোষ এবং ক্রোমাটোফোরের স্থানান্তরের কারণে রক্ত চোষার গায়ের রঙের হেরফের হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, প্রতিপক্ষের সামনে দেহের রঙ পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজের চেহারাকে কিছুটা ভয়াল করার ভিতর দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে। এর ফলে দুটো পাশাপাশি বাস করা পুরুষ রক্তচোষাকে দৈহিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় না। অনেক সময় ভয় পেলেও দেহ-বর্ণের পরিবর্তন হতে পারে। মানুষের সামনে পড়লে এ ধরনের কিছু হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ আজও রক্তচোষা দেখামাত্র মা-বাবা বলেন 'বুকে থুথু দে, তাহলে রক্তচোষা তোর ক্ষতি করতে পারবে না'। রক্ত শুষে খাবার ভ্রান্ত ধারণার ফলে হাজারো নিরীহ রক্তচোষা প্রাণ দিচ্ছে। এই অজ্ঞতার অবসান দরকার।

দেহের রঙ পরিবর্তনের ফলে নাকি দেহ-তাপ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হয়। উপরন্তু মেয়ে রক্তচোষার পক্ষে পুরুষ রক্তচোষা খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। উত্তেজিত প্রাণীর পিঠের

---

* আমার প্রাক্তন ছাত্র ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান শিক্ষক মো: ফরীদ আহসান এর নমুনা পরীক্ষা এবং প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে অতি সাম্প্রতিক কালে।

BANSDOC Library
Accession No.

কাঁটাগুলি খাড়া হয়, মাথা ও গলার রঙ বদলায়। তবে কেমেলিয়ন বলে গিরগিটির যে প্রজাতি আছে তাকে বাংলায় বলে বহুরূপী। কারণ ভয়ে ও উত্তেজনায় চোখের নিমেষে এর গায়ের রঙ সবুজ, হলুদাভ, নীলাভ বা কালচে হতে পারে, গায়ে দেখা দিতে পারে নানা বর্ণের চিতি বা ফোঁটা, ছোপ বা ডোরা। কেমেলিয়ন আসলেই বহুরূপী বা বহুরূপ পরিবর্তনকারী প্রাণী। এ প্রাণী জ্যান্ত অবস্থায় দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং ওখানকার নীলগিরি পাহাড়ে থাকার সময় বহুরূপী আমি ঘরেও পুষেছি। বহুরূপী যে হারে এবং যত বাহারী রূপ পরিবর্তন করতে পারে আমাদের রক্তচোষা তার ধারে কাছেও নেই। কাজেই বাংলার "বহুরূপী" শব্দটি কেবল কেমিলিয়নের জন্য নির্দিষ্ট রেখে আমাদের গিরিগিটিকে রক্তচোষা বলাই শ্রেয় হবে।

রক্তচোষার উর্বাস্থিত ছিদ্র নেই ; কোনোরূপ ডানার ন্যায় প্রশস্ত পাঁজারাও নেই ; দেহ বহুলাংশে দণ্ডাকৃতি এবং লাম্বাটে ; আঙ্গুলের সংখ্যা প্রত্যেক পায়ের পাঁচটি, কানের পর্দা কোনো আলাদা চামড়া বা আঁইশে মোড়া নয় ; দেহ খস্‌খসে এবং ত্বকের কিছু অংশ অন্যটির উপর উঠে থাকে এমন আঁইশে ঢাকা। আঁইশগুলো প্রায় নির্দিষ্ট মাপে ও রীতিতে সাজানো। গলা-থলি বিদ্যমান।

রক্তচোষার দেহের পাশের অংশগুলোর অগ্রভাগে পিছন এবং উপরমুখি কাঁধের সামনে চামড়ার কোনো ভাঁজ বা গর্ত নেই ; কানের ছিদ্রের উপরে দুটি আলাদা কাঁটা আছে; শরীরের মাঝখানে ৩৬ থেকে ৫২টি আঁইশ থাকে এবং রঙ হয় বাদামী। পিঠের কাঁটা বেশ বড় বড়। লেজ ৩০০ মিমি এবং দেহ ১০০ মিমি হয়।

জারডনের গিরিগিটি *(Caoltes jerdoni)*

বাংলাদেশের চিরসবুজ বনে কেবল পাওয়া যায়। বিভিন্ন গবেষণা কাজে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার চিরসবুজ বনে ঘুরার সময়ে কয়েকবারই সবুজাভ রক্তচোষা ন্যায় জারডনের গিরগিটি দেখেছি, তবে যেহেতু কোনো নমুনা সংগ্রহ করতে পারিনি সেহেতু নিশ্চিত করে বলা চলে না ওগুলো এই বিশেষ প্রজাতিরই ছিল। তবে জারডনী নামের একটি সবুজ প্রজাতি আমাদের ভূ-সীমানায় থাকতে পারে, যেহেতু পাশের দেশে আছে।

জারডনের গিরিগিটির কাঁধের সামনে একটি ভাঁজ বা ছিদ্র থাকে যার উপর দানা-দানা আঁইশ হয়। পিঠের আঁইশগুলো একই মাপের ; কানের ছিদ্রের উপরে চিকন আঁইশের সমান্তরাল সারি আছে এবং এদের গায়ের রঙ সবুজ। ঘাড়ের কাঁটা খুব বড় নয়। দেহ ১০০ মিমি এবং লেজ ২৮৫ মিমি।

সবুজ গিরিগিটি *(Calotes emma)*

বাংলাদেশের সিলেট এবং ময়মনসিংহ সংলগ্ন গারো পাহাড়ে হয়ত পাওয়া যেতে পারে। মাথার উপকার আঁইশ অসম, উচু অথবা গুটিকার মতো। দেহের মাঝখানে ৪৯ থেকে ৬০টি আঁইশের সারি আছে। গল-থলি নেই বললেই চলে। সামনের পায়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ আঙ্গুল প্রায় সমান ; পিছনের তৃতীয় আঙ্গুল চতুর্থটির চেয়ে ছোট। কাঁধের সামনের ভাঁজ কালচে ; গায়ের রঙ জলপাই-বাদামী। দেহ ১১৫ মিমি এবং লেজ ২৯০ মিমি লম্বা।

রক্তচোষা এবং গিরগিটি মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে মাটি খুঁড়ে ডিম পাড়ে। মা—বাবা ডিমের কোনো যত্ন নেয় না। ডিমের সংখ্যা ১০ থেকে ২৫। এরা সবাই কীট পতঙ্গ-ভুক। এরা বাগানের হাজার হাজার অনিষ্টকারী পোকা খায়। অতএব এদের সংরক্ষণ মানে বাগানকে পোকার হাত থেকে রক্ষা করা। বিগত ১৯৮৮ সালের মে মাসে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্দা এলাকার আম গাছে এদের নমুনা দেখেছি।

আঞ্জন *(Mabuya carinata)*

আঞ্জন গোত্রের (সিনসিডী) চারটি গণের অধীন মোট সাতটি প্রজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যাবে বলে ধরা যায়। এর মাঝে চারটি প্রাজতির কথা, একটির অশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক নামসহ, হোসেন ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছেন। অন্যসব টিকটিকিদের চেয়ে আঞ্জনদের আঁইশ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং সবসময় একটি আঁইশ অন্যটির উপর দিয়ে এমনভাবে উঠে থাকে যে দূর থেকে দেখলে গা মসৃণ বলেই মনে হবে। আঞ্জনের গা চিক চিক করে। এদের পা অপেক্ষাকৃত ছোট। এরা আদ্র জায়গায় থাকতে পছন্দ করে। আঁইশ না গোণে একটি আঞ্জনের প্রজাতি নির্ণয় খুবই কঠিন ব্যাপার। প্রায় আঞ্জন লালচে-বাদামী বা বাদামী রং এর হয়। এদের ঠোঁট ও পেটের পাশে অপরাপর রঙ থাকতে পারে। কেউ ধূসর বা সাদা। সব আঞ্জনের জিহ্বা আঁইশের ন্যায় পিড়কা দিয়ে ঢাকা। পিড়কাগুলি একটি অন্যটির উপর ঢোকে থাকে (ইমব্রিকেট)। পিড়কার অগ্রভাগ খাঁজ কাটা। সারা শরীরে গোলাকার আঁইশগুলো ইমব্রিকেটভাবে সাজানো ; মাথার উপরে সুসামঞ্জস্য বর্ম আছে। কোনো উর্বাস্থিত বা অবসারণীপূর্ব ছিদ্র নেই। দাঁত প্লুরোডোন্ট (চিত্র : ৩. ২৪)।

আমাদের দেশের সর্বত্র, সেন্টমার্টিন্স থেকে তেঁতুলিয়া, যে স্কিন্কসের প্রজাতি পাওয়া যায় তাকে আঞ্জন বা আঁচিল বলে। চট্টগ্রামের অনেকেই সাপের ভাই 'টাপ' বলেন। পুকুরের পাড়ে, নর্দমার ধারে যেখানে মরা পচা পাতা থাকে মূলত সেখানে এদের বাস। তবে পুকুরের কচুরিপানায় এদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। পানিতে সাঁতরাতেও এরা যথষ্ট অভ্যস্ত।

আঞ্জনের চোখের নিচের পাতায় আঁইশ আছে। কানের ছিদ্র অর্ধ গোলাকৃতি, শরীরের মাঝখানে ৩০ থেকে ৩৪টি সারিতে আঁইশ আছে। পা মোটামুটি লম্বা। আঁঙ্গুল হয় মসৃণ নয় সামান্য স্ফীত পট্টযুক্ত। চতুর্থ পদাঙ্গুলিতে পট্টের সংখ্যা ১৪ থেকে ১৮। পিছনে পা কব্জি বা কনুই পর্যন্ত পৌছায়। এরা মাটিতে গর্ত করে ডিম পাড়ে। ডিমের সংখ্যা ২০ বা তারও বেশি। দেহ ১২৫ মিমি এবং লেজ ১৬৫ মিমি।

খাটো পা আঁচিল *(Mabuya dissimilis)*

চোখের নিচের পাতা একটি স্বচ্ছ চাকতি দ্বারা ঢাকা। শরীরের মাঝখানে ৩৪ থেকে ৩৮টি আঁইশের সারি ; পিঠের ২ অথবা ৩ সারি উঁচু চূড়াযুক্ত। কানের ছিদ্র ডিম্বাকার ; প্রায় পার্শ্ব দেশীয় আঁইশের সমান, অগ্রভাগ ৩ অথবা ৪টি ক্ষুদ্র সূচালো লতিকাযুক্ত। পা খাটো ; মসৃণ পট্টযুক্ত ; পদাঙ্গুলির নিচে ১২ থেকে ১৬টি পট্ট। পা কব্জি বা তা বেশি সামনে যেতে পারে। এটি উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে তেঁতুলিয়া এলাকায় পাওয়া যেতে পারে।

পাহাড়ী আঁচিল *(Mabuya macularius)*

চোখের নিচের পাতা আঁইশযুক্ত। দেহের মাঝখানে ৩০টি আঁইশের সারি। কদাচ তা ৩২ বা ৩৬ হতে পারে। পিঠের ৫, ৭ অথবা ৯টি সারি বেশ উঁচু চূড়াযুক্ত। কানের ছিদ্র অর্ধ-গোলাকার ; পার্শ্বদেশীয় একটি আঁইশের চেয়ে ছোট। পা মোটামুটি লম্বা। পট্টগুলির কিছুটা স্ফীতাংশ থাকে। চতুর্থ পদাঙ্গুলে ১২ থেকে ১৭টি পট্ট থাকবে। পা কব্জি অথবা কনুই পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। লেজ দেহের চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা। ব্লাইথ নামক বিজ্ঞানী ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর থেকে সংগৃহীত নমুনার উপর ভিত্তি করে এই প্রজাতিটি চিহ্নিত করেন। উত্তরবংগে এদের পাওয়া যেতে পারে। দেহের দৈর্ঘ্য ৬০ মিমি।

লাইগোসামা *(Lygosoma albopunctata)*

প্রজাতিটি চিরসবুজ বনাঞ্চলে পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয়। কক্সবাজার বন বিভাগ থেকে সংগৃহীত একটি নমুনা টমী হিকিদা জাপানের কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেছেন। আঞ্জন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর প্রাথমিক ধারণা থেকে তিনি বলেছিলেন নমুনাটি লাইগোসোমা হতে পারে। এদের দেহের মাঝখানে ৩৮ থেকে ৪২ সারি আঁইশ থাকতে পারে। লেজ দেহের দ্বিগুণ বা দ্বিগুণের চেয়ে সামান্য ছোট। দেহ আঞ্জনের চেয়ে সরু। লেজ ততোধিক সরু, অগ্রভাগ একেবারে চিকন। আঙ্গুল লম্বা। চতুর্থ পদাঙ্গুলিতে ১৬ থেকে ১২টি স্ফীত পট্ট আছে। দেহ ৬২ মিমি লম্বা।

সরু আঞ্জন *(Lygosoma punctata)*

সরু আঞ্জনদের পা অত্যন্ত ছোট এবং দেহ ও লেজ খুবই সরু। প্রতি পায়ে পাঁচটি করে আঙ্গুল আছে। কানের ছিদ্র চোখের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। দেহের মাঝ বরাবর ২৪ থেকে ২৬ টি আঁইশের সারি। আঙ্গুল লম্বাটে। চতুর্থ পদাঙ্গুলি তৃতীয়টির চেয়ে বড় এবং এর নিচে ১১ থেকে ১৪টি উঁচু পট্ট থাকে। দেহ লেজের চেয়ে সামান্য খাটো। দেহ ৮৫ মিমি। দেশের পাহাড়ি এবং চিরসবুজ বনাঞ্চলে পাওয়া যেতে পারে। *Lygosoma vosmaeri* নামের জন্যে যে প্রজাতিটি এদেশে পাওয়া যেতে পারে তার সামনের পায়ে পাঁচটি এবং পিছন পায়ে চারটি করে আঙ্গুল আর দেহের মাঝখানে মোট ২২ সারি আঁইশ থাকবে।

সিকিমী আঞ্জন *(Scincella sikimmensis)*

স্মিথ বলেছেন প্রজাতিটি বাংলাদেশের রংপুর জেলায় পাওয়া যায়। হোসেন তাঁর প্রবন্ধে সে কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। এখনও কোনো নমুনা সংগৃহীত হয় নি। এদের কানের ছিদ্র ছোট, দেহের মাঝখানে ২২ থেকে ২৪টি আঁইশের সারি ; চতুর্থ পদাঙ্গুলিতে ১৫ থেকে ১৭টি পট্ট থাকে। লম্বায় দেহ ৫৩ মিমি।

গুইসাপ গোত্র *(Varanidae)*

গুইসাপ গোত্রের তিনটি প্রজাতি আছে বাংলাদেশে। সারা দেশের সব জায়গায় কালোগুই এবং সোনাগুই পাওয়া যায়। অন্যদিকে দূরবর্তী দ্বীপ, সমুদ্র সৈকত অঞ্চলে পাওয়া যায় বড় গুই বা রামগদী। ধান-পাটের মতন গুইসাপ এদেশের অর্থকরী সম্পদ। ধান-পাট

লাগাতে হয়। কিন্তু গুইসাপ ঝোপ-ঝাড় বন-বাদাড় থেকে ধরে আনলেই চলে। এই রীতিতে গত শতাব্দী থেকে গুই হত্যা চলেছে। চামড়া রপ্তানি হয়েছে বিদেশে। হাজারটা বাহারি জিনিস তৈরি হচ্ছে গুইয়ের চামড়া থেকে। ঢাকার যে কোনো চামড়ার সামগ্রী বিক্রেতার কাছে প্রচুর ভ্যানিটি ব্যাগ, মানিব্যাগ, বেল্ট ইত্যাদি পাওয়া যাবে। ওসব তৈরি হয় গুই সাপ থেকে। রমুলাস ও হিকিদা তাদের বাংলাদেশে গুই অন্বেষণের ফলাফলে বলেছেন, বিগত আট বছরে (১৯৭৩ থেকে ১৯৮১, আগস্ট পর্যন্ত) ৫০৫০,০০০ গুইয়ের চামড়া বিদেশে, বিশেষ করে জাপানে রপ্তানি করে আনুমানিক ৩,৮১,৯৩০.০০ আমেরিকান ডলার অর্থাৎ টা ৬,৮৩,৫৮,৮৪৭.০০ আয় করেছে। শূন্য মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে এমন জমজমাট ব্যাবসা আর কিসে হতে পারে। উপরন্তু উপজাতীয়রা এদের মাংস খেতে পছন্দ করে। ফসলের অনিষ্টকারী পোকা এবং ইঁদুর দমনে এদের জুড়ি নেই।

গুই এক ধরনের টিকটিকি। এদের জিহ্বা মসৃণ, খুবই লম্বা, সরু, অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত, লিকলিক করে এবং সাপের মতো সংকোচনশীল। দানাদার বা গোলাকৃতি আঁইশে শরীর আবৃত। দাঁত প্লোরোডোন্ট এবং পিছন দিকে বাঁকা। কোনো গুই সাপের প্রজাতি থুথু ছিটায় না। জিহ্বা রাসায়নিক দ্রব্যে সংবেদনশীল। বাতাসে বিভিন্ন দ্রবীভূত রাসায়নিক দ্রব্যের অনুভূতি বয়ে আনে জিহ্বা এবং তা লাগিয়ে দেয় উপরের চোয়ালে অবস্থিত জেকবসন্দ নামক গ্রন্থিতে। এ স্বাভাবটি সাপের অনুরূপ। মুখ বন্ধ থাকলেও তুণ্ডের আগায় যে ফাঁক আছে তার ভিতর দিয়ে জিহ্বা চলাচল করতে পারে।

কালো গুই *(Varanus bengalensis)*

বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ এবং উপকূলবর্তী দ্বীপ অবধি কালো গুইয়ের বিস্তৃতি আছে। দেশের অভ্যন্তরে এটা সোনা গুইয়ের সাথে এবং উপকূলীয় দ্বীপে বর গুইয়ের সাথে সিমপট্রিকভাবে অবস্থান করে। গ্রামের বাড়িঘরও ঝোপ ঝাড়ে এই প্রজাতি সবসময় হাজারে হাজারে পাওয়া যেত। অতিরিক্ত চামড়া সংগ্রহের ফলে এদের সংখ্যা কমেছে। এখন বিরল না হলেও কম পাওয়া যায়। দেশে সামরিক আইন জারির পর (মার্চ, ১৯৮২) যে লক্ষাধিক চামড়া চোরাকারবারিদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তাতে এদের সংখ্যা কম ছিল না। কালো গুইয়ের নাসারন্ধ্র একটি তির্যক চিড়ের মতন। এই চিড় তুণ্ডের আগার চেয়ে চোখের কাছাকাছি। মাথাটা সোনা গুইয়ের চেয়ে সরু ও লম্বা কিন্তু বড় গুইয়ের চেয়ে কম সরু ও লম্বা। লেজ দুদিক থেকে বেশ চাপা। লেজের উপরের দুদিকে আঁইশগুলি কাঁটার মতো এবং হাতে বেশ লাগে। এদের নাসারন্ধ্র সোনা গুইয়ের চেয়ে লম্বা এবং সুঁচালো। পেটের আড়াআড়ি আঁইশের সংখ্যা ৯০ থেকে ১১০। দেহ ৭৫০ মিমি এবং লেজ ১০০০ মিমি লম্বা। গাছে উঠায় এরা অত্যন্ত পটু। সাধারণ উই পোকার ঢিবিতে ২০ থেকে ৩০টা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটতে সময় লাগে সাত আট মাস। এজন্য ব্যাবসায়িক দিক দিয়ে অত্যন্ত লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও এর জন্য প্রজনন খামার করা অসম্ভব। বাংলাদেশে ইদানিং এদের চাষের প্রয়াস নিয়েছেন কেউ কেউ। তবে সে চাষে সুফলের চেয়ে কুফল

বেশি হবে বলে মনে হয়। সহজেই খামারের বাইরের গুই বা সারা দেশ থেকে গুই ধরে এনে প্রথমে খামারে রাখা হবে। কতৃপক্ষকে সামান্য টাকার বিনিময়ে বাগে এনে খামার কতৃপক্ষ বুনো গুইকে তাদের খামারের গুই বলে পারমিট সংগ্রহ করতে পারবে। যেমন বনবিভাগের সহায়তায় বন ধ্বংস হচ্ছে তেমনি ধ্বংস হবে গুইসাপ। এরপর সে গুই সরকারি অনুমোদনের মাধ্যমে জবাই ও চামড়া রপ্তানি হয়ে যাবে। যেমন হচ্ছে কাছিম কচ্ছপের বেলায়।

সোনা গুই *(Varanus flavescens)* (চিত্র : ৩.২৬)

সোনা গুই, হুন গুই বা গুইল উপকূলবর্তী এলাকা বাদে দেশের-সর্বত্র পাওয়া যায়। পাহাড়ি অঞ্চলের চেয়ে সমতলভূমিতে এরা বেশি আছে। রাজশাহী এবং ঢাকা বিভাগের জেলাসমূহে এদেরকে সর্বাধিক দেখা যায়। বাড়ির উঠানে থাকলেও খেতখামারের আশে-পাশের জলার কাছে এদেরকে বেশি দেখা যায়। এদের রঙ হলুদাভ বা সোনালি হলুদাভ ও বাদামী দাগাযুক্ত। চোয়াল অনেকটা ভোঁতা, অন্তত অপর দুটি প্রজাতির চেয়ে তো বটেই। নাসারন্ধ্র একটি ছোট তির্যক চিহ্নের মতো যা চোখের চেয়ে চোয়ালের অগ্রভাগের বেশি কাছাকাছি। পেটের আড়াআড়ি আঁইশ ৬৫ থেকে ৭৫ সারিতে বিদ্যমান। পা খাটো এবং নখরগুলো সুঁচালো নয়। লেজ দুপাশ থেকে চ্যাপ্টা হয়েছে এবং কাঁটা কাল গুইয়ের মতো খসখসে নয়। দেহ ৩৬৫ মিমি এবং লেজ ৪৬৫ মিমি লম্বা। এটিই আকারে ছোট প্রজাতি। বর্ষার সময় দেশে উঁচু সড়কের পাশের খাদে এদেরকে বেশ দেখা যায়। ইঁদুরের গর্ত এবং বটগাছের গুড়ি এদের নিরাপদ আশ্রয়। আগস্টে ডিম পাড়ে। ৮ থেকে ২৫টি ডিম ফোটতে সময় লাগে ৭-৮ মাস।

বড়গুই বা রামগদি *(Varanus salvator)* (চিত্র : ৩.২৮)

এরা দেশের লোনা পানি অঞ্চলের বাসিন্দা। সেন্টমার্টিনস থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় এদের সন্ধান পাওয়া যায়। অতিরিক্ত চামড়া আহরণের ফলে এদের সংখ্যা কমছে। বর্তমানে এদের সংখ্যা বিরল।

বড় গুই লম্বায় চার মিটার অবধি হতে পারে। এটাই সর্বাদিক লম্বা গুই সাপ। বড় গুইয়ের চোয়াল সরু ও লম্বাটে। নাকের ছিদ্র গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি এবং তুণ্ডের আগার খুব কাছাকাছি। পা লম্বাটে। নখরও লম্বাটে। পিঠের উপর বলয়ের মতো দাগ আছে বলে ইংরেজিতে এদেরকে রিং লিজার্ডও বলা হয়। পেটের আড়াআড়ি আঁইশ ৮০ থেকে ৯০ সারিতে বিদ্যমান। সাধারণত দৈর্ঘ্য দেহের : ১০০০ মিমি এবং লেজ ১৫০০ মিমি। এরা খুব বেশি গাছ বাইতে পারে। পুরাতন বাইন গাছের গোড়া পচে যে কোঠর তৈরি হয়, সেখানে এরা বাস করে। সুন্দরবন এলাকায় এদের প্রধান নিবাস। সাধারণত বর্ষার প্রারম্ভে গাছের ফোকরে অথবা শুকনো মাটিতে গর্ত করে ১৫ থেকে ৩০টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটতে সময় লাগে ৯ মাস।

চিত্র ৩.২৯ : ডায়ার্ডের দুমুখা সাপ Typhlina diardi (ডানিয়েল)।

চিত্র ৩.৩০ : দুমুখা সাপ Typhlina bramina (ডানিয়েল)।

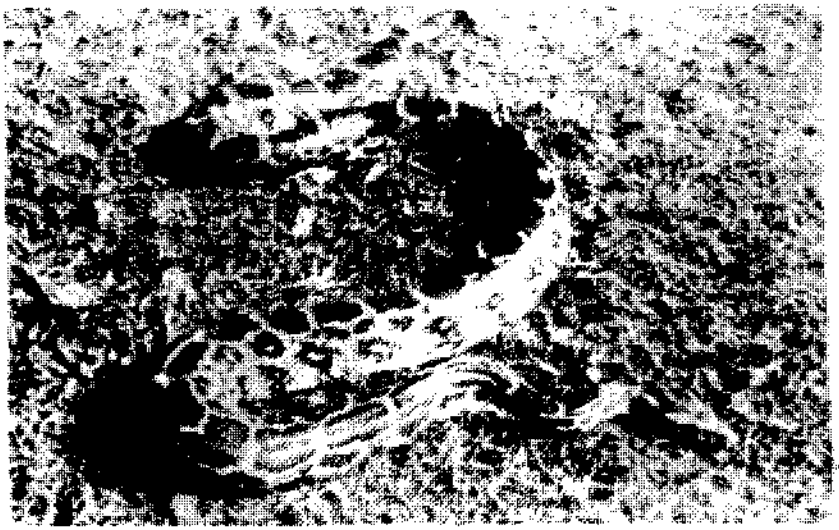

চিত্র ৩.৩১ : অজগর Python molurus.

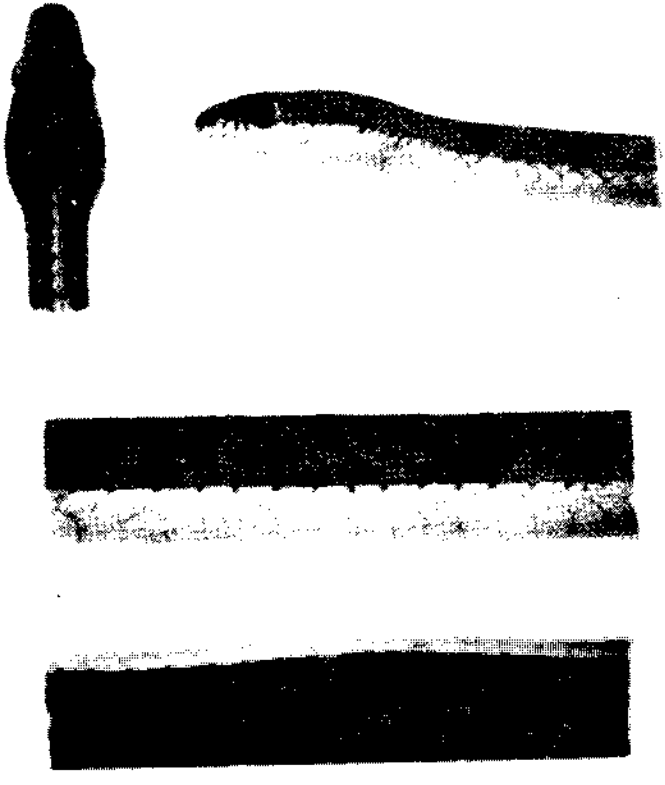

চিত্র ৩.৩২ : গেছো সাপ Dendrelaphis tristis (ডানিয়েল)।

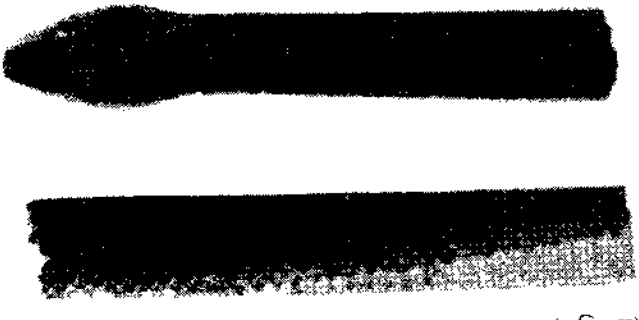

চিত্র ৩.৩৩ : ব্যাণ্ডেড রেসার Argyrogena fasciolatus (ডানিয়েল)।

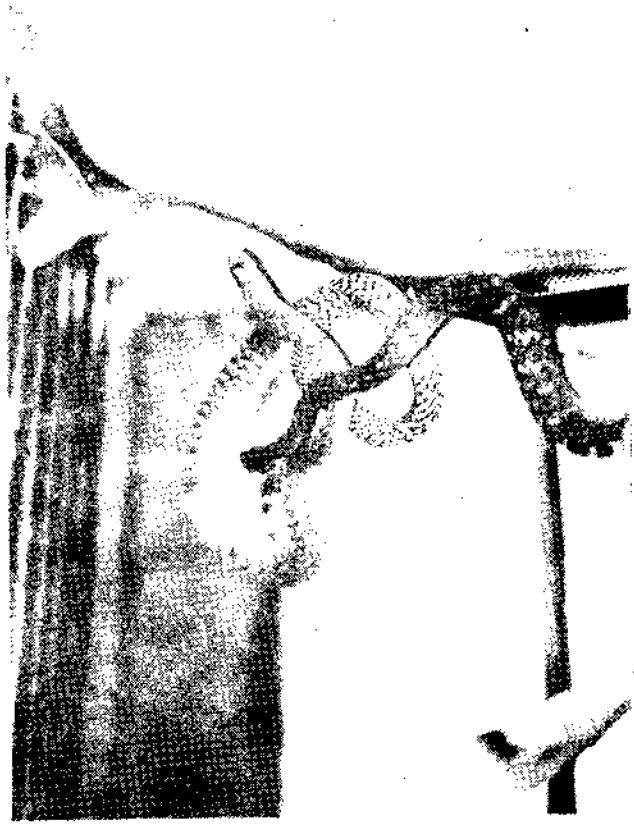

চিত্র ৩.৩৫ : দারাজ সাপ Ptyas mucosus.

চিত্র ৩.৩৪ : দুধরাজ সাপ Elaphe radiata (ডানিয়েল)।

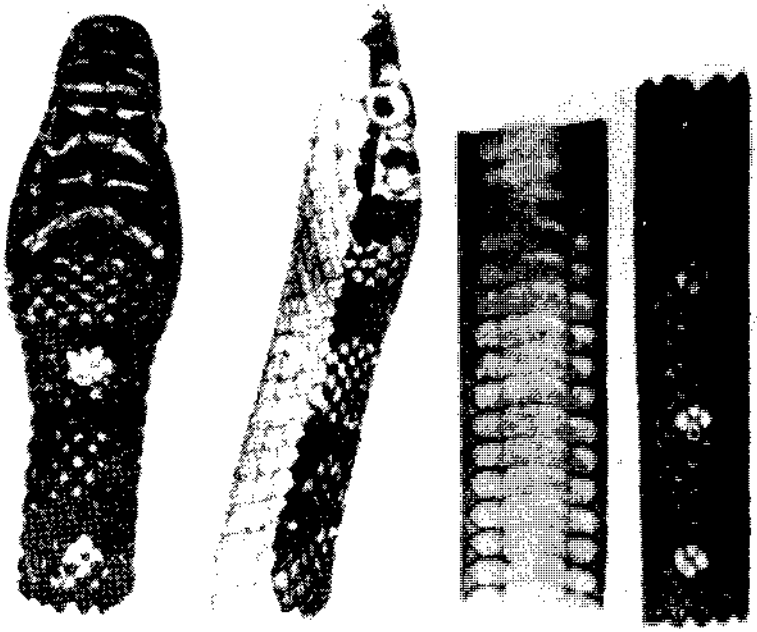

চিত্র ৩.৩৬ : কালনাগিনী Chrysopelea ornata (ডানিয়েল)।

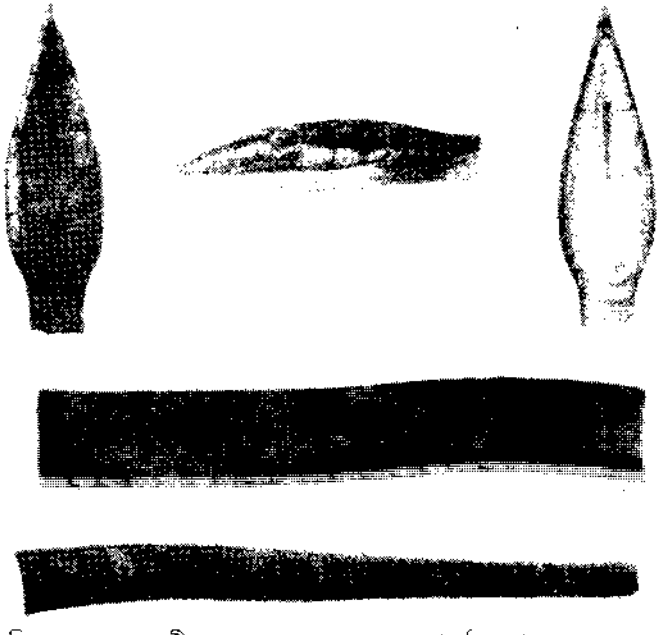

চিত্র ৩.৩৭ : সুতানলী সাপ Ahaetulla nasutus (ডানিয়েল)।

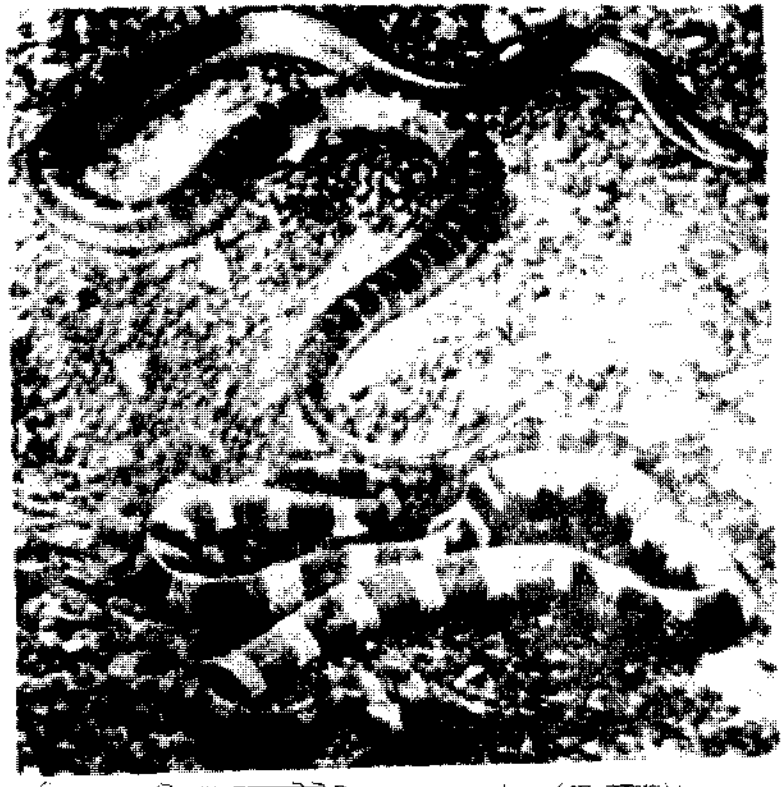

চিত্র ৩.৩৮ : (উপরে) কালকেউটে Bungarus caeruleus (এম. কৃষ্ণাণ)।

চিত্র ৩.৩৯ : (নিচে) শাকিনী সাপ Bungarus fasciatus (এম. কৃষ্ণাণ)।

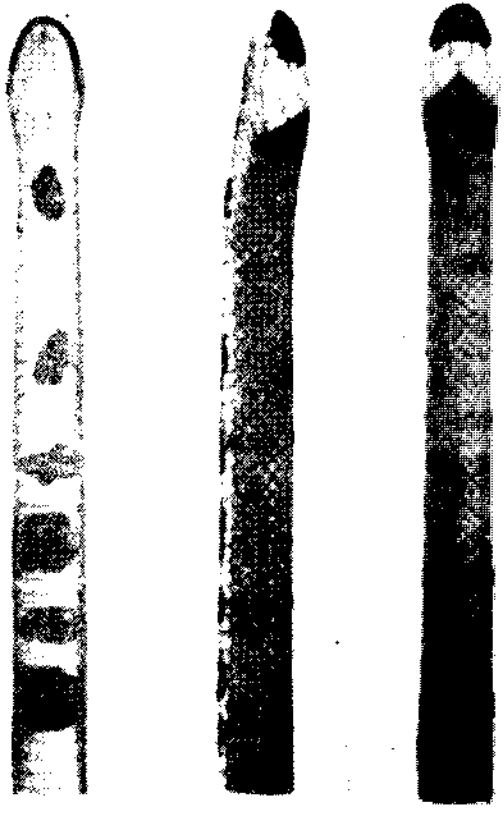

চিত্র ৩.৪০ : প্রবাল সাপ Callophis macclellandi (ডানিয়েল)।

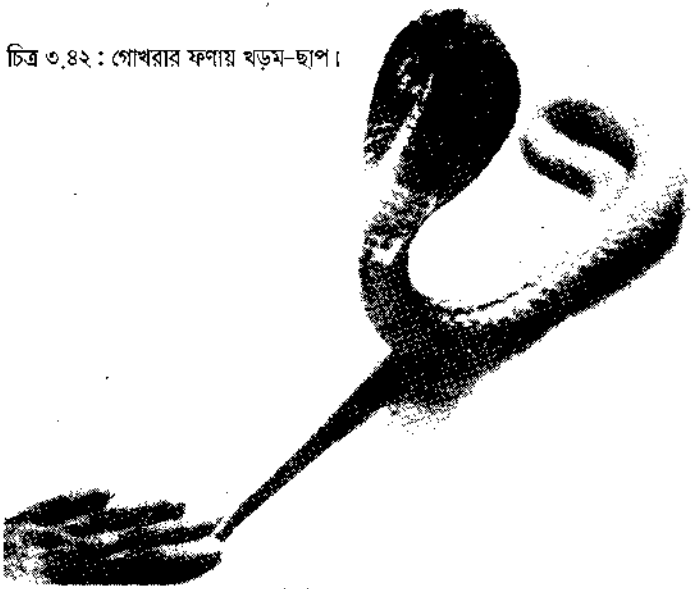

চিত্র ৩.৪২ : গোখরার ফণায় খড়ম-ছাপ।

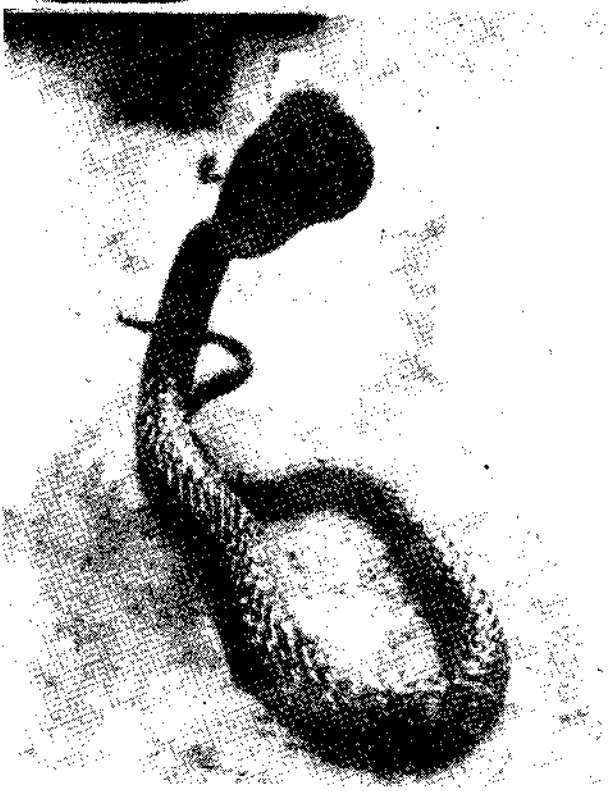

চিত্র ৩.৪১ : গোখরা Naja naja.

চিত্র ৩.৪১ : শঙ্খচূড়/রাজ গোখরা Ophiophagus hannah (হুইটেকার)।

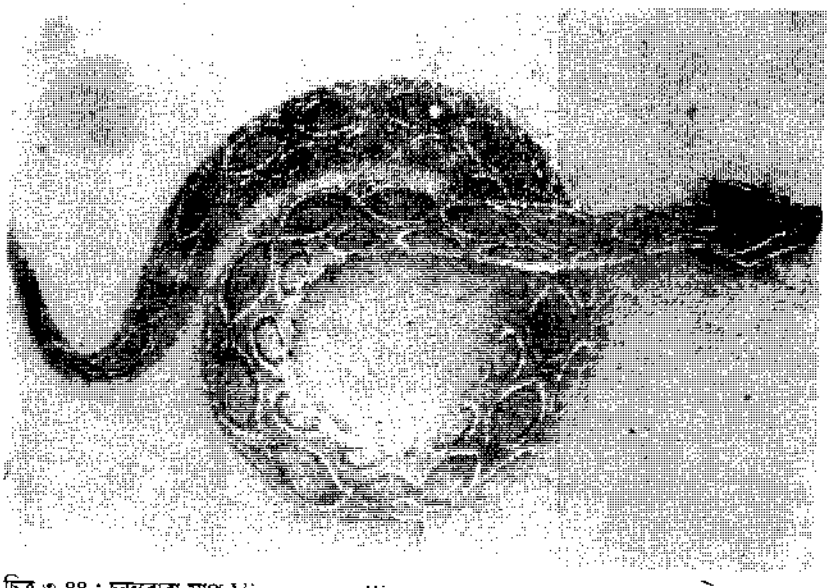

চিত্র ৩.৪৪ : চন্দ্রবোরা সাপ Vipera russelli.

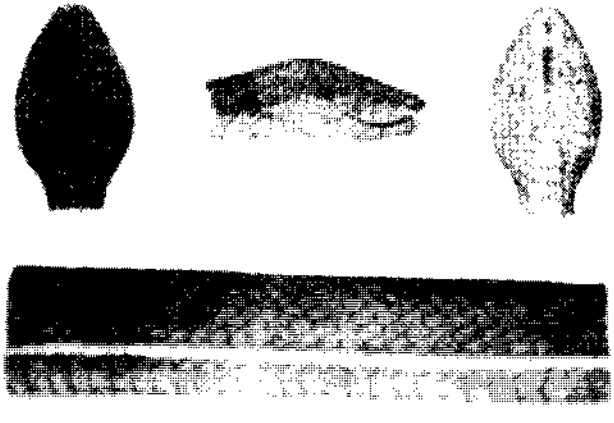

চিত্র ৩.৪৫ : সবুজ বোরা Trimeresurus gramineus (ডানিয়েল)।

গুই সাপ ইঁদুর, সাপের ডিম, কাঁকড়া এবং ফসলের অনিষ্টকারী পোকা খায়। এজন্য অনেক গ্রামবাসী এদেরকে ধরতে বা মারতে দিতে রাজি নয়। তবে এক জায়গায় গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন এই বলে যে, গুই সাপ মাঝে মাঝে মোরগ বা হাঁসের ছানা খেয়ে ফেলে। এরূপ ঘটনা বিরল। গুই সাপ ইচ্ছা করলে লেজ দিয়ে আঘাত হানতে পারে। অনেক সময় ভয় দেখানো এবং বিপক্ষের সাথে ঝগড়ার সময় বেশ জোরে হিস্ হিস্ শব্দ তুলতে পারে। ডাঙ্গায় দৌড়ানোর সময় লেজ মাটি থেকে কিছুটা উপরে রাখতে পারে।

সাপ : উপবর্গ ; স্কোয়ামাটা (Suborder : Squamata)

বাংলাদেশের মানুষ যে দলের প্রাণীকে সবচেয়ে ঘৃণা করে, ভয়ের চোখে দেখে এবং দেখামাত্র মারাকে ধর্মীয় অনুশাসন বলে জানে — সে হলো সাপ। সাপ সম্পর্কে ভয় এত বেশি যে সাপ শব্দটি উচ্চারিত হবার সাথে সাথে ভয়ে চিৎকার এবং সেই সাথে একটি লাফ মেরে ক'হাত দূরে পড়ার মতো কাণ্ড অনেকেই করে বসেন। অন্ধকার ঘরে সাপ মানেই সারা ঘরে সাপ — এমন ধারণাও যথেষ্ট চালু। সাপ সম্পর্কে যত কিংবদন্তি, বিশ্বাস এবং গল্প চালু আছে, তার কিছু বিবরণ প্রথমে হোসেন বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকায় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের নুরুল হুদা সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশ করেন। সেসব এবং আমার জানা অন্য কিছু বক্তব্যও আলাদা করে সংযোজিত হলো। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত আমার লেখা "বাংলাদেশের সাপ" নামক বইয়ে। সাপ দেখে ভয় পাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে পা-বিহীন সাপ এঁকে বেঁকে চলে। উপরন্তু তারা নিশাচর এবং কোনো কোনো প্রজাতির কামড়ে লোকজন এবং গৃহপালিত জীব-জানোয়ার মারা যায়।

সাপ এবং টিকিটিকি গিরগিটিদেরকে একই বর্গে আনার জন্য এদের মাঝে সাদৃশ্য অনেক। বেমিল প্রধানত দুটি। প্রথমত সাপের পা নেই। দ্বিতীয়ত সাপের কানে বাইরের ছিদ্র এবং পর্দা নেই। সব টিকটিকির, এমন কি পা-বিহীন গিরগিটিসহ, চোখের পিছনে একটি পর্দা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য গর্ত তার মাঝে কানের পর্দা ডুবে থাকে। কখনও বা সে পর্দার উপর আঁইশ থাকে। কিন্তু টিকটিকিতে পর্দা একটা থাকেই। সাপে সে পর্দা বা ছিদ্র একেবারেই নেই। কাজেই একটি টিকটিকি এবং একটি সাপের মাথা পাশাপাশি রাখলেই তফাৎটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। সব সাপের চোখের পাতা নেই, নেই স্টারনাম, মূত্রথলি, ও কোনো অস্থিচক্র। সাপের গলা থেকে অবসারণী-ছিদ্র পর্যন্ত একসারি পাথালি আঁইশ আছে। টিকটিকির পেটে আছে সারি-সারি আঁইশ। সাপের চোয়াল ইলাস্টিক লিগামেন্ট দ্বারা যুক্ত থাকায় মুখ প্রায় ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত খুলে যেতে পারে। নিচের চোয়ালের অগ্রভাগের সঙ্গমস্থল লিগামেন্টে জোড়া। কাজেই প্রতিপাশের নিচের চোয়াল খাবার গলধঃকরণের সময় এঁকে বেঁকে যেতে পারে। চোখ একটি স্বচ্ছ আবরণী বা চর্মে ঢাকা থাকে যা সাপের খোলস ছাড়ার সময় পড়ে যায়।

সাপের দেহ

সাপ এবং টিকিটিকিদের সাথে সম্পর্ক থাকলেও প্রথমোক্তদের পা না থাকাটা অনেকেই যেন গ্রহণ করতে পারেন না। সর্প-বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে বলেন

সাপের আবির্ভাবের আগে টিকটিকিদের একটি দল প্রথমে মাটির নিচে বাসের উপযোগী অভিযোজনে সমৃদ্ধ ছিল। মাটির নিচে বাস করা প্রাণীদের পায়ের ব্যবহার নেই বললেই চলে। পা দরকার হয় হাঁটা বা জোরে দৌড়াবার জন্যে। আমাদের টিকটিকিদের পা বেশ যুগোপযোগী। আঁচিলের বা আনজনের অপেক্ষাকৃত কম উন্নত । এদের এক দলে শুধু সামনের একজোড়া ক্ষীণ পা থাকে। অন্য আর একটি দলের পা নেই। অথচ এরা টিকটিকি বা আনজন জাতীয় প্রাণী। উদাহরণ হচ্ছে স্লোওয়ার্ম (Slow-worm) এবং গ্লাস স্নেকস্ (Glass snakes)। সাপের বর্তমান যে চেহারা সেই চেহারায় আবির্ভূত হতে প্রথমে সাপের পূর্ব পুরুষদের মাটিরে নিচে এবং তারপর পা-বিহীন অবস্থায় ডাঙ্গায় চলাচলের জন্য দ্বিতীয়বার বিবর্তিত হতে হয়েছে। সেটা হলো পা-বিহীন অবস্থায় ডাঙ্গায় চলার ক্ষমতা অর্জন।

পা ছাড়া মাটির নিচে বাস করার আরেকটি অভিযোজন লক্ষণীয়। সাপের চোখে পাঁপড়ি নেই। কিন্তু এর পরিবর্তে চোখের উপর আছে একটি স্বচ্ছ ঢাকনা বা চর্ম। এটা দেহের আঁইশের একটি পরিবর্তিত রূপ মাত্র এবং ত্বক নির্মোচনের সময় এই ঢাকনাটাও পড়ে যায়। সেখানে গজায় অন্য আরেকটি। কি অদ্ভুত এই অভিযোজন। মাটির ভিতর দিয়ে চলার সময় ঢাকনার ভিতর দিয়ে ধূলিকণা চোখের মণিতে যেতে পারবে না।

মাটির নিচেই যখন বাস করবে তখন আর বায়ুবাহিত শব্দ নেবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে কি হবে। সম্ভবত সে কারণেই সাপের কানের পর্দা এবং বহিঃস্থ কর্ণ চিদ্র নেই। এর পরিবর্তে যে বস্তুর উপর থাকে যে বস্তুতে কোনোরূপ শব্দ হলে প্রয়োজনে তা গ্রহণ করার মতো কিছু অভ্যন্তরীণ অভিযোজন সাপের পূর্ব পুরুষদের হয়েছিল, যা আমাদের যুগের সাপের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুগঠিতভাবে বিদ্যমান। এর ফলে বায়ুবাহিত শব্দ গ্রহণ না করেও সাপ সহজে চলাফেরা করতে পারে।

আমাদের দেশের প্রকৃতিতে এমন কোনো টিকটিকি বা আনজন এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি যার কোনো পা নেই। অতএব বাংলাদেশী সরু পা-হীন সরীসৃপই সাপ এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কোনো কোনো যাদুঘরে বিদেশ থেকে আমদানি করা Glass snake এর নমুনা থাকতে পারে। সাপের এবং গ্লাস স্নেকের নমুনা দুটি পাশাপাশি নিয়ে মাথার অংশে চোখ বুলালে প্রথমেই নজরে আসবে সাপের চোখের পিছনে কানের ছিদ্র নেই। এদের মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত দেহের সব জায়গা আঁইশে মোড়া, পিঠ, পেট ও লেজের নিচ দিক তিন ভিন্ন ধরনের আঁইশে মোড়া। গ্লাস স্নেকের সারা দেহ প্রায় একই রকম আঁইশে মোড়া। কয়েক প্রজাতি বাদে সাপের পেটের দিকটাতে বড় বড় পাথালি আঁইশ আছে। গ্লাস স্নেকের পেট ছোট ছোট এবং টুকরা টুকরা আঁইশযুক্ত। সব সাপের দেহ লম্বা। দেহের আকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে হৃৎপিন্ড বাদে বাকি সব অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ দেহের প্রায় দৈর্ঘ্য বরাবর লম্বা হয়ে গেছে। আমাদের দেহের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র অনেকগুলি ভাঁজ হয়ে পেটে থাকে। সাপের বেলায় ঐসব ভাঁজ পড়ে পড়ে লম্বা হবার দরকার হয় না। ওটা একেবারেই লম্বা-লম্বিভাবে সাজানো।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের ভিতরের অনেক অঙ্গ জোড়ায় জোড়ায় থাকে। সাপের জন্য এগুলি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিবর্তনের ফলে সে সমস্যা বেশি সময় থাকে নি।

সাপ অতি সহজে এক জোড়ার একটি অঙ্গ দেহের সামনে এবং অন্যটিকে পিছন দিকে ঠেলে জায়গা করে নিয়েছে। যেখানে এটি সম্ভব হয় নি সেখানে জোড়ার একটি অঙ্গ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অথবা অত্যন্ত ছোট হয়ে তা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

সাপের বৃক্কের ডানের অংশ সামনে, বামের অংশ পিছনে। একইভাবে সাজানো আছে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়। ডান কলিজা অস্বাভাবিক লম্বা। বাম অংশ খুবই ছোট। পিত্তথলি এবং প্লীহা ডান কলিজার প্রায় শেষের দিকে অবস্থিত। প্রায় সাপের মোটে একটি ফুসফুস। আর সেটি হচ্ছে ডানেরটি। কারো কারো বাম ফুসফুস থাকতে পারে তবে তা খুবই ছোট। ফুসফুস কম করে হলেও দেহের অর্ধেক পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা দৈর্ঘ্য বরাবর। ।

সবচেয়ে মজার হলো আমাদের শ্বাসনালীতে যে তরুণাস্থির বলয় থাকে সাপের বেলায় বলয়গুলি অসম্পূর্ণ। ফলে এই নালী প্রয়োজন একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, নালীর যে অংশ ফুসফুসের ভিতর দিয়ে চলে গেছে সে অংশ স্বচ্ছিদ্র এমন পর্দাযুক্ত যে তা ফুসফুসের ঝিল্লির মতন কাজ করে। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাপ যখন খুব ভারী খাবার ধরে তখন শ্বাসনালীর অগ্রভাগ খাবারের চাপে বন্ধ হবার কথা। কিন্তু না। এমনটি হয় না। বিশেষ মাংসপেশী শ্বাসনালীর মুখ সাপের নিচের চোয়ালের প্রান্তদেশে ঠেলে দিয়ে সহজেই শ্বাসের কাজ চালিয়ে নেয়।

দেহের ভিতর অধিক জায়গা বাড়াবার জন্যে মূত্রথলিটি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাংলাদেশী সাপ

হোসেন বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এদেশে সাপের প্রজাতির সংখ্যা ৫০ হতে পারে। মোন্‌তাকিম, সরকার, আমি নিজে এবং হোসেন বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত নমুনার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশী সাপের উপর প্রথম তালিকা প্রকাশ করি। সেখানে ২৮ প্রজাতির কথা উল্লেখ থাকলেও আমরা বলেছি এদেশের সাপের প্রজাতির সংখ্যা ৫০ এর উপর হবে। আমার চেক লিস্টে আমি ৭৯টি প্রজাতির সাপ বাংলাদেশে আছে বলেছি। এ সংখ্যা ভবিষ্যতে বাড়বে বলে আমার ধারণা। আমার লেখা "বাংলাদেশের সাপ" বইতে এ সংখ্যা ৮১তে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশস্থ অবিষধর সাপের প্রজাতির সংখ্যা ৫২ এবং বিষধর সাপের সংখ্যা ২৭। অবিষধর বা বিষহীন সাপের প্রজাতিগুলি ৭টি পরিবার এবং দুটি উপপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বিষধরের প্রজাতিগুলি দুটি পরিবার এবং চারটি উপপরিবারভুক্ত। সাপের একটি প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি চেনার উপায় হলো — মাথার উপরের আঁইশ (বর্ম), দেহের মাঝখানে আঁইশের সংখ্যা, পেটের পাথালি আঁইশের সংখ্যা, অবসারণী ছিদ্র ও ছিদ্র থেকে লেজের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত জরুরি। সাপ চিনতে হলে এসব কঠিন বিষয়গুলি জানতে হবে এবং সে জন্য উৎকৃষ্ট বই হচ্ছে স্মীথের ফোনা অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সিরিজের (১৯৪৩) রেপটাইলিয়া খণ্ডের তৃতীয়াংশ এবং রমুলাস হুইটেকারের লেখা (১৯৭৮) কমন স্নেকস অফ ইণ্ডিয়া। আঁইশের বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে মোটামুটিভাবে আমাদের দেশের কতকগুলি সাধারণ সাপ সম্পর্কে কতিপয় তথ্য প্রদান করা হলো। এগুলি ঐ দুটি বই ছাড়াও আমার সংগৃহীত

নমুনা এবং আমার দু'জন ছাত্র মোন্‌তাকিম ও রশিদের এম. এস-সি থিসিস থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে যত প্রজাতির সাপ পাওয়া যায় তার সবই পাশের দেশগুলিতে আছে। কাজেই এখানে বাংলাদেশের সব অঞ্চলের কথাই শুধু বলা আছে। পাশের দেশে কোথায় পাওয়া যায় তা উল্লেখ করা হয় নি। সাপ ছাড়া অন্য যে সব প্রজাতির কথা এ খণ্ডে লেখা হয়েছে, তাদের বেলাতেও এ বক্তব্য রাখা যায়।

অবিষধর সাপ

দুমুখো সাপ, ব্লাইণ্ড স্নেক, গোত্র: টিফলোপিডি (Typhlopidae) বাংলাদেশে আছে তিন প্রজাতি। সাধারণত দুটি দেখা যায় ; তৃতীয়টি *(Typhlops diiardii)*[১] বিরল (চিত্র : ৩.২৯)।

দু'মুখো সাপ *(Tyhplops porrectus)* এবং *(Ramphotyphlops briaminus)* (চিত্র : ৩.৩০) এদের রং লালচে বাদামী বা কালচে হয়। দেখতে কেঁচোর মতো প্রায়। এদের গায়ের ছোট ছোট ইমব্রিকেট (Imbricate) আঁইশ চিক চিক করে। মাথা লেজ প্রায় সমপরিমাণ মোটা বলে এদেরকে দু'মুখো সাপ বলা হয়। তবে লেজের অগ্রভাগে এক চিমটি একটি বাঁকা কাঁটা থাকে। চোখের জায়গায় একটি ছোট ফোঁটা থাকে। তাও আবার আঁইশে ঢাকা। ইংরেজিতে সেজন্য এদের ব্লাইণ্ড স্নেক বা কেঁচোর মতো দেখার জন্য ওয়ার্ম স্নেক (Worm snake) বলে। পেটের দিক হাল্কা রঙের। আঁইশ যথাক্রমে ১৮ ও ২০ সারি এদের গায়ের আঁইশ এবং ক্ষুদ্র মুখের ভিতরকার জিহ্বা দেখার জন্য আঁতশ কাচ (Magnifying glass) ব্যবহার করতে হয়। এরা লম্বায় ১২ থেকে ১৮ মিলি মিটার। একটি বলপেনের শীষের চেয়ে সামান্য মোটা।

শহর থেকে যে কোনো ভাঙ্গা দালানের ক্ষয়ে যাওয়া সিমেন্ট আস্তরণের মেঝের ভিতর, উঠানে পড়ে থাকা পচন ধরা গাছের গুড়ির বাকলের ভিতর এবং কলাগাছের খোলার ভিতর এদের আড্ডাখানা। উইয়ের ঢিবি এদের পাবার জন্য উত্তম জায়গা বটে। বিজ্ঞানীদের মতে এই প্রজাতিদ্বয়ের সবাই স্ত্রী। কাজে কাজেই স্বাভাবিক স্ত্রীপুরুষের মিলনের মাধ্যমে এদের বংশবৃদ্ধি হয় না। পারথেনোজেনেসিস (Parthenogenesis) প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। এরা রাতে চলাফেরা করে। দুমুখো সাপের প্রধান খাদ্য কেঁচো ; উইয়ের ডিম এবং পিপঁড়ে।

লোকজন সাধারণত বিষধর সাপের চাইতেও বেশি ভয় করে এই দুমুখো নামক সাপকে। এদের শরীর খুব চিকন হবার ফলে কাত করে মারা লাঠির আঘাতে এদের মৃত্যু হয় না। তাই অনেকে এদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারার পক্ষপাতি। এদেরকে খুবই "বিষধর" বলে সবাই সনাক্ত করে থাকেন। কিন্তু এরা নির্বিষ, অত্যন্ত ভীরু, মোটেও বিপজ্জনক নয়। পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াবার সামর্থ্য এদের নেই বললেই চলে। সে জন্য কোনো ঝোপঝাড় এবং বনে দুমুখো সাপ পাওয়া না গেলে বুঝতে

---

১ ইদানিং কিছু কিছু সাপের বৈজ্ঞানিক নামের পরিবর্তন হয়েছে।

হবে ওসব এলাকার পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। আর তা অনেক প্রাণী বাসের অযোগ্যও হতে পারে।

অজগর, গোত্র : বয়িডী (Boidae)

অজগর গোত্রের তিনটি প্রজাতি বাংলাদেশে আছে। দুটি অবশ্যই আছে। তৃতীয়টি এদেশে আছে কি না আমি বলতে পারবো না তবে জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার (Zoological Survey of India) বন্যপ্রাণীবিদরা কমন স্যাণ্ড বোয়া (*Erxz conicas*) খুলনার পশ্চিম বঙ্গীয় সুন্দেরবন থেকে সংগ্রহ করেছেন। সে হিসেবে এই বালুবোরা সাপটি আমাদের খুলনা জেলার সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় থাকতে পারে।

অজগর, ময়াল, রক পাইথন (*Python molurus*) (চিত্র : ৩.৩১)। অজগর সাপ এক সময় বাংলাদেশের সর্বত্র ছিল। জীবনে মাতৃভাষার প্রথম অক্ষর "অ" শেখার সময় বাঙ্গালিরা "অ-তে অজগর" বলেই শুরু করে। এ প্রজাতি বাঙ্গালি জাতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে অজগর আছে শাল, চিরসবজ এবং সুন্দরবন এলকায়। দেশের আনাচে-কানাচে এক দুটি যে নেই তা নয়। বেচারা অজগরদের শরীর খুব ভারী। দেশে লোক সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে গাছপালা। মানুষ ও তাদের পোষা কুকুরের চোখ এড়ানোর জন্য বিশাল বপু অজগরের প্রাণান্ত। উপরন্তু দেখা মাত্র মেরে ফেলার জন্য বন্দুক, বর্ষা-ফলা নিয়ে হাজারো বীর বাঙ্গালি জড়ো হয়ে যাবে। মুহূর্তে যমদূত শেষ করে দেবে ঐ অজগরকে।

একটি অজগর সারণত ৫-৬ মিটার লম্বা হয়, এদের দেহ খুব মোটা। এদের মাথা বল্লমের মতন। লেজ খাটো সমস্ত দেহ নরম মসৃণ আঁইশে মোড়া। গায়ের উপরে ও পাশে হলুদ বা গাঢ় বাদামী রঙের অনেক ছোপ আছে। পেটের দিক হালকা রঙের। এদের অবসারণী-ছিদ্রের পাশে ক্ষয়িষ্ণু পায়ের স্মৃতিস্বরূপ একটি করে নখরাকৃতি "স্পার" থাকে। এগুলি পুরুষ সাপে লম্বা হয়। অজগরের নাসারন্ধ্রের পাশে একটি চিড়ের ন্যায় তির্যক-ছিদ্র থাকে। এদেরকে বলা হয় সংবেদী গর্ত (Sensory pit) — যা দেহের বাইরের তাপ সম্পর্কে সম্যক তথ্য সরবরাহ-উপযোগী। এ ধরনের পিট আছে কেবল পিট ভাইপার জাতীয় বিষধর সাপের। অজগর বেশ আলসে প্রকৃতির। অতবড় মালগাড়ী টানতে যে পরিমাণ কয়লা লাগবে তা রোজ রোজ যোগাড় করা কঠিন বলেই সম্ভবত এমন স্বভাব। এরা প্রয়োজনে ঘন্টা খানেক অথবা তারও বেশি সময় পানির নিচে ডুবে থাকতে পারে। গাছ বেয়ে উঠতে ও লেজ দিয়ে ডাল ধরে ঝুলে থাকতেও এরা পছন্দ করে। খাবার জন্য ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

কখনো কখনো যে সব জায়গায় বিভিন্ন বন্যপ্রাণী পানি খেতে আসে সেখানে কোথাও লুকিয়ে অথবা মরার মতো পড়ে থাকে। খাদ্যবস্তু এলেই প্রথমে কামড়ে ধরবে, ঐসঙ্গে দেহের বিভিন্ন ভাঁজে খাদ্যবস্তুকে প্যাঁচিয়ে দম বন্ধ করেই মেরে ফেলবে। তারপর খাবে। 'অজগরের চোয়ালের ভিতর হরিণের মাথা' এমন নজিরও বনে পাওয়া গেছে। দুটি প্রাণীই মরেছে। কারণ শিঙসহ হরিণ গলধঃকরণ করা অজগরের ভাগ্যে আর জোটেনি। যেহেতু সব সাপের মতো এদের দাঁতগুলি পিছন দিকে বাঁকা, সেহেতু খাবার মুখে ঢুকালে খাবার

আর উদ্গীরণ করা সম্ভব হয় না। অজগর ছোট ইঁদুর থেকে বাঘ, শালিক থেকে ময়ূর পর্যন্ত সব পশুপাখি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। বড় খানা খাবার পর অজগর একই জায়গায় মরার মতো পড়ে থাকতে পারে হপ্তা-ব্যাপী। অজগর নিশাচর প্রাণী। দিনে ঘুমায় অথবা সময় সময় রোদে গা মেলিয়ে আরাম করে। অজগর পালা বা পোষা যায়। এদের পালতে খুব বেশি খাবারের দরকার হয় না। মার্চ থেকে জুনের মধ্যে ৫০ থেকে ১০০টি করে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি কোনো গর্ত, গুহা বা গাছের বড় ফোকরের মধ্যে পেড়ে সেগুলিকে বেষ্টন করে থাকে স্ত্রী অজগর। এ অবস্থা চলে দু' থেকে আড়াই মাস পর্যন্ত। মা থাকে সম্পূর্ণ অভুক্ত। জন্মের সময় বাচ্চার দৈর্ঘ্য৬০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ব্যাপকহারে নিধনকর্মের ফলে অজগর বাংলাদেশে কমে গেছে। বিভিন্ন উপজাতীয়রা অজগর খায়। অজগরের ৩-৪ মিটার লম্বা চামড়া ৫০০ থেকে ১০০০ টাকায় বিক্রয় হয়। চামড়া থেকে মূল্যবান সামগ্রী তৈরি হয়। চোরা পথে এদের চামড়া দেশের বাইরেও যায়।

গোলবাহার, রিগাল, বা রেটিকুটেড পাইথন *(Python reticulatus)*

পৃথিবীর দীর্ঘতম সাপ হচ্ছে গোল বাহার, লম্বায় ৯ মিটারের কিছু উপরে (৩২ ফুট পর্যন্ত রেকর্ড করা আছে)। আমাদের সৌভাগ্য যে সাপটি বাংলাদেশে আছে। সিলেট থেকে শুরু করে পূর্ববাংলার সকল চিরসবুজ বনে খুব সামান্য পরিমাণে হলেও গোল বাহার বিদ্যমান। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে একটি নমুনা সংগৃহীত হয়েছে এবং সিলেট থেকে সংগৃহীত অন্য আরেকটি নমুনার চামড়া সিলেট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সরকারি বাসগৃহে ছিল ১৯৮০ সালে।

গোলবাহার লম্বা কিন্তু অজগরের মতো স্থূলাকায় নয়। অপেক্ষাকৃত সরু। অজগরের শরীরে যে ছাপ হলুদ বা বাদামী রঙ আছে এ প্রজাতিতে তা জালাকার ধারণ করেছে। অজগরের পিঠের ছাপ ঘোড়ার গদির মতো ; জালের মতো নয়। পাশে দিয়ে জালকগুলি অনেকটা 'V'-এর আকার এবং পিঠে বর্ফির আকার ধারণ করে।

গোলবাহার পানির কাছেই থাকতে পছন্দ করে। অপেক্ষাকৃত ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী ধরে খায়। কদাচ বন্যশূকর ও মায়াহরিণ, ময়াল ; ইত্যাদি খেতে পারে। বর্ষার প্রারম্ভে ১০ থেকে ১০০টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে কোনো গর্তে বা নিচু গাছের গুড়ির কোটরে। ডিম ফোটে ৬০ থেকে ৭৫ দিনের মাথায়। জন্মের সময় দৈর্ঘ্য থাকে ৬০ মি.মি.।

শামুকখোর ও ঘরগিন্নী ; গোত্র : ডিপসাডিডী (Dipsadidae) নির্বীষ

এই গোত্রে তিনটি উপগোত্র আছে। প্রথমটি হচ্ছে প্যারেইনি *(Pareinae)* এর অন্তর্ভুক্ত শামুকখোর বা Snail-eater *(Pareas monticola)* ও *(P macularius)* নামক প্রজাতি দুটি আমাদের চিরসবুজ বনে থাকতে পারে। এদের চোখগুলি বড় এবং দর্শনীয়। চট্টগ্রামের হাজারীখিল বনে একটি প্রজাতি সংগ্রহ করেছিলাম। সহযোগী ছাত্ররা এটির এবং একটি কোরাল স্নেকের নমুনা সমেত পুরো প্লাস্টিক ব্যাগ হারিয়ে ফেলে।

উপগোত্র লাইকোডনটিনি (Lycodontinae)-তে আছে ঘরগিন্নী ও কুকরী সাপ। ঘরগিন্নির তিনটি প্রজাতির মধ্যে বাণ্ডেড উল্‌ফ স্নেক *(Lycodon fasciatus)* এদেশে

বিরল। হলুদাভ ঘরগিন্নি সাপ *Yellow-Spectacled Wolf Snake.* ও ইয়োলো স্পেট্যাকল্ড উলফ স্নেক *(Lycodon aulicus)* বাংলাদেশে বেশ পাওয়া যায়। ঘরদোর, ভাঙ্গা দালান কোঠায়, গুহায়, নুড়ি পাথরের পাঁযা, গাছের খোরল এদের খুব পছন্দসই জায়গা। এদের গা হাল্কা বাদামী থেকে ধূসর বা কালো। গায়ে ১০ থেকে ২০টি সাদা বা হলুদ বলয় থাকে। কালো চোখের মনি দেখা যায় না। চোখ সামান্য উন্নত। আঁইশগুলি মসৃণ। পেটের পাথালি আঁইশের সংখ্যা ৩৫টি। এরা নিশাচর এবং টিকটিকি ও পোকামাকড় খেতে পছন্দ করে। গ্রামে ছনের ও টিনের ঘরের টুইয়ের ভিতর এদের দেখা যায়। এদের উপরের চোয়ালের দুটি লম্বা দাঁত দেখে ঘরগিন্নি সাপকে বিষধর বলে মনে হতে পারে। আসলে ঐ দাঁতের সাহায্যে টিকটিকি গিরগিট তক্ষক প্রভৃতি ধরে। এদেরকে দেখতে অনেকটা বিষধর কেউটে সাপের মতো। *Lycodon jhara* নামে তৃতীয় প্রজাতিটি অল্প বিস্তর দেখা যায়।

উদয়কল বা কুকরী সাপ

কুকরী সাপের ৭টি প্রজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে দুটি প্রজাতি সচরাচর দেখা যায় এবং দক্ষিণ বাংলাদেশ বাদে প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। সংখ্যায় কম। অপরাপর যে ৫টি প্রজাতি—উত্তরবঙ্গ, দেশের উত্তরাঞ্চল (জামালপুর-মোমেনশাহী) এবং পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম বিভাগ)-এ পাওয়া যায় অথবা পাওয়া যেতে পারে। তারা হলো —

হোয়াইট বারড কুকরী স্নেক *(Oligodon albocincutus)*
ব্লাকবারড কুকরী স্নেক *(Oligodon cinereus).*
রাসেল্‌স কুকরী স্নেক *(Oligodon taeniolata),*
মান্দালয় কুকরী স্নেক *(Oligodon theobaldi)* এবং
স্পট-টেইল্ড কুকরী স্নেক *(Oligodon dorsalis)*

কুকরী সাপ ক্যানটরস্ কুকরী স্নেক *(Oligodon cyclurus)*

প্রজাতিটি ঢাকা এবং মোমেনশাহী থেকে পাওয়া গেছে। সৈকত ও লোনা পানি অঞ্চলের জেলা ও বনাঞ্চল বাদে দেশের অপরাপর জেলায় ও বনে কুকরী সাপ পাওয়া যেতে পারে। এদের মাথায় অস্পষ্ট হলেও পরপর দুটি 'V' এর মতো ফিতাকৃতি ডোরা আছে। এরা লম্বায় সর্বাধিক ৫০০ মি.মি. হয়। এদের আঁইশ মসৃণ এবং চিক চিক করে। মাথাটা ভোঁতা। চোখের মণি গোল। রাস্তার পাশের নুড়ি-পাথর, গাছের কোটরে, ভাঙ্গা দালান এদের বাসের জায়গা। সাধারণত নিশাচর হলেও বৃষ্টির পর দিনের বেলাতেই চলতে দেখা যায়। পাখি এবং সরীসৃপের ডিম এদের পছন্দ হলেও এরা খায় টিকটিকি গিরগিটি, তক্ষক, আনজনী, ব্যাঙ ও ঘাস-ফিড়িং প্রভৃতি।

বলয়যুক্ত কুকরী সাপ, ব্যাণ্ডেড কুকরী বা কমন কুকরী *(Oligodon arnensis)*

এ প্রজাতিটি দেশের সর্বত্র অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। লম্বায় সচরাচর ৩০০ থেকে ৪০০ মি.মি. হলেও সর্বাধিক ৬৪০ মি.মি. হতে পারে। এদের মাথায় ও ঘাড়ের উপর কালো তীরাকৃতির কালো মোটা ডোরা অত্যন্ত স্পষ্ট। বাকি সারা গায়ে মোটা মোটা কালো বলয়

থাকে। বলয়গুলি দেখতে অনেকটা শংখিনী সাপের কালো বলয়ের মতো। তবে তার মতো কুকরীর গায়ে কোনো হলুদ বলয় নেই। বলয়ের সংখ্যা ১০ থেকে ২০টি। বলয়গুলি কদাচ বাদামী হতে পারে। গায়ের রং লালচে অথবা ছাই মিশানো বাদামী। পেটের দিক সাদা ও ঘরগিন্নীর মতো। কুকরীর সাপের উপরের চোয়ালের সামনে দুটি লম্বা দাঁত থাকে। এ দাঁত টিকটিকির মতো চাল খাবার খুব সহজে মুখে আটকে রাখতে পারে। এদের রং এবং দাঁত বিষধর শংখিনী সাপের সাদৃশ্য টেনে আনে। সেজন্য এরা বেশ মারাও পড়ে। এরা ছোট ছোট ইঁদুর পাখির ডিম, টিকটিকি, ব্যাঙ ও অন্যান্য সরীসৃপ খায়। বর্ষা মৌসুমে ডিম পাড়ে। বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা রাত্রিতে এদের চলাফেরা সর্বাধিক। শরীরে ১৭ সারি আঁইশ আছে। আঁইশগুলি মসৃণ ও উজ্জ্বল।

কালোমাথা সাপ, উপগোত্র সিবাইনোফিনি (Sibynophinae)

ডুমরিলস ব্লাক হেডেড স্নেক হচ্ছে এই উপগোত্রের একটি প্রজাতি *(Sibynophis sagittaria)* এবং *(S. sagittarius)* বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর দি এডভানসমেন্ট অব সাইন্স এর ১৯৮০ সালের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রদর্শনীতে একটি ছোট, সরু জ্যান্ত সাপ রাখা হয়েছিল। সাপটি অত্যন্ত চঞ্চল ছিল। কয়েকদিন পর ওটা মারা যায়। পরে আমি ওটা সংগ্রহ করি। নিজে প্রজাতি নির্ণয় করতে ব্যর্থ হওয়ায় রমুলাসের স্মরণাপন্ন হই। সে পরে ওটাকে পশ্চিম জার্মানির ফ্রঙ্কফুর্টে অবস্থিত জিনকেনবার্গ যাদুঘরে সরীসৃপ বিশারদের কাছে পাঠান। এখনও ওটার প্রজাতি নির্ণয় হয় নি। তবে সে সাপটি যে *Sibynophis* তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। স্মিথের (১৯৪৩) বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রজাতিটি আসলে হবে *sagittaria*। আমার কাছে ঐ সাপের যে ছবি আছে তার বর্ণনার সাথে স্মীথের বর্ণনার হুবহু মিল পাচ্ছি।

কাল মাথা সাপটি লম্বায় ছিল ২৫ সে.মি. গায়ের রং ধূসর-বাদামীতে মিশানো, দেখতে একটা মোটা কেঁচোর চেয়েও চিকন। সারা শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, মসৃণ ও চিকচিকে আঁশে ভরা। ঘাড় থেকে মাথার অগ্রভাগ কালো। চোখের পিছনে দুটি ডিম্বাকৃতি হলুদ ছাপ। তারপর কিছু অংশ কালো। এর পর পরই ছিল একটি হলুদ বলয়। সাপের মাথার অংশটি ছিল অত্যন্ত দর্শনীয়। সাপটি নাকি পচা ডাল-পালায় এবং আদ্র জায়গায় ছিল। **বাংলাদেশের জন্য এটা প্রথম রেকর্ড।**

নাট্রিসিডী গোত্র (Natricidae)

বিভিন্ন ধরনের ঢোঁড়া সাপ এই গোত্রের অন্তর্গত। মোট ছয়টি প্রজাতি আমাদের দেশে আছে। একটি প্রজাতি, **সবুজ ঢোঁড়া**, গ্রীণ কিলব্যাক *(Macropisthodon plumbicolor)* অপেক্ষাকৃত বিরল এবং পাওয়া যায় কেবল চিরসবুজ বনে। এই গোত্রের সাপ দেশের প্রায় সর্বত্রই আছে এবং লোক জন এক ডাকে চিনে।

ঢোঁড়া সাপ, *Amphiesma stolata* স্ট্রাইপড কিলব্যাক, সারা দেশের যে কোনো অঞ্চলে বেশ পাওয়া যায়। হলুদে বাদামীতে মিশানো ঢোঁড়া সাপের পিঠের উপর দিয়ে দুটি হলুদ ডোরা চলে গেছে লেজ অবধি। দেহের পিছন ভাগে এই ডোরা খুব স্পষ্ট। সারা

হলুদ কালো এবং সবুজ মিশানো ঢোঁড়ার শরীরে আঁইশ বেশ বড় এবং যথেষ্ট স্ফীত। সারা শরীরে চৌখুপি নকশার মতো রয়েছে। চোখের পাশাপাশি প্রতিপাশে দুটি করে কালো দাগ আড়াআড়িভাবে রয়েছে।

দৈর্ঘ্য ৩০০ থেকে ১২০০ মি.মি. পর্যন্ত হয়। সংগৃহীত নমুনার মধ্যে জামালপুরের সাপটি ১১০০ মি.মি. লম্বা ছিল। শরীরে ১৯ সারি আঁইশ এবং পেটে প্রায় ১৬০টি পাথালি আঁইশ থাকে। ব্যাঙ এবং মাছ ঢোঁড়া সাপের প্রধান খাদ্য। তবে মাঝে মাঝে পাখি, ইঁদুর, গিরগিটি, টিকটিকি ইত্যাদি খেতে পারে। এরা দিনে খায় রাত্রে বিশ্রাম নেয়। মাঝে মাঝে রাত্রেও খাবার খায়। পানির কাছাকাছি এরা থাকতে পছন্দ করে। ডিম পাড়ে একসাথে প্রায় ৬জন দুয়েক। স্ত্রী ঢোঁড়া সাপ ইঁদুরের গর্ত, রাস্তার বা আইলের ধারে ডিম পেড়ে তা প্রায় দুমাস ধরে যত্ন করে। বর্ষাপূর্ব সময় প্রজনন করে থাকে।

ঢোঁড়া সাপের চামড়া প্রচুর বিক্রি হয়। এদের চামড়া বিদেশে রপ্তানি হয়। দেশে বেল্ট, মানিব্যাগ ইত্যাদি তৈরি হয়। ঢোঁড় সাপ খুবই বদমেজাজী। ধরা মাত্র কামড় দিতে পারে। অনেক সময় গলায় পাঁজরার হাড় ও চামড়া ফুলিয়ে আক্রমণ করতে পারে। সে কারণে গোখরা বলে ভুল করাও অস্বাভাবিক নয়।

কালো মেটে ঢোঁড়া সাপ, ডার্ক বেলিড মার্শ স্নেক *(Xenochrophis cerasogaster)*

এটা একান্তই জলের প্রাণী। লোনা পানি বাদে অন্য যে কোনো পানিতে কালো ঢোঁড়া পাওয়া যাবে। বিল বাওরে মাছ-মারার সময় কাদাতে পা ফেলার ফলে যে প্রাণীটি পায়ের ভিতর আড়ি-মুড়ি দিতে থাকে সেটি এই কালো ঢোঁড়া। গ্রামে পুকুর সেচার সময় বহু কালো ঢোঁড়ার লেজে ধরে শুন্যে মারা হয়। সঙ্খচিল এবং ভুবনচিল ওদের নিয়ে মহোৎসব করে। বর্ষার পানি কমার সাথে সাথে প্রচুর মেটে ঢোঁড়া ধরা পরে জালে বা দুয়াইরের মধ্যে।

জলঢোঁড়া সাপ একটু বেটে এবং অপেক্ষাকৃত মোটা। তবে মাথা ছোট, চিকন এবং খাটো। ঘাড় অধিক চিকন। মাথার পিছন থেকে লেজের উপর পর্যন্ত পিঠ এবং পাশের অর্ধেক বরাবর জলপাই-বাদামী বা সবুজাভ। পেটের দিক লালচে। কখনো কখনো পুরো মাথার দিকটা বাদামী রংয়ের হতে পারে। গলা থেকে লেজ অবধি পেটের দুপাশ দিয়ে দুটি হলুদ রঙের ডোরা চলে গেছে। এর উপরে বা নিচে চিকন খয়েরী ডোরা থাকতে পারে। পিঠে বাদামীতে বা বেগুনিতে মিশানো কালো চিতি থাকতে পারে। লম্বায় সর্বাধিক ৬৫০ মি.মি. হতে পারে। মাঝ শরীরে আঁইশের সংখ্যা ১৯ এবং পেটের পাথালি আঁইশ ১৪৩ থেকে ১৫৪টি। জলঢোঁড়া মাছ এবং কাঁকড়াভুক প্রাণী। তবে জলজ কীটপতঙ্গও খায়। এরা বর্ষায় ডিম দেয় ও বাচ্চা তোলে। দেশে জলাশয় কমতে থাকায় এরাও কমছে।

মেটে সাপ, মাইট্টা সাপ, অলিভ কিলব্যাক *(Atretium schistosum)*

এরা বাংলাদেশের জলাশয়ের আরও একটি অতি সাধারণ এবং ব্যাপকভাবে বিস্তৃতিযুক্ত সাপ। কেই ও অপরাপর মাছ ধরার জন্য কচুরিপানা এবং অন্য জলজ উদ্ভিদের ঝোপের নিচে তে-কোনো জালি চালিয়ে দেয়। জালভর্তি কচুরিপানা ঝেড়ে ঝেড়ে উচ্ছিষ্ট যা থাকে

তার সিংহ ভাগ হয় মাইট্রা সাপ, জলজ পোকা এবং বাকি অংশে হয় মাছ। বরিশালের কালোমেঘা এলাকায় থাকার সময় (১৯৫১–৫২ সাল) এ সাপের এক অদ্ভুত স্বভাব দেখেছি ওখানে পুকুরের কিছু অংশে বেড়া দিয়ে তাতে পর্দামাফিক গোসলের রেওয়াজ। সেই যে গোসল খানার বেড়া তাতে গণ্ডায় গণ্ডায় মাইট্রা সাপ উঠে থাকত এবং ছোটদের কাজ ছিল ঘণ্টায় ওদের তাড়িয়ে পানিতে নামানো।

আগের প্রজাতিটির মতো এদের মাথা অপেক্ষাকৃত সরু। পেটের পাশ থেকে সারা পিঠ জলপাই সবুজ এবং পেট হলুদাভ বা কমলা রঙের। কদাচ পেটের পাশ দিয়ে লালচে দাগ থাকতে পারে। উপরের চোয়াল হলুদাভ। লম্বায় ৫০০ থেকে ৬০০ মি.মি., কদাচ ৬৯০ মি.মি. পেয়েছি। দেহের মাঝামাঝি ১৯টি আঁইশের সারি ; পেটে আছে ১৬০ বা তার কয়েকটি উপরে। আমাদের সংগৃহীত নমুনায় ছিল ১৩১ এবং ১৬৯ এর ভিতর।

মেটে সাপ টাকি, পুটি, টেংরা ইত্যাদির উপর বেশি নির্ভরশীল হলেও অন্য প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, জলজ কীট প্রভৃতি খায়। ভারতের মাদ্রাজে এদেরকে মশার ডিম খেতে দেখা গেছে। বর্ষা মৌসুমে এদের প্রজননের সময়। প্রতি বছর এরা মারা পড়ে লাখে লাখে। প্রতিটি জেলেই কিছু না কিছু মারে। সর্বাধিক নষ্ট হয় যখন জলাশয় শুকিয়ে আসে।

রেতি বা আঁচিল সাপ, ফাইল/ওয়াট স্নেক *(Acrochordus granulatus)*
গোত্র—এক্রোকরডিডী (Acrochordidae)

একটি প্রজাতির এ গোত্রের সাপ আমি দেখিনি। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট প্রাণীবিদ মুখার্জী (১৯৭০)* সুন্দরবন এলাকায় এ সাপ পেয়েছেন। সেজন্য আমি ধারণা করছি আমাদের সুন্দরবনের মোহনায় এই আধা সামুদ্রিক সাপটি আছে। রেতি বা উখার মতো এদের গায়ে দানা আঁইশ। সামুদ্রিক সাপের মতো এদের লেজ দু'পাশ থেকে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। সর্বদা পানিতে থাকার দরুন এদের পেট থেকে ডিম না বেরিয়ে বাচ্চা হয়—ওভোভিভিপেরাস প্রক্রিয়ায়।

গোত্র কলুব্রিডী (Colubridae)

এ গোত্রের পরিচিতি প্রজাতি হচ্ছে দুধরাজ, কাল নাগিনী এবং লাউডগা। মোট ১২ প্রজাতির কলুব্রিড বাংলাদেশে পাওয়া যেতে পারে। এদের মধ্যে অল্পবিস্তর পাহাড়ী এলাকাতে পাওয়া যায় গ্রিন র‍্যাট স্নেক *(Coluber nigromarginatus)* ও মক ভাইপার *(Psammodynastes pulverulentus)*। দ্বিতীয় প্রজাতিটি রাঙ্গামাটি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। দেশের উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের ঝোপঝাড় ও বনবাদাড়ে পাওয়া গেছে গেছো সাপ, লেসার স্ট্রাইপ–নেকড স্নেক *(Liopeltis calamari)*, স্টাইপড ব্রোঞ্জ ব্যাকড ট্রি স্নেক *(Dendrelaphis pictus)*, কমন ব্রোঞ্জ ব্যাক ট্রি স্নেক *(D. tristis* চিত্র : ৩.৩২) এবং লাওডগা, কমন গ্রিন ভাইন স্নেক *(Ahaetulla nasutus)* দেশের উত্তরাঞ্চলে পাওয়া যেতে পারে। আরবালি বা কমন ট্রিন্‌কেট স্নেক *(Elaphe helena)* কক্সবাজার, চট্টগ্রাম এবং

---

* ঐ বছর তিনি BNHS জার্নালে সুন্দরবনের উপর প্রবন্ধ লেখেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অপরাপর এলাকায় দেখা যায়। পানস সাপ নামের যে দেড়-দুই মিটারের লম্বা সাপ পাওয়া যায় তা পূর্ব ভারতীয় বনাঞ্চলের *Elaphe*'র কোনো প্রজাতি। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারিতে এ প্রজাতির একটি চামড়া কক্সবাজার ঝিনুক বাজারে বিক্রির জন্য ছিল। সংগ্রহ সম্ভব হয় নি। ব্যান্ডেড রেসার *(Argyrogena fasciolatus* চিত্র : ৩.৩৩) নামক একটি প্রজাতি চিরসবুজ বনে পাওয়া যেতে পারে।

দুধরাজ সাপ-কপার হেড টিনকেট স্নেক (*Elaphe radiata* চিত্র : ৩.৩৪)
গরুর দুধ চুষে খাওয়া থেকেই নাকি এরে নাম হয় দুরবাজ। দুধরাজ দুধ খায় না। খায় ইঁদুর, পাখি, টিকটিকি ও গিরগিটি। দুধরাজ দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই পাওয়া যায়। এদের সংখ্যা খুবই কম এবং লোনা পানির অঞ্চলে অনুপস্থিত। যমুনার পশ্চিমাঞ্চলে এদের বেশি পাওয়া যায় বলে আমার ধারণা। ক্ষেত-খামারে এদের সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যে সব কাঁচা ঘরে শস্য রাখা হয় সে ঘরের মধ্যে ইঁদুরের খোঁজে এরা ঢুকে পড়তে পারে। গরু যেখানে চরে অর্থাৎ মাঠে ময়দানে সেখানেও দুধরাজের আনাগোনা নজরে পড়ে।

একটি দুধরাজ সর্বাধিক ২০০ মি.মি. লম্বা হতে পারে। পুরুষ স্ত্রীর চেয়ে লম্বা হয়। পিঠ বরাবর আঁইশের সারি আছে ১৯টি। পেটের আঁইশের সংখ্যা ২২২ থেকে ২৫০টি। এদের মাথায় দৃষ্টি-আকর্ষি নয়টি বড় বড় বর্ম থাকে। শেষ যুগল বর্মের পিছনে একটি "পিরামিড" আকৃতির কালো দাগ। চোখের পিছন থেকে ঐ "পিরামিড" আকৃতির দাগ পর্যন্ত একটি করে দুটি সরু কালো দাগ ; চোখের নিচে থেকে পিছন দিকে প্রতিপাশে মোট দুটি কালো দাগ নেমেছে। ঘাড়ের পিছন থেকে মোট চারটি মোটা দাগ সাপের দেহের অর্ধেক বা দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত চলে গেছে। পিঠের উপরকার দাগ, পার্শ্ব দেহের দাগ দুটির চেয়ে মোটা। শেষোক্ত দাগ দেহের দিকে ভেঙ্গে কালো কালো চোখ বা ফোটার জন্ম নিয়েছে।

দুধরাজ সাপ দেখতে ধূসরে বাদামী, পিঙ্গলবর্ণ বা হলুদে বাদামী হতে পারে। পেটের দিক হলুদাভ বা ধূসর। বর্ষার আগে ৫ থেকে ২২টি ডিম দেয়। এরা বদমেজাজি।

দারাজ, ধনরাজ, ধামন, র‍্যাট স্নেক *(Coluber mucosus)*
বাংলাদেশের সব অঞ্চলে অত্যন্ত পরিচিত এই দারাজ বা ডারাস বা ধামন সাপ মানুষের এক চরম উপকারী বন্ধু। দারাজের প্রধান খাবার ইঁদুর। তাই ইংরেজি নাম র‍্যাট স্নেক। কিন্তু আমাদের দেশে এদের নামের সবচেয়ে বেশি বদনাম রয়েছে। অন্যতম দুটি হচ্ছে এদের লেজ দিয়ে আঘাত করা এবং দুধ খাওয়া (চিত্র : ৩.৩৫)।

বাংলাদেশ দারাজ সাপ পাওয়া যায় একথা সবার জানা থাকলেও আমার কাছে এদের প্রথম দুটি নমুনা সংগৃহীত হয়। এ দুটি ছাড়াও দেখেছি অনেকগুলি। এ পরিবারের অপরাপর প্রজাতির মতো চেহারা হলেও এত লম্বা সাপ সচরাচর আমরা দেখি না। আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চলের নমুনাগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি বাদামী। পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় নমুনাগুলি জলপাই বাদামীতে মিশানো। এদের চোখ বড় বড় এবং গলা অপেক্ষাকৃত সরু। উপরের এবং নিচের চোয়ালে ও গলায় কাল কাল দাগ থাকতে পারে।

পিঠের ও দেহ পাশের আঁইশের ফাঁকে কাল রঙ মিলে অনেক সময় খাড়া কাল দাগের সৃষ্টি করে। দারাজের দেহের মাঝামাঝি ১৬ বা ১৭ সারি এবং পেটে ১৯০ থেকে ২১৩টি পাথালি আঁইশ থাকে। সংগৃহীত নমুনায় ছিল যথাক্রমে ১৭ এবং ১৯৯টি। আমাদের নমুনা লম্বায় ছিল ১৯৯০ মিমি। ওরা লম্বায় ২৫০০ মিমি পর্যন্ত হতে পারে।

ডারাস সাপ ইঁদুর খায় বলে মানুষের সাহচর্যে থাকতে পছন্দ করে বললে ভুল হবে না। মানুষের বাসগৃহ হাঁসমুরগীর বাগান, শস্য ক্ষেত এবং শস্য ভাণ্ডার ইঁদুর এবং দারাজ উভয়কেই আকর্ষণ করে। দূর থেকে দেখলে গোখরার মতো মনে হওয়া এবং এদের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার ফলে দারাজ সাপ পথে ঘাটে মারা-পড়ছে। ইঁদুর ছাড়াও ব্যাঙ, অপরাপর সরীসৃপ এবং পাখির ডিম এদের প্রিয় খাবার।

প্রতিবছর বহুলক্ষ চামড়া বিদেশে রপ্তানি হয়। দেশে সামরিক শাসন জারি হবার পরে (১৯৮২) যত সাপের চামড়া উদ্ধার করা হয় তার বেশির ভাগই ছিল দারাজ সাপের চামড়া। ইঁদুর ধ্বংসকারী এমন একটি প্রাণী অত নির্বিচারে হত্যা অন্ততঃপক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে ঠিক হচ্ছে না। বাংলাদেশের সরকারের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে এদের মারা বা আহরণ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু কে শোনে বা কে তা ব্যবসায়ীদেরকে শোনায়।

মে জুন মাস এদের প্রজননের সময়। এরা যথেষ্ট পূর্বরাগ দেখাতে পারে। বর্ষায় ১০-১২টি ডিম পাড়ে। ডিম বর্ষা শেষে ফোটে।

কালনাগিনী বা উড়ন্ত সাপ, গোল্ডন অরনেট ফ্লাইং স্নেক *(Chrysopelea ornata)*

বাংলাদেশের সাপ হিসাবে যদি কোনো কৌলিণ্য থেকে থাকে তবে আছে এই কালনাগিনীর। সাপুরে সম্প্রদায় এ সম্মান কেড়ে এনেছে। এটা তাদের রুটি রুজির প্রধান উপায় (চিত্র : ৩.৩৬)।

আপনাদের সবার জানা আছে ক-বছর আগে ঢাকার ডেমরার কাছে এক রমণীকে সাপে কেটেছিল। একদিন কি দু'দিন পরে একজন ওঝা এসে মন্ত্র পড়ে বিষ নামাল। একটি কালনাগিনী এসে বিষ তুলে নিয়েছিল এবং সেই কালনাগিনীকে দিয়ে জিহ্বায় কামড় দেয়াচ্ছিল ঐ ওঝা। এমন একটি ছবিও ইত্তেফাক পত্রিকায় ছাপিয়েছিল। আর একবার আমাদের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে একজন চেংড়া অল্পবয়স্ক ওঝা তার সাগরেদসহ উপস্থিত হলেন। চেয়ারম্যান মহোদয় ডেকে যথারীতি পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওঝা সামনে ফরমাইকা টপের, মনিমুক্তা রাখার মতো, যে একটা ছোট ডিবা ধরেছিল সেটাতে ওঝার মতে সাংঘাতিক দামি একটা সাপ আছে। সেটার নাম কালনাগিনী এবং তা নাকি সাংঘাতিক বিষধর। ডিবাটা থেকে অমন বিষধর (!) সাপটি হাতে নিয়ে সবাইকে দেখালাম। তখন ওঝা বোধ হয় প্রমাদ গুণছিল। এরপর প্রাণিবিদ্যা বিভাগ থেকে একটি প্রশংসাপত্র চেয়েছিল সে। প্রশংসাটি কিসের? তা হলো — মিথ্যা বলে লোকের ঘাড় ভেঙ্গে ফায়দালুটার ব্যবস্থার। আমাদের আর প্রশংসাপত্র দেয়া হয় নি। তাতে ওঝার কিছু আসে যায় নি। কারণ তার কাছে শতাধিক প্রশংসাপত্র ছিল। যেসব দিয়েছেন মন্ত্রী বাহাদুর, ডিসি, এস-ডিও, বহু পুলিশ ও মিলিটারি অফিসার। সাপ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার সুযোগে ওঝারা কি সব না করছে।

এই সে কালনাগিনী। নাগের মানে গোখরার সাথে যার নেই কোনো সম্পর্ক। কেবল এই যে উভয়েই সাপ। বাংলাদেশের সুন্দরতম সাপের অন্যতম হচ্ছে এই কালনাগিনী। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামেই বেশি দেখা যায়। সুন্দরবনেও ঢের আছে।

পিঠের উপরে কালো-হলুদ-লাল মিশানো মোজাইকের মতো সৃষ্টি করে। প্রথম দৃষ্টিতে সাপটিকে কালছে মনে হবে, হলুদ ও সাদা বলয়াবৃত ; পেট সবুজে। মাথাটি কালো যার উপর পাথালিভাবে হলুদ কালো দাগ থাকে। মাথাটি মোটা, ঘাড় চিকণ এবং কাঁধ থেকে লেজ পর্যন্ত ক্রমশ সরু হয়েছে দেখতে একটি দণ্ডের মতন গোলাকার **কালনাগিনীর প্রথম নমুনা দেখি বরিশালের হাতেম আলী কলেজে ১৯৭৮ এর আগস্ট মাসে।** একজন স্নাতক পরীক্ষার্থী ওটা যোগাড় করেছিল। তারপর আরও তিনটে দেখি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে। পরে একটি সংগ্রহ করা হয় রাঙ্গামাটি থেকে দ্বিতীয়টি চট্টগ্রামের ওয়াইকং এলাকা থেকে। বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ করা এটাই ছিল প্রথম নমুনা। এরা লম্বায় ১০০০ মিমি থেকে ১০৭৫ মিমি পর্যন্ত হতে পারে। পিঠে আঁইশের সারি ১৭টি, পেটে ১২০ থেকে ২০০ পাথালি আঁইশ থাকে।

কালনাগিনী কি উড়তে পারে? ইংরেজিতে ফ্লাইং স্নেক বলা হয় কেন? এ প্রশ্ন অনেকের। ড্রাকো এবং উড়ন্ত কাঠবিড়ালীরা যেমন উড়তে পারে না, তেমনি পারে না উড়ন্ত সাপ বা কালনাগিনী। তবে তারা একডাল থেকে বা এক গাছ থেকে অন্যগাছে লাফিয়ে যাবার সময় গ্লাইড করতে পারে।

লাফ দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমাদের কালনাগিনী তাদের পাঁজরার হাড়গুলো ছড়িয়ে দেয়। গলা, বুক ও পেটের পেশি টেনে শরীরের সাথে লাগিয়ে দেহটাকে চ্যাপ্টা করে নেয় এবং লাফ মারার পূর্ব মুহূর্তে প্রথমে কুকুর কুণ্ডলী পাকায়। তারপর লাফ মারার সাথে দেহ টাকে চ্যাপ্টা করে বাতাসে ভাসিয়ে দেয় এবং গিয়ে উঠে লক্ষ্য বস্তুর উপর। ডালের নাগাল পাবার সাথে সাথে এর কাজ হয় দেহকে দণ্ডের মতো বানানো। তারপর অপরাপর কাজ শুরু। এভাবে কালনাগিনী শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে। সেই সাথে পথ চলার কাজটিকে করে সহজ। দারুণ গাছ বাইতে পারে কালনাগিনী—এর জন্য পেটের পাথালি আঁইশের কোণায় কোণায় বিশেষ খাঁজ আছে গাছের বাকল আটকে ধরে অগ্রসর হবার জন্য।

টিকটিকি, গিরগিটি, ইঁদুর এদের প্রধান খাবার হলেও আমাদের কালনাগিনী যা পায় তাই খায় — এ রীতিতে বিশ্বাসী। এরা দিনে কাজ করে। রাত্রে ঘুমায়। গ্রামীণ আম, জাম, বা লিচুর ডালপালাযুক্ত গাছও এদের পছন্দ। ফেব্রুয়ারি-মার্চ ৬-১২টি ডিম পাড়ে। বাচ্চা ফোটে মাস দু'য়েক পরে।

লাউডগা, সুতানলী, কমন গ্রিন ভাইন, ট্রি স্নেক *(Ahaetulla nasutus)* (চিত্র : ৩.৩৮ লাউডগা)

লখিন্দরের সাপ বলে ব্যাপক পরিচিত। অত্যন্ত সরু, চিকন, লম্বা, মাথার অগ্রভাগ সুঁচালো একদম সবুজ সাপ, উপমহাদেশে দ্বিতীয়টি নেই। কাহিনীকারগণ চিন্তা-ভাবনা করেই লখিন্দরের কাঠের ঘরের সামান্য ছিদ্রের ভিতর দিয়ে একটি ঠিক মানানসই চিকন সাপই ঢুকিয়েছিলেন (চিত্র : ৩.৩৭)

কোথাও লাউডগা, কোথাও সুতানলী সাপ বলে থাকে। এ সাপটি দেশের সর্বত্র এমনকি দ্বীপাঞ্চলেও পাওয়া যায়। দেশের নানান বনে এদের বেশ দেখা যায়।

গ্রামের শস্য, লাউ, কুমড়া, কদু এবং শিমের জাঙ্গলা অথবা যে কোনো ঝোপের সবুজ পাতার সাথে মিশে থাকা চিকন লম্বা ঐ প্রাণীটিই লাউডগা। সামান্য শব্দে সড় সড় করে সবুজ পাতা ও কাণ্ডের সাথে গা মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে লাউডগা। লাউ এর ডগার মতোই সবুজ। সাড়া শব্দ না করে অপেক্ষা করলে দেখা যাবে কি করে লাউডগাতে ফড়িং, প্রেমেনটিস এবং নানা রকম গাছের ক্ষতিকারক পোকা ধরে খাচ্ছে ঐ লাউডগা।

এদের ডিম্বাকৃতি চোখগুলো পাথালিভাবে থাকে। উপরের সবুজ অথবা নিচের হালকা সবুজ বা হলুদ রঙকে আলাদা করেছে, মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত লম্বা, একটি সাদা বা হলুদ ডোরা।

লাউডগা প্রায় ২০০০ মিমি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পিঠে ১৫ সারি আঁইশ থাকে। পেটে আঁইশের সংখ্যা ১৬৬ থেকে ২০৭। রেগে গেলে লাউডগা এক রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ; মুখ হা করে ; বুকের পাঁজরার হাড় ছাড়িয়ে সবুজ আঁইশের মধ্যবর্তী কালো ও সাদা রং বের করে ফেলে। সব কিছু মিলিয়ে এ সাপটিকে কিম্ভূত কিমাকার দেখায়। নড়াচড়ার সময় সাধারণত কামড়ায় না। কামড়ালেও কেউ মারা যাবে না। ঘা হতে পারে কামড়ের জায়গায়। অতএব ভয়ের কারণ নেই।

লাউডগা একেবারে বাচ্চা দেয়। ওভোভিভিপ্যারিটি প্রক্রিয়ায় ৩ থেকে ২২টি পর্যন্ত বাচ্চা দিতে পারে। বর্ষা ঋতু প্রধান প্রজনন-এর সময়।

গোত্র হোমালোপসিডী (Homalopsidae)

এই গোত্রের মধ্যে পরিচিত সাপ হচ্ছে **ফণিমনসা, পাইনা ঢোঁড়া, জলঢোঁড়া এবং ডিমখোর সাপ**। এর অন্তর্গত ৩টি উপগোত্র এবং ১৩টি প্রজাতি আছে বলে আমার ধারণা। তবে এর চেয়ে সংখ্যা বাড়তে পারে। উপগোত্র বইগিনির **ভিত্তর ফণিমনসা, লার্জস্পটেড ক্যাট স্নেক** *(Boiga multimaculata)* **অল্পবিস্তর সিলেটের বনে ; সাধারণ ফণিমনসা, কমন ক্যাট স্নেক** *(B. trigonatus)* **মোটমুটি** সংখ্যায় উত্তরবঙ্গে ; ফণিমনসা, ইস্টার্ণ ক্যাট স্নেক *(B. gokool)* চিরসবুজ বনে, এবং বেঙ্গল ক্যাট স্নেক *(B. cynodon)* গারো পাহাড় এলাকায় ; **সবুজ ফণিমনসা,** গ্রীণ ক্যাট স্নেক *(Boiga cyanea)* বেশ সংখ্যায় সিলেটে এবং **বাদামী ফণিমনসা** টনী ক্যাট স্নেক *(B. ochraceus)* **অল্প** বিস্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সাধারণ ফণিমনসা এবং বাদামী ফণিমনসা সংগ্রহ করা গেছে। বাকিদের মধ্যে বেঙ্গল ক্যাট স্নেক ছাড়া অন্যসব প্রজাতি বাংলাদেশ থেকে ব্রিটিশ আমলে সংগৃহীত হয়েছে। সেসব **নমুনা** অবশ্য আমাদের কাছে নেই। সবুজ ফণিমনসা চিরসবুজ বনে দেখলেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। ফণিমনসার অন্য নাম হচ্ছে বঙ্কুরাজ।

সব ফণিমনসার মাথা ঘাড় থেকে আলাদা মতন এবং বেশ বড় মনে হবে। এদের মাথার উপর বর্ষার ফলাকৃতির মতো কাল দাগ থাকবে। চোখ বড় এবং মণি খাড়া ; সারা শরীরে সাদা কালো ছোট বা অর্ধ বলয় দাগ থাকতে পারে। আঁইশের অগ্রভাগে ছোট ছিদ্র থাকে। ফণিমনসা ঝোপ-ঝাড় পছন্দ করে। এরা নিশাচর। ঘুমাবার সময় কুণ্ডলী পাকিয়ে

থাকে। একটু উত্যক্ত হলেই হা করে ফণা তুলে কামড়াতে আসবে। কামড়ে যদিও কিছু হবে না তবু ভয়ে জান কাবার। টিকটিকি, গিরগিটি, ছোট পাখি প্রভৃতি প্রধান খাবার। লম্বায় সাধারণত ৮০০—১২০০ মিমি পর্যন্ত হতে পারে। গায়ের মাঝ খানে ১৯ থেকে ২৯ সারি আঁইশ থাকে। এরা ডিম পাড়ে।

দ্বিতীয় উপগোত্র হোমালোপসিনিতে আছে দুই প্রজাতির **পানি সাপ** বা হুরিয়া *(Enhydris enhydris)* এবং *(E. sieboldi)*, **জলবোরা** *(Cerberus rhynchops)*, **মোহনার সাপ** *(Gerarda prevostianus)* এবং **সুন্দরী সাপ** *(Fordonia leucobalia)*। প্রথম দুটি প্রজাতি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতে পাওয়া যেতে পারে। শীতের শুরুতে বিলে দোয়াইর পেতে মাছ ধরার সময় দোয়াইর প্রতি ৫—৬টি পর্যন্ত আটকাতে পারে। ঢাকা অঞ্চলের দোয়াইর খুলে সাপ ছেড়ে দেয়। সিলেটের বিভিন্ন হাওরে এদেরকে মেরে ফেলা হয়। যে প্রজাতিটি বেশি মারা পড়ে সেটি হলো *E. sieboldi*।

সুন্দরবনের পশ্চিম কোণ থেকে টেকনাফের শাহপুরীর দ্বীপ পর্যন্ত মোহানা এবং সৈকতবর্তী এলাকায় হাজারে হাজারে খশখশে দেহের জলবোরা বা পানি সাপ (চট্টগ্রামের লোকেরা বলেন), ডগফেসড ওয়াটার স্নেক পাওয়া যায়। **বোরা সাপ কক্সবাজার-চট্টগ্রাম থেকে আমি সংগ্রহ করি।** পরে রশিদ ফরিদপুরের নদী থেকে এদের একটি বাচ্চা সংগ্রহ করে। এ সাপ আংশিক লোনা পানি পছন্দ করলেও মিঠা পানি এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। বাচ্চারা সমুদ্র মোহানা থেকে অনেক উপরে উঠে আসে। এরা ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত ডিম না পেড়ে একেবারে বাচ্চা দেয়। মোহানার সাপ বা গ্লসি মার্শ স্নেক সুন্দর বন অঞ্চলে পাওয়া যায়। রশিদ এর একটি নমুনা ১৯৮০ সালে সংগ্রহ করে। সেটা ফরিদপুরের নদী থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

সুন্দরী সাপ বা হোয়াইট বেলিড ম্যানগ্রুভ স্নেক আমাদের সুন্দরবন এলাকায় আছে। সংখ্যায় অল্প বিধায় চোখে পড়ে না।

তৃতীয় উপগোত্র ডেসিপেলটিনির মধ্যে আছে কেবল **ডিমখোর সাপ** ইণ্ডিয়ান এগ-ইটার *(Elachistodon westermanni)*। এ সাপটি আমরা বাংলাদেশীরা না দেখলেও ১৮৬৩ সালে রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। তার উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়েছে এ প্রজাতি। হোসেন তার প্রবন্ধে এ সাপের কথা উল্লেখ করেন নি।

ডিমখোর সাপ লম্বায় ৮০০ মিমি, লেজ সহ ১৩০ মিমি। এদের দেহের আঁইশের সারি ১৫টি। তবে ১৯টি থাকে ঘাড়ে। পিঠের মাঝখানকার আঁইশ মৌচাকের খোপের মতো ছয়কোণাকৃতি। পেটের পাথালি আঁইশের সংখ্যা ২০৮ থেকে ২১৭। পিঠের রঙ জলপাই বাদামী বা কালচে। পিঠের মাঝখানের আঁইশ স্থলে হলুদাভ-সাদা। পাশের আঁইশ চিত্রিত কালো ও হলুদাভ। পেট সাদাটে। ঠোঁট হলুদ। মাথার উপরে তারের অগ্রভাগের মতন দেখতে কাল দাগ এবং ডিমাকার খাড়া চোখের মনির সামনে ও পিছনে কাল দাগ থাকে। এ প্রজাতির সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান দরকার।

বিষধর সাপ

বিষধর সাপের কথা শোনা মাত্র গা শিউরে উঠে। আর বিষধর সাপ প্রকৃতিতে দেখা তো এক দারুণ অভিজ্ঞতা। তবে সাপুড়েদের কাছে যে কোনো বিষধর সাপ দেখা এবং চিত্র তারকাদের গলায় পরা গোখরার মালা দেখায় অবশ্য তেমন কোনো শিহরণ নেই। বিষধর সাপের ব্যাপারে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হলে দেশের বহুলোক অবিষাক্ত সাপের কামড় খেয়ে মারা যেত না। যে কোনো সাপ কামড়ালেই মানুষ মারা যাবে এ ভ্রান্ত ধারণার অবসানের জন্য বিষধর সাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা দরকার। সেসব সাপ চেনা দরকার যারা কামড়ালে এবং পরিমিত বিষ ঢেলে দিলে একজন মানুষ বা অন্য প্রাণীর মৃত্যু হবে।

কোন্ সাপকে বিষধর বলবো? যেসব সাপের একজোড়া বিষদাঁত এবং বিষথলি আছে কেবল তারাই বিষধর। তবে বিষধর সাপে সাধারণত কামড়ায় না। এমন কি কামড়ালেও লোক মরবে না। আবার এদেশী গুটিকতক প্রজাতির সাপ আছে যারা কামড়ালে ও বিষ ঢেলে দিলে মানুষ থেকে হাতী আকারের যে কোনো প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে।

বাংলাদেশের সাপের উপরে এ পর্যন্ত বাংলায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ছিলেন অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন। বাংলা একাডেমীর বিজ্ঞান পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "বাংলাদেশের বন্যজন্তু সম্পদ ও তার সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রবন্ধের "সাপ" অংশে তিনি এদেশে ১৭ প্রজাতির বিষধর সাপ পাওয়া যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত আমার বই "চেকলিস্ট ওয়াইল্ডলাইফ অফ বাংলাদেশ" নামক গ্রন্থে আমি যে ৭৯ প্রজাতির কথা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে ২৭টি বিষধর রয়েছে।

বাংলাদেশের বিষধর সাপের মধ্যে ১২টি প্রজাতি বাস করে সমুদ্রে। এদের দুটি সৈকতে বা সৈকতের কাছের জলসীমায় থাকতে পারে। সামুদ্রিক এই প্রজাতিগুলিকে আমরা বিষধরদের দল থেকে আপাতত বাদ দিতে পারি। প্রথমত এরা ডাঙ্গায় চলতে একেবারেই অনভ্যস্ত। সমুদ্রে মাছধরা জেলেদেরকে সাধারণত পানিতে নেমে মাছ ধরতে বা জাল ফেলতে হয় না। কাজেই মানুষের সাথে এসব সাপের শারীরিক যোগাযোগ অত্যন্ত কম। সেটা হয় কেবল জেলেরা যখন জাল থেকে মাছ ছাড়ায় নৌকায় বা ট্রলারে। বায়ু-মণ্ডলে সামুদ্রিক সাপের স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা লোপ পায় বলে আমার বিশ্বাস। ফলে নৌকায় পড়া সাপ কামড়াবে সে ধারাণাও যুক্তিযুক্ত নয়। উপরন্তু জেলেরা খুব আলতো করে এদের নাড়াচাড়া করে। ফলে এসব সাপের মেজাজ চড়ে যাবার সম্ভাবনাও কম।

এদেশের সামুদ্রিক সাপে কাউকে কেটেছে, ওদের কামড়ে কেউ প্রাণ হারিয়েছে এমন নজির আমার জানা নেই। আমি নিজে সোনাদিয়া, মহেশখালি, কক্সবাজার বা সেন্টমার্টিনস দ্বীপের জেলেদের কাছে থেকেও তেমন খবর পাই নি। কোনো জেলে বলেনি সে অন্য কাউকে কামড়াতে দেখেছে।

সবুজ বোরা সাপ (পি টভাইপার) নামে আরো পাঁচ প্রজাতির বিষধর সাপ সুন্দরবনসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘন বনে এবং চা বাগান ও পাহাড়ি অঞ্চলের বাঁশের

ঝাড়ে এবং স্যাঁতস্যাঁতে বাগানে, ঝর্ণার ধারে পাওয়া যায়। সাধারণত এদের কামড়েও লোক মরে না। দু'প্রজাতির **প্রবাল সাপ** (কোরাল স্নেক) বা **পাত্মর সাপের** বেলায় একই কথা খাটে। এসব সাপকে সচরাচর মানুষ কামড়াবার মতন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয় না বলেই আমার ধারণা। উপরন্তু এদের কেউই জনবসতির আশেপাশে বাস করে না। তাই মানুষের সাথে এসবের সংঘর্ষ বাঁধার সুযোগ অল্প।

যেসব প্রজাতির বিষধর সাপ জুৎসই কামড় মারলে মানুষ মারা যেতে পারে সেগুলি হলো পাঁচ প্রজাতির **কেউটে** (ক্রেইট), গোখরা (কোবর), **রাজ গোখরা** বা **শঙ্খচূড়** (কিং কোবরা) এবং চন্দ্রবোরা। পাঁচ প্রজাতির কেউটের মধ্যে **সাধারণ কেউটে** বা **কাল কেউটে** (কমন ক্রেইট) মানুষের গবাদি পশুর পর্যাপ্ত ক্ষতি করে। **শাকিনী** (বেণ্ডেড ক্রেইট) সাধারণত লোকজনকে কামড়ায় না। তবে কাউকে কামড়ালে তার মৃত্যু হতে পারে। বাকি তিন প্রজাতির কেউটে দেশে এত বিরল যে তাদের সংস্পর্শে মানুষ যাবার প্রশ্নই উঠে না।

তাহলে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে পাওয়া যাওয়া প্রজাতির সাপের মধ্যে কেবল চারটি প্রজাতি যথা কালকেউটে, গোখরা, শঙ্খচূড় এবং চন্দ্রবোরা কামড়ালে এবং যথেষ্ট পরিমাণ (ফ্যাটাল ডোজ) বিষ সেই সাপে কাটা রোগীর দেহে প্রবেশ করিয়ে থাকলে তবেই না সাপে কাটা লোকের মৃত্যু হতে পারে। কাজেই বিষধর সাপে কামড়ালেই সে লোক মারা যাবে এ ধারণাটিও সত্য নয়।

বাংলাদেশী বিষধর সাপ

কেবল এক প্রজাতির কাছিম বাদে, এদেশে যে প্রায় ৮৫০ প্রজাতির উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী অর্থাৎ বন্যপ্রাণীর প্রজাতি আছে তাদের কেউ শতকরা একশ ভাগ বাংলাদেশী প্রাণী নয়। কারণ এরা এদেশে স্থানিক বা এনডেমিক (Endemic) নয়। ফলে এসব বন্যপ্রাণী বাংলাদেশেসহ ভারতবর্ষের যে কোনো অঞ্চলে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বা তার বাইরের অন্যদেশেও পাওয়া যেতে পারে। তবুও আমাদের ভূ-সীমানায় দেখা যাওয়া প্রাণীদেরকে বাংলাদেশী প্রাণী বলতে কোনো আপত্তি নেই।

দুটি গোত্রের চারটি উপগোত্রে মোট ২৭টি প্রজাতি আছে। এ সংখ্যা আরো বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা হবে সামুদ্রিক সাপ এবং সবুজ বোরা সাপদের বেলায়। অনুসন্ধান ব্যাপক হলে এদের নূতন নূতন প্রজাতির উপস্থিতি প্রমাণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

গোত্র ইলাপিডীতে (Elapidae) বিষধর কেউটে, প্রবাল, গোখরা এবং সামুদ্রিক সাপ রয়েছে। কোন কোন সরীসৃপ বিজ্ঞানী এ গোত্রকে ভেঙ্গে দুটি আলাদা গোত্র ইলাপিডী এবং হাইড্রোফিডী (Hydrophidae) করেছেন। তবে বেশির ভাগ বিজ্ঞানী একটি গোত্রের অধীন দুটি উপগোত্র ইলাপিনী এবং হাইড্রোফিনী (Elapinae ও Hydrophinae) আছে বলে ধরে নিয়েছেন। প্রত্যেক প্রজাতির উপরের চোয়ালের সামনের দিকে একজোড়া স্থায়ী (ফিক্সড) বিষ দাঁত দুটি উপগোত্রকে একত্রিত করতে সাহায্য করেছে। সকল সামুদ্রিক বিষধর সাপ দ্বিতীয় উপগোত্রে পড়ে। এদের ১২টি প্রজাতিবাদ দিয়ে এ গোত্রের বাকি ৯টি প্রজাতি ইলাপিনীর অন্তর্গত।

যে যে চরিত্র থাকলে একটি সাপকে ইলাপিডীর অধীনে বলে ধরে নেয়া যাবে তা এমন হবে। ইলাপিডীর সকল প্রজাতির উপরের চোয়ালের অগ্রভাগের প্রথম দুটি দাঁতই হলো বিষদাঁত। দাঁতগুলি স্থায়ীভাবে চোয়ালে বসান। এমনভাবে খাড়া যে মনে হবে, ওগুলি সদাই ছোবল দেবার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। বিষথলির সরু নালী বা অগ্রভাগ বিষ দাঁতের গোড়ার উপরের অংশে মিশেছে। বিষদাঁতের ভিতরের পিঠের (ইনার সাইড) দু'পাশ ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠে একপাশ অন্য পাশের সাথে জোড়া লেগে দাঁতের গোড়া থেকে প্রায় আগা পর্যন্ত একটি অতি সরু গলিপথের মতো তৈরি করেছে। দাঁতের ভিতরের পিঠ ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে গলিপথের উপরের দিকে যেন দুপাশ থেকে দুটি পার এসে মিশেছে। এই গলিপথ সর্বতোভাবে ইনজেকশন সিরিঞ্জের ভিতরে গলিপথের মতন নয়। বিষথলির নালী এই গলিপথের শুরুর সাথে সংযুক্ত। বিষদাঁতের পিছনে আরো অনেক দাঁত থাকে। লেজ রশির মতো গোলাকৃতির। কেবল সামুদ্রিক সাপের লেজ দুপাশ থেকে চেপে চিতল মাছের মতো চ্যাপ্টা হয়ে হালের কাজ করছে।

এদের অক্ষিগোলক গোলাকৃতির এবং লোরিয়াল বা চক্ষু আঁইশ নেই। উপরের চোয়ালে, বিষদাঁতের পিছনের পর পর দু-তিনজোড়া সাধারণ দাঁতের ভিতর পিঠে খাদের মতো থাকে। কোনো কারণে বিষদাঁত ভেঙ্গে গেলে এসব দাঁতের প্রথম জোড়ার সাথে বিষ নালী যুক্ত হতে পারে। সাপুড়েদের কাছে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা নেই। কাজেই কেউটে বা গোখরার বিষদাঁত ভেঙ্গেই তারা মনে করে ওসব আর তাদেরকে কামড়াতে পারবে না। কিন্তু সাধারণ দাঁতের প্রথম জোড়ার গোড়ায় বিষ নালীযুক্ত সাপে কাটলে সাপুড়ে বা বেদিনীরা মারা যায়। সেজন্যই ওরা বলে সাপুরে, ওঝা এবং সাপের খেলা দেখানো বেদের মৃত্যু সাপের কামড়েই হবে।

ইলাপিনী সাপের পেটের পাথালি আঁইশ দেহের এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য অবিষধর বহু সাপের তা থাকতে পারে। কেবল তেমনটি নয় দুপ্রজাতি বাদে বাকি হাইড্রোফিনসদের।

ইলাপিনী উপবর্গে এদেশী প্রজাতি : **ওয়ালের কেউটে** বা ওয়ালস ক্রেইট *(Bungarus sindanus walli)* **ছোট কালো কেউটে** বা লেসার ব্লাক ক্রেইট *(B. lividus)*, **কালো কেউটে** বা ব্লাক ক্রেইট *(B. niger)*, **কাল কেউটে** বা কমন ক্রেইট *(B. caeruleus)*, শাঁকিনী বা বান্ডেড ক্রেইট *(B. fasciatus)* **সরু প্রবাল সাপ** বা স্লেনডার কোরাল স্নেক *(Calliophis melanurus)* গোখরা বা কোবরা *(Naja naja)* এবং **শঙ্খচূড় বা কিং কোব্‌রা** *(Ophiophagus hannah)*।

Das (1994) এর মতে *Naja naja naja* এবং *N. n. Kaouthia* একই প্রজাতির দুটি উপপ্রজাতি নয় বরং আলাদা প্রজাতি। অর্থাৎ *Naja Naja* একটি। *Naja kaouthia* অন্যটি।

কেউটের পাঁচ প্রজাতির মধ্যে বান্ গেরাস ওয়ালী এবং নাইজার-এর প্রক্রিয়াজাত চামড়া ঢাকার নামী-দামী মনোহরী কাম চামড়ার দোকানে বিক্রি হতে দেখেছে রমুলাস এবং আমি নিজে। বন্ধুবর রমুলাস হুইটেকার মাদ্রাজ স্নেক পার্ক এবং মাদ্রাজ কুমীর খামারের

ডাইরেক্টর এবং কমন ইণ্ডিয়ান স্নেকস নামক বইয়ের লেখক। তিনি দু'দুবার বাংলাদেশে এসেছেন। তার স্নেক পার্কে আমার বহু সময় কেটেছে। আর রমুলাসের কেটেছে আমার বাসা, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে। আমরা দুজনে সরীসৃপের উপর যৌথ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিখেছি। এ প্রবন্ধের অনেক অংশে রুমুলাসের সাহায্য রয়েছে যথাস্থানে তা বলা হবে।

ফোনা অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সিরিজের দ্বিতীয় সংস্করণের সরীসৃপ খণ্ডের রচয়িতা প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ম্যালকম এ. স্মীথ রংপুর অঞ্চল থেকে বানগেরাস লিভিডাস সংগ্রহের খবর দিয়েছে। আমি নিজে এখনো এদের নমুনা দেখিনি। অন্য কেউ এ পর্যন্ত এদের নমুনা সংগ্রহে সমর্থ হননি।

কালকেউটে *(Bungarus caeruleus)*

কালকেউটে বা কাল সাপ বাংলাদেশের জনগণের জন্য সবচেয়ে ভয়ানক প্রাণী। এটি ধোড়া সাপের চেয়ে সরু। কিছুটা মেটে রঙের। চেহারা কোনো কারণেই নজরে পড়ার মতো নয়। এ সাপই যে আমাদের এত ক্ষতি করতে পারে তা না-জানার জন্যই এরা অবাধে বিচরণ করছে। সেই সাথে প্রাণী সংহার করছে (চিত্র : ৩.৩৮)।

একটি কাল কেউটে সর্বাধিক ১৭৫০ মিলিমিটার (মিমি) লম্বা। সচরাচর যা নজরে পড়ে তা প্রায় ১০০০ মিমি লম্বা। কেউটের মাথাটা ঘাড়ের চেয়ে কিছু মোটা। গা মসৃণ। চিক চিক করে। নীলাভ কালো বা কালো রঙের শরীর। অস্পষ্ট হলেও কতকগুলি অর্ধ চন্দ্রাকৃতির সাদা বলয় আছে। এ বলয়গুলি শুরু হয়েছে ঘাড়ের কিছুটা দূর থেকে। তা চলে লেজ অবধি। বলয়গুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। সংখ্যা ২০ থেকে ২৪ জোড়া প্রায়। শরীরের সামনের দিকে বলয়গুলি ভেঙ্গে সাদা চিতির জন্ম দেয়। দূর থেকে এই চিতির সমষ্টি বলয় বলে মনে হতে পারে। কেউটের মাথার উপর বড় বড় বর্ম (শিল্ড) থাকে। পিঠের মাঝখানের আঁশের সারি অন্যদের চেয়ে বড়। পেটের পাথালি আঁইশ কম করে হলেও প্রস্থের চেয়ে দ্বিগুণ। লেজের নিচের পাথালি আঁইশ অখণ্ডিত। এক সারিতে সাজান। পিঠে আঁইশের সারি এক পাশ থেকে অন্যপাশ পর্যন্ত ১৫ বা ১৭, পেটের পাথালি আঁইশ ১৯৪ থেকে ২৩৪, লেজের নিচ ৪২ থেকে ৫২টি সারি। চোখ খুব ছোট। গাঢ় রঙের। মণি প্রায় দেখাই যায় না।

হোসেনের প্রবন্ধে কাল কেউটের কোনো উল্লেখ নেই। আমার গবেষণা-ছাত্র এম. এ. *মুস্তাকিম এবং আমি এ সাপের নমুনা সংগ্রহ করি*। প্রথম নমুনাটি দেন পাদ্রি ইউজিন হমরিখ, ১৯৭৮ সালে। সত্তর দর্শকের গোড়ার দিকে ঢাকার নটরডেম কলেজের ফাদার টীম এ সাপের নমুনা সংগ্রহ করে সে কলেজের যাদুঘরে রাখেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি কোনো নিবন্ধ প্রকাশ করেন নি। ফাদার হমরিখ বাংলার চেয়ে গারো ভাষা এবং গারোদের রীতি-নীতি অনেক বেশি রপ্ত করেছেন। প্রায় ১৯৬২ সাল থেকে মধুপুর সার্শা অরণ্যের বাইরে প্রতিষ্ঠিত জলছত্র মিশনে আছেন। তার সকল মিশন সম্পন্ন করার সাথে সাথে তিনি সেখানে বাষট্টি উত্তর সময়ের বন্যপ্রাণীদের খবরাখবরের জন্য একটি জীবন্ত অভিধান। কেউটে, গোখরা এবং গুইসাপ (সাপ নয়) তার প্রিয় খাবার। মধুপুর ছাড়া

কেউটের নমুনা প্রায় সারা দেশেই দেখেছি। সবচেয়ে লম্বা নমুনাটি নেত্রকোনা কলেজের যাদুঘরে দেখেছিলাম।

দেশে গ্রামে কেউটে থাকার সবচেয়ে পছন্দসই জায়গা ইটের পাঁজা, টালির গাদা (যশোরে), পুরান ভাঙ্গা বাড়ি বা দালানের ফোকর ; কাঠের পাঁজা, ইঁদুরের গর্ত এবং উইয়ের ঢিবি। কেউটে দিনে বিশ্রাম নেয়। রাতে কর্মচঞ্চল হয় ও খবার খায়। দিনে ইঁদুরের গর্ত তাদের বিশ্রামের উৎকৃষ্টতম ও নিরাপদ জায়গা। বসতবাড়ি-খেত-খামারের আশ-পাশ এবং সমভূমি অঞ্চল এদের খুব পছন্দ। পাহাড়ি এলাকা এড়িয়ে চলে।

কেউটের প্রিয় খাবার ইঁদুর, সরীসৃপ এবং নিজ প্রজাতিসহ অপরাপর সাপ। এদের দাঁত ছোট কিন্তু বুলডগের মতন কামড়ে ধরে থাকতে পারে। অত্যন্ত দ্রুত আঘাত হানার ক্ষমতা রাখে কেউটে। রাতে বিষধর সাপে কাটা রোগীর প্রায় শতকরা আশিভাগ ছোবল আসে কেউটের কাছ থেকে। নিশাচর হবার জন্য গ্রামের লোকের চোখ এড়ানো খুব সহজ। এদের বিষক্রিয়া দেহে এত সুনিপুণভাবে কাজ করে যে রোগী আলগোছে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কেউটের বিষ স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে সমস্ত দেহ অবশ্য করে ফেলে।

বর্ষাকাল কেউটের প্রজননের মৌসুম। স্ত্রী ৮ থেকে ১২টি ডিম পাড়ে এবং ডিমের যত্ন নেয়। জুলাই আগস্টে বাচ্চা ফোটে। বাচ্চাগুলির গায়ে বলয়গুলি হয় সম্পূর্ণ।

শাকিনী সাপ (*Bungarus fasciatus*)

শাকিনী শংখিনী বা দুমুখো সাপ (অবিষাক্ত দুমুখো সাপ দেখতে প্রায় কেঁচোর মতন) কেউটের দলের দ্বিতীয় প্রজাতির যা প্রায় দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। অবশ্য এদেরকে কেউ কিন্তু কেউটে বলে না। উপকূলবর্তী দ্বীপ থেকে উত্তরের তেতুঁলিয়া পর্যন্ত যে কোনো সমভূমি, পাহাড় বা বনে পাওয়া যেতে পারে শাকিনী সাপ। দেশের সুন্দরতম সাপের অন্যতম হচ্ছে শাকিনী সাপ (চিত্র : ৩.৩৯)।

একটি শাকিনী সচরাচর ১৫০০ মিমি এবং সর্বাধিক ২২৫০ মিমি হয়। এদের দেহের কালো-হলুদ-কালো বলয় বেশ মোটা, স্পষ্ট এবং দৃষ্টআকর্ষী। আমাদের দেশী অন্য কোনো সাপে এই বলয় এমনভাবে নেই। এদের বাহারি রঙের কারণেই এরা সর্বত্র পরিচিত।

অন্যসব সাপের চেয়ে শাকিনীর লেজ কিছুটা ভোঁতা। অপেক্ষাকৃত মোটা। মনে হবে কেউ যেন লেজের আগাটিকে কেটে ভোঁতা করে দিয়েছে। সাপের যারা খেলা দেখায় তারা এই ভোঁতা লেজের আগার উপর চোখ আঁকে। সিঁদুরের ফোটা দিয়ে মাথা বানায়। তারা লোকজনকে বোঝায় ওটাই দুমুখো সাপের দ্বিতীয় মাথা। আসলে শাকিনীর মুখ একটি। তা অন্য হাজারটা প্রাণীর মতো মাথার সাথে যুক্ত, লেজের সাথে নয়।

শাকিনী আমাদের দেশী-একমাত্র সাপ যার পিঠ খুবই খাড়া, টিনের ঘরের টুইয়ের মতন। এরা কেউটের মতন নিশাচর। পানির নিকটবর্তী ইঁদুরের গর্ত, উইয়ের ঢিবি, ইটের গাদা এদের পছন্দ। দিনে কদাচ বেরিয়ে পরলে এদের বাহারি রঙ লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে না। এদের মৃত্যু তখন অনিবার্য।

শাকিনী, দিনের বেলায় মেচি বিড়ালটি ; যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু রাতে এরা অত্যন্ত কর্মতৎপর। চলতে পারে অত্যন্ত দ্রুত। সামনে পড়া যে কোনো সাপ (শঙ্খচূড় বাদে), প্রাণভয়ে পালায়। ইঁদুর শাকিনীর ছোবল এড়াতে পারবে না। খাবার হিসেবে চলে যাবে শাকিনীর পাকস্থলীতে। শাকিনী কাল কেউটে এবং গোখরা হজম করতে অভ্যস্ত। নোয়াখালির বন্ধু ড. যোসেফ বলেছে সে তাদের পুকুরে এদেরকে মাছ খেতে দেখেছে।

শাকিনী বর্ষায় ডিম দেয় ও বাচ্চা তোলে। মা প্রায় ১৫টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটতে সময় লাগে দুমাসের উপর। মা ডিমের যত্ন নেয়।

শাকিনীর চামড়ার খুব কদর। বাজারের চামড়ার দোকানগুলোতে এদের চামড়ার বহু সামগ্রী বিক্রি হয়। মহিলাদের ব্যাগ ও বেল্ট অন্যতম। বিদেশের বাজারেও এ চামড়ার খুব চাহিদা।

বেচারা শাকিনীর মেজাজ খুব শান্ত। এই একমাত্র বিষধর প্রজাতি যার দাঁত না ফেলে সাপুড়ে সম্প্রদায় খেলা দেখাতে সাহস করে। অধ্যাপক হোসেনের সাথে 'বিষধর সাপের দাঁত' বিষয়ে গবেষণা–ছাত্র রাগিবউদ্দিন পর্যন্ত তার ঘরে দাঁতওয়ালা শকিনী রাখত মাঝে মধ্যে। বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশের কোনো এলাকায় এদের কামড় ঠেকানোর জন্য এন্টিভেনম সিরাম তৈরি হয় না। কারণ এরা সহজে কামড়ায় না। তাই লোকও মারা যায় না। তবে শাকিনী রেগে গেলে, ভয় পেলে এবং কোণঠাসা হলে অথবা অন্ধকারে ওদের ঘাড়ে পা দিলে কামড়ে দেবে। সেক্ষেত্রে রোগী মারা যেতে পারে। ভয়ের কারণ নেই। ব্যাঙ্ককের রানি সাওভারা ইনসটিটিউটে এদের এন্টিভেনম পাওয়া যাবে।

প্রবাল সাপ *(Callophis melanurus)*

প্রবাল, পাত্মর বা কোরাল স্নেক। এদের একটি নমুনা আমার নিজ হাতে সংগ্রহের সুযোগ হয়েছিল। তবে তা খুব সামান্য সময় আমার কাছে ছিল (চিত্র : ৩.৪০)।

সেটা ১৯৭৮ এর মে মাসের কথা। চট্টগ্রামের তখনকার ডি এফ ও শাহ আলী ইমাম সাহেব ছাত্রসহ আমাকে ডেকেছিলেন সীতাকুণ্ডের অদূরে বারিয়াঢালা ফরেস্ট রেঞ্জের বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। বন্যপ্রাণীর তিনজন ছাত্র এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাবসা প্রশাসনে প্রথম বর্ষের একজন ছাত্র আমার সাথে যেতে চায় ও যায়।

সেদিন মুসলধারে বৃষ্টি হয়। প্রথম দফা ভিজে বারিয়াঢালার দক্ষিণে বাংলাদেশের জন্য **একটি নতুন প্রাণী রেকর্ড করি। সেটি কাকড়াভুক বেজী বা ক্রাবইটিং মনগোজ।** বেলা ১১টা নাগাদ ঝড় ও বৃষ্টি মাথায় করে প্রায় ৮/১০ মাইল পথ পেরিয়ে হাজারিখিল পৌঁছলাম। হাজারিখিলের বনবিশ্রামাগারটি পাহাড়ের উপর। পাশ দিয়ে রাস্তা নেমে গেছে। খাড়া রাস্তায় অনেক কাদা পানি জমেছিল। নামতেই পিছলে গিয়ে ছিটকে পড়লাম কয়েক মিটার দূরে। পচা পাতাসহ কিছু কাদা সরে গেল। হঠাৎ বেরিয়ে এল হাত খানেক লম্বা একটি ছোট্ট সাপ রমুলাসের কাছ থেকে শেখা স্বভাব অনুযায়ী ছোট্ট একটি ডাল যোগাড় করলাম। সেটা দিয়ে সাপের মাথাটা মাটিতে চেপে ধরে ওর মাথাটা আলগোছে আমার হাতে নিয়ে নিলাম।

সাপের মাথা ধরে তুলতেই সে এক অবাক কাণ্ড করে বসল। লেজের আগাটা কুণ্ডলীর মতো করল। অবাক হলাম ওর কাণ্ড দেখে। সমভূমিতে এনে পরিষ্কার বালির উপর ছেড়ে যতবার ছবি তুলতে যাচ্ছি ততবারই সে লেজ গুলিয়ে মাটি থেকে সামনের ক্যামেরার দিকে ধরছে (ছবি দেখুন)। আবছা আলোয় ছবি তোলার পর ওটাকে উঁচু করে তুলে দিলাম ছাত্রদের পানির প্লাস্টিক বোতলে। ওটাই তখন ধারে কাছে ছিল কিনা তাই। এখানেই হলো ভুল।

আরো অনেক সংগৃহীত প্রজাতিসহ বোতলটি অন্যান্য মালপত্রের সাথে ছাত্ররা যখন হাজারিখিল থেকে বারিয়াঢালা নিয়ে যাচ্ছিল তখন প্যাঁচ কেটে বোতলটি সবার অজান্তে পড়ে যায়। হারিয়ে যায় মূল্যবান প্রবাল সাপ। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে ছবি এসেছিল। ওটাই এখন দলিল।

ছবি দেখে মনে হয় প্রজাতিটি সরু প্রবাল সাপ বা স্লেনডার কোরাল স্নেক। বাংলাদেশে এ সাপ পাওয়া যাওয়ার রেকর্ড এই প্রথম।

আমাদের দেশের অনেক প্রাণিবিজ্ঞানীর ধারণা ছিল প্রবাল সাপ সমুদ্র তীরে প্রবাল পাথরের মাঝে বাস করে। অতএব সেন্টমার্টিনস দ্বীপে পাওয়া যাবে। সে ধারণা একেবারেই অমূলক। বনাঞ্চল এদেশে প্রবাল সাপের আবাসভূমি। চিরসবুজ বনের মেঝের মরা লতাপাতা এদের সুন্দর পরিবেশ। তবে সে পরিবেশ যে হারে ধ্বংস হচ্ছে তাতে করে প্রবাল সাপের বাঁচার আশা কম।

প্রবাল সাপের মাথা বেশ ভোঁতা। মাথা থেকে লেজের ঘের খুব কমে না। মাথাটি কালো। ঘাড়ও কালো। মাথার উপর দুটি হলুদ ফোটা অত্যন্ত স্পষ্ট। এদের পেটের রঙ সিঁদুরে লাল। মাদার গাছের ফুলের লালচে রঙের মতন। ইংরেজিতে এই রঙকে কোরাল (Coral) বলা হয়। সেজন্য মাদার গাছের নাম "কোরাল ট্রি"। একই রঙের অধিকারী হওয়ার দরুন প্রবাল সাপের ইংরেজি নাম "কোরাল স্নেক", প্রবাল পাথরে বাস করার জন্য নয়।

লেজের নিচের দিক নীলাভ। লেজের কুণ্ডলী পাকানোর সময় লাল এবং নীলের সমাহার ঘটে। এটা এক ধরনের দৃষ্টি ফেরার প্রদর্শনী' বা ডিসট্রাকশন ডিসপ্লের অংশ। অর্থাৎ কুণ্ডলীর দিকে সবার দৃষ্টি যাবে। মাথার দিকটা খেয়ালই হবে না। এই সুযোগে শত্রুর কাছ থেকে সে দেবে ছুট। অথবা মাথার দিক দিয়ে চলে যাওয়া খাদ্যবস্তু ধরে খাবে। ব্যবস্থাটি অভিনব বলতে হবে।

প্রবাল সাপ ২০০ থেকে ২৫০ মিমি লম্বা হয়। এরা বালু বা নরম মাটি এবং পাতার নিচে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। খায় পাতায় বাস করা পোকা এবং কেঁচোর মতন দেখতে দুমুখো সাপ। এদের কামড় এবং বিষক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য নেই।

গোখরা *(Naja naja)*

গোখরা, গো-ক্ষুরা বা ইণ্ডিয়ান কোবরা বাংলাদেশের সবচেয়ে ধিক্কৃত সাপ। কোথাও কোথাও এদেরকে হাতি সাপ বা পানস সাপও বলা হয়। আমরা আমাদের জীবনে কি দেখি? যত গর্জে তত বর্ষে না। মতি-গতি ঠিক নেই এমন চরিত্রের লোকজন অন্যের

জন্য বেশি ক্ষতিকর হয়। কারণ এরা হীনতম কাজ অতি নীরবে এবং প্রায় হাসতে হাসতেই করে ফেলতে পারে। এমন চরিত্র কাল কেউটে সাপের। কিন্তু যত দোষ নন্দ ঘোষ হলো আমাদের গর্জনকারী সাপ গোখরার। এদের ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ এবং উন্নত ও প্রশস্ত ফণা এদের কপালে এনে দিয়েছে অনেক লাঞ্ছনা। সেজন্য দেখামাত্র মারা চাই সব গোখরাকে। শতে শতে মারা পড়ছে গোখরা (চিত্র : ৩.৪১ ও ৩.৪২)।

আমাদের সব প্রজাতির সাপের মধ্যে গোখরার ফণা সবচেয়ে প্রশস্ত। শঙ্খচূড়ের ফণা তার লম্বা দেহের তুলনায় চাপা বা ছোট। ফণা দুটি দৃষ্টি আকর্ষি। এ ছাড়াও ফণার উপর চশমাকৃতির দুটি কালো বলয় থাকে। এই যুগল বলয় আবার দুটি লেজ দিয়ে নিচের দিকে এমনভাবে যুক্ত যে ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরটিকে তা হার মানায়। কোনো কোনো গোখরায় দুটি বলয়ের পরিবর্তে কেবল একটি বড় বলয় ফণার উপর থাকতে পারে। এই বলয়ের মাঝখানটা কালোর ছোপযুক্ত।

অপরাপর চরিত্রের সাথে মিলে যেসব গোখরার ফণার উপর দুটি বলয় থাকে তারা গোখরার প্রজাতি নাজা নাজা *(Naja naja)* প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। যাদের ফণার উপর একটি বলয় তাদেরকে বলে নাজা কাউথিয়া *(N. kaouthia)* প্রজাতি।

কেবল নাজা প্রজাতিটি মুস্তাকিম, রমুলাস এবং আমি নিজে সংগ্রহ করেছি ও ছবি তুলেছি। দক্ষিণ বঙ্গে এই প্রজাতি বেশ পাওয়া যায়। সুন্দরবন এলাকায় ও বরিশালে সর্বাধিক দেখেছি এদেরকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্তর এবং কুষ্টিয়া জেলাতেও এদের নমুনা পাওয়া গেছে। কাউথিয়া প্রজাতিটি ঢাকাসহ মধ্য ও পূর্বাঞ্চলীয় অংশে বেশি দেখা যায়। এদের দুটিকেই দেশের যে কোনো অঞ্চলে খোঁজ করা যেতে পারে। এই দুটি প্রজাতির কোনো কোনো নমুনায় 'মার্কা' নাও থাকতে পারে। গোখরার সাধারণ রঙ হাল্কা বাদামি থেকে পরিবর্তিত হয়ে কালচে পর্যন্ত হতে পারে। এলাকা, মৌসুম এবং খোলস এড়ার উপর নির্ভর করবে শরীরের রঙ।

নাজা প্রজাতির সদস্যকে চশমা পরা খড়ম পাইয়া ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। গো-ক্ষুরা বা খড়ম পাইয়া নামের স্বার্থকতা তখনই হবে যখন ফণায় ঐ ধরনের গরুর পায়ের ক্ষুরাকৃতি বা বৈলওয়ালা খড়মের সামনের নিচদিকে যে উল্টো ইউ আকৃতির কাঠ থাকে তার মতো ছাপ থাকবে। বাংলাদেশে অমন চশমা-র মতো মার্কাযুক্ত সাপ আছে বলেই না গো-ক্ষুরা নামের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করেন মহাদেব তাঁর বৈলওয়ালা খড়ম পায়ে গোখরার মাথায় পাড়া দিয়েছিলেন। তাই মাথাটা চ্যাপ্টা হয়ে ফণা এবং খড়মের ছাপ বুকে নিয়ে সে ফণায় চশমার মতো মার্কার সৃষ্টি হয়েছে। তাই কি?

ঢাকা জেলার ধামরাই এবং টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানা অঞ্চল এই চশমাপরা গোখরাকে বলতে শুনেছি খৈয়া-গোখরা। এই গোখরা লোকজনের ঘরবাড়ি ও গোলাঘরের কাছাকাছি থাকতে বেশি পছন্দ করে। অন্য প্রজাতিটি পানির কাছের উঁচুস্থানে থাকতে ভালোবাসে। স্বাভাবিক কারণে প্রথমটির প্রধান খাবার ইঁদুর ও তারপর ব্যাঙ, মাছ। তবে সব গোখরার প্রধান খাবার ইঁদুর তারপর ব্যাঙ, অন্য সাপসহ সরীসৃপ, পাখি এবং মাছ। ইঁদুরের গর্তসহ অন্য যে কোনো গর্ত গোখরার ডিম পাড়ার এবং তা পাহারা দেবার উৎকৃষ্ট জায়গা। মা-বাবা মিলে ডিম পাহারা দিতে পারে।

গোখরা অন্যদের চেয়ে একটু চড়া মেজাজের তাই হয়েছে ওদের কাল। গোখরা দিনের প্রখর আলোতে ভালো দেখতে পায় না। ওদের চলাফেরা এবং খাওয়া–দাওয়ার পালা চলে গো–ধূলিতে এবং কাক ডাকা ভোরে। গ্রামের মানুষের জন্য এটাই হয়েছে অমঙ্গলের কারণ। তারা তাদের বেশির ভাগ কাজ সারে দিনের ও রাতের শুরুতে। অতএব বেশি মোলাকাত হয় গোখরার সাথে।

হাঁস–মুরগির খোপে, গোশালা এবং গোলাঘরের, মেঝেতে ঘুমান লোকজনকে গোখরায় কাটে বেশি। ভোররাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া, ফরজ গোসল ও ওজু করতে পুকুর ধারে এবং জমি চাষে যাবার সময় আবছা আলোতে গোখরার কামড় খাবার সম্ভাবনা প্রচুর। সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা চাষী মাঠ থেকে ফেরার পথে ও অপরাপর হাটুরে লোক গোখরার ছোবলে পড়তে পারে। বর্ষার সময় মাঠ–ঘাট ডুবে যায়। তখন খাদ্য–প্রাণী ইঁদুরের সাথে সাথে সাপ গিয়ে উঠে গাছে, বসত বাড়িতে এবং একমাত্র উঁচু ভূমি সরকারি মহাসড়কের পাশে। এখানেও মানুষ কাটার সম্ভাবনা যথেষ্ট। শীতের প্রারম্ভে ঝরে পড়া ধান কুড়াবার জন্য ছোট ছেলেমেয়েরা হাত ঢুকিয়ে দেয় ইঁদুরের গর্তে। গোখরা মারে ছোবল। বাঁশ ঝাড়ে বাঁশ কাটতে গিয়ে বা ভাঙ্গা দালানের ইট কাঠ সরাতে গিয়েও লোকজন এ সাপের কামড় খেতে পারে।

গোখরা সর্বাধিক দু'মিটারের একটু উপর বা ৭ ফুট লম্বা হয়। আমি এ পর্যন্ত প্রায় ৫ ফুট লম্বা নমুনা সংগ্রহ করেছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাবলাখালির একজন চাকমা তার নৌকার বৈঠা দিয়ে কাউথিয়া প্রজাতির সাপটিকে আঘাত করে। সে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল তাদের বিনু উৎসবের দিনে মহাউৎসবে খাবার জন্য। আমি মাছের সাথে সাথে ঐ সাপটিও তার কাছ থেকে কিনেছিলাম।

গোখরা ছোবল মারে কেবল ভয় পেলে। কোনঠাসা হয়ে পড়লে, আত্মরক্ষার জন্য এবং খাদ্যপ্রাণী পাকড়াও করার সময়। একটি ভীত বা কোনঠাসা হয়ে পড়া গোখরার প্রথম কাজ ফণা তুলে ফণার উপরের চোখাকৃতি চিহ্ন দিয়ে ভয় দেখান। কিছু না হলে বিকল্প হিসেবে ফোঁস ফোঁস শব্দ করবে। এজন্য গলা থেকে খুব জোরে বাতাস ঠেলে দেয়া হয় মুখ দিয়ে যা হিস্ হিস্ শব্দ সৃষ্টি করে। ফোঁস্ ফোঁস্ কাজ না হলে গোখরা আঘাত করবে। মারবে ছোবল। সম্ভবত খৈয়া গোখরা ফোঁস্ ফোঁস্ করে বেশি। অন্যটা কম।

রাতে ঘুমিয়ে থাকা কোনো লোক যখন ঘুমের ঘোরে হাত পা নাড়ে তখন সেখানে কোনো গোখরা উপস্থিত থাকলে সে তৎক্ষণাৎ চলমান হাত পায়ের উপর আঘাত হেনে দেবে। দিনের গোখরা এবং রাতের গোখরাতে তফাৎ অনেক। দিনের বেলা কম দেখতে পাওয়ার ফলে গোখরা কোথায় ছোবল মারছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না। তাই ওরা সচরাচর মুখ বন্ধ করেই ছোবল মারে। কিন্তু রাতের বেলা কোনো চলমান বস্তুকে কঠিনভাবে কামড়ে ধরার জন্য মুখ খুলে ছোবল মেরে দুটি বিষ দাঁতই বসিয়ে দেয়।

গোখরার বিষ মানুষের দেহে তাৎক্ষণিক বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিষের ক্রিয়ায় ফুসফুস অবস এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যাবলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কামড়ের জায়গা সাধারণত ফুলে উঠে।

আমেরিকায় গোখরার বিষ থেকে পেইন কিলার হিসেবে কোব্রাস্কিন এবং নাইলক্সিন নামে দুটি ওষুধ তৈরি হয়। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রেও গোখরার বিষ থেকে ওষুধ তৈরি হয়। ভারতের টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট পরীক্ষাগারে গোখরা বিষ থেকে গোখরার বিষ ক্রিয়া বিনাশী এন্টিভেনম ইনজেকশন তৈরি হয়।

চামড়ার ব্যবসায়ে গোখরার প্রক্রিয়াজাত চামড়ার ব্যাপক ব্যবহার আছে দেশে ও বিদেশে। ফণা তোলার দরুন এবং জনসমক্ষে রাগ ঢেলে ফোঁস ফোঁস করার জন্য বেদে ও সাপুড়ে এদের খেলা দেখিয়ে দর্শকদেরকে অভিভূত করতে পারে।

শঙ্খচূড় *(Ophiophagus hannah)*

শঙ্খচূড়, রাজগোখরা বা কিংকোবরা পৃথিবীর বৃহত্তম বিষধর সাপ। থাইল্যান্ডে শঙ্খচূড় প্রায় ৭ মিটার মানে ২২ ফুট লম্বা হয়। ভারতবর্ষে এরা ছ'মিটারের বেশি হয় না। আমাদের দেশে সচরাচর এ সাপ ৪ মিটার বা ১২–১৩ ফুট লম্বা হয়।

শঙ্খচূড় গোখরার মতো ফণা তুলতে পারলেও ফণাটি অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত। এদের ফণার উপর কোনো চশমাকৃতি বা গোলাকৃতি দাগ নেই। আছে অত্যন্ত স্পষ্ট ইংরেজি 'ভি' অক্ষরটি উল্টিয়ে দিয়ে যে আকৃতি হবে সেরূপ মোটা এবং হলুদ আড়াআড়িভাবে অবস্থিত অর্ধবলয়। এদের দেহ হলুদাভ থেকে জলপাই সবুজ। লেজ ক্রমশ সরু এবং সম্পূর্ণ কালো। মাথার পিছন দিক থেকে দেহের প্রায় পিছনভাগ পর্যন্ত বহু হলুদ বলয় রয়েছে। এগুলি পিঠ থেকে দেহের পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পেটে এ বলয় অনুপস্থিত। বলয়গুলি পিঠের অংশে চিকন, দেহ পাশে মোটা। শরীরের নিচের দিক হলুদাভ (চিত্র : ও ৪৩)।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল, সিলেট থেকে টেকনাফ, এবং সারা দেশ বাদ দিয়ে, শঙ্খচূড় পাওয়া যায় সুন্দরবনে। সারাদেশে কেবল সুন্দরবনে এদের সংখ্যা কিছুটা বেশি। তবুও অন্যসব প্রজাতির চেয়ে কম। চিরসবুজ বনে কদাচ দেখা যায়। টেকনাফের লোকেরা একে কালন্দর সাপ নামে চিনে।

শঙ্খচূড় পৃথিবীর একমাত্র সাপের প্রজাতি যার স্ত্রী সাপগুলি পচা পাতা ও ডালপালা জড় করে একটা ঢিবি মতন বানায়। ঢিবির মাঝখানে একটি কুঠুরীতে ডিম রেখে জড় করা আরো পচা পাতায় সেগুলি ঢেকে দেয়। এর উপর মা সাপ অনবরত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। যতদিন না ডিম ফুটবে ততদিন মা এভাবেই ঢিবির উপর শুয়ে থাকবে। সে সময় দু থেকে আড়াই মাস অবধি হতে পারে। বাবা সাপ কিন্তু তাঁর বউকে ছেড়ে খুব দূরে যাবে না। এরা পতি এবং স্ত্রী পরায়ণ সাপ। ফলে শঙ্খচূড়দের ডিম সহসা কেউ চুরি করতে পারে না। বাসার উপর পাহারায় রত সাপ দীর্ঘ দুমাস অভুক্ত থাকে। বর্ষাপূর্ব দিনগুলি এদের প্রজননের সময়। তখন তাদের মন মেজাজ ভালো থাকে না। এ সময়ে ধারে কাছে না মাওয়াই শ্রেয়।

প্রকৃতিতে শঙ্খচূড় হেটে বেড়াচ্ছে এমন দৃশ্য দেখা সৌভাগের বৈকি। গেল ১৯৯৪ সালের প্রথমে সুন্দরবনের কটকা এলাকায় একটা রাজগোখরা সামনা–সামনি দেখি এবং ধরি ও পরে ছেড়ে দেই। দেশী বেদেনীদের কাছে দাঁত ছাড়া শঙ্খচূড় দেখেছি বেশ। দাঁতওয়ালা শঙ্খচূড় প্রথম আমাকে দেখায় রমুলাস তার মাদ্রাস স্নেক পার্কে এবং

কোলাকাতার শিক্ষিত সাপুড়ে দীপক মিত্র। দুজনেই খেলা দেখিয়েছে শঙ্খচূড়ের। তাদের বলিহারি সাহস।

রাজ গোখরা বা শঙ্খচূড়ের একমাত্র খাবার বিষধর ও অবিষাক্ত সাপ। এদের প্রজাতির ছোট বাচ্চা খেতেও এদের কোনো দ্বিধা নেই। অন্যসব খাবারে এদের খুবই অনীহা। সাপুড়েদের কাছে এ কারণে শঙ্খচূড় টিকে না। শঙ্খচূড়ের বৈজ্ঞানিক নাম অফিওফেগার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে সাপ (অফিওস), খেকো (ফেগাস) নামটির যথেষ্ট সার্থকতা রয়েছে।

শঙ্খচূড়ের বিষ গোখরার চেয়ে কম শক্তিশালী। কিন্তু এদের বিষ থলিতে বিষের পরিমাণ অধিক। যে ৬ সিসি বিষ জমা থাকে থলিতে তা পুরো ঢেলে দিলে তিন টনের একটি হাতি মারা যেতে বেশি সময় লাগবে না। কথা হলো হাতির মোটা চামড়া ভেদ করে এদের দাঁত বসবে কিনা। শঙ্খচূড়ের কামড়ে হাতিসহ কোনো লোক মারা পড়ার সরকারি তথ্য এ অঞ্চলে নেই। তবে রমুলাস তার বইতে লিখেছে শ্লেটার নামের এক ইংরেজ সাহেব রোদ পোহাতে ব্যস্ত একটি শঙ্খচূড়ের সামনে বোকার মতন তার পা বাড়িয়ে দিয়েছিল। শঙ্খচূড় কামড়ে ছিল তার হাঁটুর উপর। পরে সে মারা যায়।

পৃথিবীর সব সাপের চেয়ে উঁচু দু'মিটার, ফণা তুলতে পারে একটি বয়স্ক শঙ্খচূড়। অত লম্বা সাপের জন্য সেটাই তো স্বাভাবিক। কেবল চামড়া রপ্তানি এবং বাজারজাতকরণের জন্য এদের নিধন করা হয়। সাপুড়ে সম্প্রদায় কদাচ এদেরকে আমাদের চিরসবুজ বনে ধরে। তারা বেশির ভাগ জ্যান্ত শঙ্খচূড় পায় ত্রিপুরা ও আসামের সাপুড়েদের কাছ থেকে।

গোখরা এবং শঙ্খচূড়দের গলার ও পাঁজরার হাড় লম্বাটে। এখানে প্রশস্ত চামড়াও আছে। সে জন্য এদের পক্ষে ফণা ছড়ান সম্ভব। তবে ডোরা এবং কলুউব্রিডী গোত্রের কিছু কিছু সাপের গলা ও ঘাড় কিছুটা চ্যাপটা এবং তা একটু ফুলতেও পারে। অবশ্য জীবদ্দশায় তা কখন রাজ গোখরার মতো প্রশস্ত হয় না।

বনে বাদাড়ে বাস করার ফলে এ উপমহাদেশে শঙ্খচূড় লোককে কামড়ায় না, বিশেষ করে ভারতে, তাই এদের জন্য কোনো এন্টিভেনম ইনজেকশন পাওয়া যায় না।

সামুদ্রিক সাপ

বাংলাদেশের সকল সামুদ্রিক বিষধর সাপ উপগোত্র হাইড্রোফিনীর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর সব সাপের মধ্যে সামুদ্রিক সাপদের বিষ সবচেয়ে শক্তিশালী। এদের বিষ গোখরার চেয়ে ৪ থেকে ৮ গুণ বেশি শক্তিসম্পন্ন। তবে সৌভাগ্যের ব্যাপার এই যে এরা খুবই নরম মেজাজের। কামড় না দেবার স্বভাব। বিষদাঁত গোখরার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট। বিষ থলি ও দাঁতের মিলিত কার্যক্ষমতা গোখরা এবং কেউটের চেয়ে কম। উপরন্তু এরা সমুদ্রের বাসিন্দা। ফলে এদেশে এবং ভারতে কোনো লোক বা সমুদ্রে স্নানকারী কোনো পর্যটককে সামুদ্রিক সাপে কামড়াবার নজির নেই। আমাদের জেলেরা এদেরকে অ-বিষাক্ত সাপ হিসেবেই নাড়া-চাড়া করে। যখন কোনো কাজ থাকে না তখন সেন্টমার্টিনস দ্বীপের অর্বাচীন ও রাখাল বালকেরা সামুদ্রিক সাপ ধরে। তারা বড়শিতে জ্যান্ত কাকড়া বা চিংড়ী গেঁথে সে বড়শি বড় বড় প্রবাল পাথরের ফাঁকে ফেলে। সামুদ্রিক সাপ সহজেই সে টোপ গিলে।

বাংলাদেশে যে ১২ প্রজাতি, Das (1994) এর মতে ১৩ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ আছে তাঁর দুটি উভচর সাপ। এরা ডাঙ্গায় ডিম পাড়ে। বাকিরা বাচ্চা দেয়। এ পর্যন্ত মোট ৯টি প্রজাতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে। এদেরকে বাংলাদেশে পাওয়া গেছে বা দেখা গেছে। প্রজাতিগুলি হচ্ছে (১) **উভচর সামুদ্রিক সাপ**, কমন এমিফিবিয়াস সীস্নেক *(Laticauda laticauda)*, (২) **কালো সমুদ্রিক সাপ**, ব্লাকহেডেড সী-স্নেক *(Endydrina schistosa)*, (৩) মোহানার সামুদ্রিক সাপ, এসচুয়ারাইন সী-স্নেক *(Hydrophis nigrocinctus)*, (৪) মোহানার সামুদ্রিক সাপ, এসচুয়ারইন সী-স্নেক *(H. obscurus)*, (৫) **বলয়যুক্ত সামুদ্রিক সাপ**, এনুলেটেড সী-স্নেক *(H. cyanociuctus)*, (৬) লাটি সাপ, ব্যাণ্ডেড সী-স্নেক *(Leiosciasma fasciatus)* (৭) **মালাবার সামুদ্রিক সাপ**, মালাবার সী-স্নেক *(Lapemis curtus)*, (৮) সরু মাথা সামুদ্রিক সাপ, ন্যারোহেডেড সী-স্নেক *(Microcephalophis gracilis)* এবং (৯) **রঙীলা সামুদ্রিক সাপ**, ইয়োলো অ্যান্ড ব্লাক সী-স্নেক *(Pelamis platurus)*। নমুনা সংগ্রহে সাহায্য করেছেন সহযোগী বন্ধু মিয়া মোঃ আবদুল কুদ্দুস, সাপের উপর আমার ছাত্র গবেষক মোস্তাকিম, রশিদ এবং অধ্যাপক হোসেনের ছাত্র গবেষক রাগিবউদ্দিন। আমি নিজেও নমুনা সংগ্রহ করেছি এবং ছবি তুলেছি।

বাকি যে তিনটি প্রজাতি আমি নিজে এখানো দেখিনি এবং নমুনা সংগৃহীত হয় নি সেগুলো হলো (১) কলুব্রীন এমফিবিয়ান সী-স্নেক *(Laticauda colubrina)*, (২) মালাক্কা সী-স্নেক *(Hydrophis caerulescens)* এবং (৩) ক্যান্টরের সামুদ্রিক সাপ ন্যারোহেডেড সী-স্নেক *(Microcephalophis cantori)* ব্যাপক অনুসন্ধান চালালে সেন্টমার্টিন্স দ্বীপের আশে পাশে এবং যান্ত্রিক মাছ ধরার জালে মাছের সাথে উঠে আসা নমুনার মধ্যে এদের সন্ধান মিলতে পারে।

সব সামুদ্রিক সাপের লেজ খাড়াখাড়িভাবে চিতল মাছের মতো চ্যাপ্টা। এটা সাঁতারের মোক্ষম অস্ত্র। এদের সারা শরীরে আঁইশ দেখতে প্রায় একই রকম। এমনকি পেটের আঁইশও। খসখসে, গোটা গোটা, দানাদার এদের আঁইশ। কেবল উভচর প্রজাতিদ্বয়ের পেটে গোখরার মতো বড় বড় পাথালি আঁইশ আছে। সে কারণে ডাঙ্গায় চলতে এদের তেমন কষ্ট হয় না। আর তাই এরা ডিম পাড়ার জন্য শতে শতে ডাঙ্গায় উঠে আসে। বাংলাদেশে এমন প্রজনন ক্ষেত্র নিজে দেখিনি। তবে সেন্টমার্টিন্সের রাখাল বালকরা বলেছে তারা উভচর সাপদের ডিম পাড়তে দেখেছে। বাকি সব সামুদ্রিক সাপ অভভিভিপেরাস *(ovoviviparous)* কায়দায় ডিম না পেড়ে পেট থেকে একেবারে বাচ্চা বের করে দেয়। তবে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বাচ্চা প্রসবের সাথে এ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সম্পর্ক নেই। সামুদ্রিক সাপকে সমুদ্রে বাস করার জন্য অপরাপর সামুদ্রিক জীবের মতো দেহ থেকে অতিরিক্ত লবণ বের করে দেবার জন্য বিশেষ অভিযোজনের দরকার হয়েছে। এদের নাসারন্ধ্রের পাশে লবণ-রেচন গ্রন্থি রয়েছে। ফলে সমুদ্রের পানিতে যে পরিমাণ লবণ থাকে তার চেয়ে বেশি মুক্ত দ্রবণ ঐ গ্রন্থির মাঝ দিয়ে সাগরে মিশে।

সামুদ্রিক সাপ সম্পূর্ণভাবে মাছ খেকো প্রাণী। লম্বাটে সামুদ্রিক বাইম এদের সবচেয়ে পছন্দ। অবশ্য এ ছাড়া এদের অন্য গতিও নেই। কারণ সামুদ্রিক সাপের মুখের ব্যাস

অপেক্ষাকৃত কম। বাইমের মতো সরু দেহের মাছ অনায়াসে পেটে ঢুকে যেতে পারে। আমাদের সকল সামুদ্রিক সাপের মধ্যে কেবল রঙীন সাপটি পাড়ে বা মোহনার কাছে আসে না। ওরা গভীর সমুদ্রে বাস করে।

সামুদ্রিক সাপ এদেশে কেউ খায় না। চামড়া অমসৃণ বলে বাজারজাত করণ সম্ভব নয়। কেবল জালে বাঁধার ফলে জেলেরা এদেরকে অবাঞ্ছিত প্রাণী হিসেবে ধরে নেয় এবং মেরে ফেলে।

সামুদ্রিক সাপ সচরাচর কামড়ায় না। তবে কাউকে যুৎসই কামড় দিলে তার মৃত্যু অবধারিত। উপমহাদেশে এদের এন্টিভেনম তৈরি হয় না। জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া ওসব তৈরি করে।

চন্দ্রবোরা গোত্র (Viperidae)

চন্দ্রবোরা ভাইপারিডী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই গোত্রকে ভেঙ্গে ভাইপারিনী এবং ক্রোটালিনী উপগোত্র করা হয়েছে। আমাদের দেশের চন্দ্রবোরা বা রাসেলস ভাইপার *(Vipera russelli)* এই উপগোত্রের অধীনে। ক্রটালিনীতে আছে ৫ প্রজাতির সবুজ এবং বাঁশবোরা সাপ।

ভাইপারিডী গোত্রের সব সাপের কতকগুলি সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রধান হলো উপরের চোয়ালের অগ্রভাগের একটি হাড়ের টুকরার উপর অস্বাভাবিক লম্বা একজোড়া বিষ দাঁত বসান। মোট বিষদাঁত দু'জোড়া। মুখ বন্ধ অবস্থায় দাঁতগুলি উপরের চোয়ালের নিচে ভাঁজ হয়ে থাকে। অমন গুটান দাঁত আর কারো নেই। খাদ্য-প্রাণী ঘায়েল এবং ছোবল মারার সময় বিশেষ মাংসপেশীর সংকোচনের সাথে সাথে স্প্রিং একশনে' দাঁত হয় খাড়া। তৈরি হয় আঘাত হানার জন্য। আঘাতহানার পর চোয়াল বন্ধ করার সাথে সাথে দাঁত জোড়া আলগোছে ভাঁজ হয় অনেক পেশীর বিশেষ ক্রিয়ার ফলে। দাঁত খাড়া হওয়া এবং গুটিয়ে নেওয়া একেবারেই চোয়াল খোলা এবং বন্ধ করার সাথে সম্পর্কিত। এদের উপরের চোয়ালের মাক্সিলারী হাড়ে কোনো দাঁত থাকে না কেবল বিষদাঁত বাদে। তবে টেরীগয়েড নামক অন্য অস্থির উপর এক সারি করে দাঁত আছে।

সাপের মধ্যে সবচেয়ে সুনিপুণ ও নিখুঁতভাবে তৈরি বোরা সাপের দাঁত। এদের দাঁতের গোরা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি সরু গলিপথ চলে গেছে। অবিকল ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মতোন।

দাঁতের কথা বাদ দিলেও বোরা সাপদের চেনা সম্ভব। এদের মাথাটা তেকোনা, বর্শার ফলার মতো। ঘাড় মাথার চেয়ে অনেক চিকন। দেহ মোটা। একটু খাটোভাব আছে। মাথার উপরে বর্শাকৃতির কোনো বড় আঁইশ নেই। তার পরিবর্তে আছে বহু ছোট ছোট খসখসে, উঁচু উঁচু আঁইশ। অবসারণী ছিদ্রের পর লেজ হঠাৎ করে অস্বাভাবিক সরু হয়েছে এরা সবাই বাচ্চা দেয়। সঙ্গমের পর ডিম মায়ের পেটে বড় হবার পর একটা থলিতে ঢেলে রাখে। বাচ্চা না ফোটা পর্যন্ত ডিম পেটের ভিতরের থলিতে বেড়ে উঠে। পরে পেট থেকে বাচ্চা বাইরে বেরিয়ে আসে।

চন্দ্রবোরা *(Vipera russelli)*

চন্দ্রবোরা আমাদের দেশের সবচেয়ে মারাত্মক সাপ। উত্তরবঙ্গে, দেশের অন্য এলাকার চেয়ে বেশি পাওয়া যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বেশ কটা চন্দ্রবোরা ধরা হয়েছে। মারা পড়েছে অনেক। দক্ষিণবঙ্গে কুষ্টিয়া, যশোর এবং খুলনাতেও বেশ পাওয়া যায়। কেবল ঢাকা বিভাগে যমুনার পূর্বদিকে এদের সন্ধান পেয়েছি।

চন্দ্রবোরাকে প্রথম দর্শনে অজগরের বাচ্চা বলে ভুল হতে পারে। তবে ওদের মাথার উপর এবং পিঠের উপরে চোখ পড়লে সে ভুল ঘুচে যাবে। মাথা বড় ও তেকোণা। ঘাড় সরু। বুক থেকে অবসারণী ছিদ্র পর্যন্ত পেট বেশ মোটা। লেজ সরু ও ছোট। শরীরের আঁইশগুলির পিছনভাগ খাড়া খাড়া *(Keeled)* এবং খসকসে। ঘাড় থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত পাশাপাশি তিনটি শিকলের সারি। প্রত্যেক সারির এক একটি চক্র বরফীর মতো বা গোলাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি। গায়ের রঙ বাদামী থেকে হলুদাভ। শিকলের গোলক প্রথমে গাঢ় ফোঁটাকৃতি, যার বাইরে থাকে দুটি ঘের। প্রথমটি সাদা, দ্বিতীয় এবং বাইরেরটি কালচে। পেট বাদামী বা বাদামী হলুদ চিতিযুক্ত (চিত্র : ৩.৪৪) একটি চন্দ্রবোরা লম্বায় সাধারণত এক মিটার। এরা সর্বাধিক ১৮০০ মিমি। চন্দ্রবোরার মস্ত মাথায় দুটি বৃহদাকৃতির বিষ থলি আছে। এজন্য মাথাটি বিশেষ উপযুক্ত। লম্বা দাঁত, বিষথলি বড়, অত্যন্ত যুৎসই দাঁত। সব যেন মানুষ মারার একটি যন্ত্র। চন্দ্রবোরা কামড়ালে রোগী বাঁচান কঠিন। এদের কামড়ে খুবই জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। ক্ষতস্থান ফুলে উঠে। বিষ রক্তের উপর ক্রিয়া করে রক্তকোষ জমাট বাঁধায়। সে কারণে বহু দেশে এর বিষ থেকে ঔষধ তৈরি করে রক্ত পড়া বন্ধের চিকিৎসার চেষ্টা চলছে। চন্দ্রবোরার পছন্দ উত্তরবঙ্গের মুক্ত প্রাঙ্গণ। ইঁদুর-ভর্তি ধান পাট খেতের আইল নুড়ি পাথরে ভর্তি রেল লাইন, ইটের ভাটা এবং বাড়ির পাশের ঝোপ-ঝাড়। গাছের নিচে জমে উঠা ডালপালা, পাতা, ইঁদুরের গর্ত ও উইয়ের ঢিবিতেও এদেরকে পাওয়া যেতে পারে। খাবার ধরার জন্য এরা ওৎ পেতে বসে থাকে। খাদ্য-প্রাণী নাগালের মধ্যে এলে হঠাৎ করে কামড়ে ধরে। শিকারের দেহে প্রথমে বিষ ঢেলে ছেড়ে দেবে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না হলে খাদক অপেক্ষা করবে। কিছুক্ষণ পর আহত শিকারের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক যেয়ে হাজির হবে এবং মৃত প্রাণীটি গলধঃকরণ করবে। সব সাপের এবং গুইসাপের মতো লিক্ লিক্ করা এদের জিহ্বা কোনো শব্দ শোনে না। বাতাসে এবং মাটিতে দ্রবীভূত রাসায়নিক দ্রব্যের গন্ধ জিহ্বা দিয়ে গ্রহণ করে তা উপরের চোয়ালে অবস্থিত জেকবসন্স অরগানে পাঠিয়ে দেয়। শরীর ভারী হবার ফলে চন্দ্রবোরাকে দৌড়ে খাবার পাকড়াও করতে হয় না। চন্দ্রবোরার প্রধান খাবার ইঁদুর। মাঝে মধ্যে পাখিও ধরতে পারে। চন্দ্রবোরা বৃষ্টির প্রারম্ভে ২০ থেকে ৪০টি আপন চেহারার অনুরূপ বাচ্চা দেয়।

রেগে গেলে বা কোণঠাসা হলে চন্দ্রবোরা ছোবল মারার আগে খুবই জোরে হিস্ হিস্ শব্দ করবে। এতেও শত্রু সতর্ক না হলে ত্বরিৎ ছোবল মারবে। সাধারণত ঘাড়ে পা দিলে অথবা অসতর্কভাবে এদের আশ্রয়স্থলে হাত দিলে কামড় খাবার সম্ভাবনা বেশি।

এদের সংখ্যা দিন দিন কমছে। চামড়া শিল্পে এদের ব্যবহার এবং রপ্তানি সবচেয়ে বেশি দায়ী। প্রক্রিয়াজাত করার পর চন্দ্রবোরার চামড়ার উপরকার শিকলের সারিগুলি স্পষ্ট এবং দৃষ্টি আকর্ষী হয়।

স-স্কেলড্ভাইপার *(Echis carinata)* নামে একটি ক্ষুদে চন্দ্রবোরা পাবনা জেলায় পাওয়া যায় বলে কোনো কোনো প্রাণীবিজ্ঞানী অভিমত দিয়েছেন। এ প্রজাতিটি এদেশে পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এরা অত্যন্ত শুষ্ক অঞ্চলের বা পাথরবহুল মরুময় এলাকার বাসিন্দা। এ ধরনের শুষ্ক পরিবেশ বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। তবে দিনাজপুর জেলাতে এরা থাকলে থাকতেও পারে। প্রজাতিটির নমুনা সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাবেনা। ১৯৯৫ পর্যন্ত এর কোনো নমুনা সংগৃহীত হয় নি। আসলে এটা ভারতের শুষ্ক অঞ্চল হয়ে পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য, আরব মরুভূমি হয়ে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। Das (1994) বলেছেন এ সাপ ট্রান্স হিমালয়ে, দাক্ষিণাত্য এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে বিদ্যমান। তাই যদি হয় তবে এ প্রজাতির জন্য বাংলাদেশে সঠিক বাসভূমি নেই।

সবুজ বোরা

সবুজ এবং বাঁশ বোরা সাপকে ইংরেজিতে পিট ভাইপার বলা হয়। এরা ক্রোটালিনী উপগোত্রের অধীন। এদের ৬টি প্রজাতি বাংলাদেশে আছে বলে আমার ধারণা। এসব বোরা সাপের সকল বৈশিষ্ট্যই ভাইপারিনী উপগোত্রের সদস্যদের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। তবে এসব বোরার নাক ও চোখের মাঝখানে আছে একটি বড় ছিদ্র বা পিট্। এই ছিদ্র তাপসংবেদনশীল। আমি যত সবুজ বোরা দেখেছি তাদের সবার মাথাই যেন চন্দ্রবোরার চেয়ে ভারী। গলাটা অপেক্ষাকৃত সরু। এগুলি আসলে কোনো স্থায়ী বেমিল নয়। বরং কৃত্রিম। হোসেন তার প্রবন্ধে তিনটি সবুজ বোরার গায়ের রঙের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন নি প্রজাতিগুলি দেশের কোন্ এলাকায় পাওয়া যেতে পারে।

আমি এ পর্যন্ত সবুজ বোরার বেশ কটি নমুনা পেয়েছি। বাঁশ বোরা বা ব্যাম্বু পিট ভাইপার *(Trimeresurus gramineus* চিত্র : ৩.৪৫) **সর্বপ্রথম সংগ্রহ করি পার্বত্য চট্টগ্রামের চিরসবুজ বন থেকে। সবুজ বোরা সাপ স্পট টেইল্ড পিট ভাইপারের** *(T. erythrurus)* **নমুনা প্রথমে সংগ্রহ করি সুন্দরবন থেকে।** এর পর চিরসবুজ বনে এদের নমুনা পাই। সুন্দরবন থেকে বাঁশ বোরার একটি নমুনা রশীদ সংগ্রহ করেছে। বদ্ধ পানির উপর ভাসমান উদ্ভিদের উপর ছাড়াও এসব বোরাসাপ সুন্দরী গাছের আলম্বের (বাটট্রেস) ফাঁকে থাকতে পছন্দ করে।

উপরের সংগৃহীত নমুনার প্রজাতি ছাড়া সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম বিভাগের চিরসবুজ বন এবং চা বাগানে রুচড্ পিট্ ভাইপার *(Ovophis monticola)*, পোপস গ্রিন পিট্ ভাইপার *(Troimeresurus popeorum)* এবং গ্রিন পিট্ ভাইপার *(T. albolabris)* ও *Protobothrops mucrosquamatus* পাওয়া যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সব সবুজ বোরা সাপ কম বেশি সবুজ। এদেশে বোরা সাপের প্রাকৃতিক পরিবেশের কাছে অন্য যে দুটি প্রজাতির সাপ পাওয়া যেতে পারে তা হলো লাওডগা এবং সবুজ ডোরা সাপ। প্রথমটির মাথা চিকন ও অগ্রভাগ সরু। এদের দেহ খুবই সরু এবং লম্বা। সবুজ বোরা সাপ দেখতে ঢোঁড়ার মতো। শুধু রঙ সবুজ। এদের কারো মাথাই বোরার ত্রি-কোণাকৃতি মাথার মতো নয়। এদের ঘাড় বোরার ঘাড়ের মতো সরু নয়।

বোরা সাপ ঝর্ণার বা ছড়ার ধারের ঝোপ-ঝাড়, বাঁশ বন, সুন্দরী ও অন্য ম্যানগ্রোভ গাছের গোড়ায় থাকতে পছন্দ করে। এরা নিশাচর। দিনের বেলা পরিচিত আবাসস্থল ছাড়াও গাছের ডালপালায় লেজ প্যাঁচিয়ে ঝুলে থাকতে পারে। এদের পছন্দের খাবার হচ্ছে ব্যাঙ, টিকটিকি ও গিরগিটি। খুব বড়রা ইঁদুরের উপর নির্ভরশীল। বর্ষা মৌসুমে বোরা সাপ ৫ থেকে ৮টা বাচ্চা দেয়। বাচ্চাদের মা বাবার চেয়ে বেশি রঙিন দেখায়।

সুন্দরবনের বাউয়ালী, চা-বাগানের কর্মী এবং চাকমারা বলেছে তারা এদেরকে বিষধর বলে খুব কমই গণ্য করে থাকে। সবুজ বোরার কামড়ে লোক মরার খবর আমার জানা নেই। এরা আকারে ও আয়তনে চন্দ্রবোরার চেয়ে খাটো। এদের বিষদাত ও বিষথলি অপেক্ষাকৃত ছোট। উপরন্তু এরা নরম মেজাজের। বেশি বিরক্ত না করলে উত্তেজিত হয় না। আর উত্তেজিত না হলে ছোবলও মারে না। ভয় পেলে বা কোণঠাসা হলে লেজ দোলাতে দেখা যায়।

ছোট সবুজ বোরার কামড়ে লোকজন হয়ত বা মরবে না কিন্তু প্রমাণ সাইজ, একমিটার লম্বা, বোরা সাপে কামড়ালে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। সবুজ বোরা লোকজনে মারে কম। চামড়ার দোকানে এদের চামড়া আমি দেখিনি। শুনিনি এদের চামড়ায় কোনো কিছু হয়। বন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের কারণে সবুজ বোরারা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

কিংবদন্তির নায়ক সাপ

সাপে কামড়ালেই মানুষ মারা যায় — এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই সাপ সম্পর্কে জনমনে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। সারা দেশে এবং উপমহাদেশে তাই এদেরকে নিয়ে কিংবদন্তির শেষ নেই। সাপ সম্পর্কে গল্প ফাঁদা হয়েছে হাজার একটা। যে কোনো লোককে যদি বলা হয় সামনেই সাপ, তক্ষুণি তিনি চিৎকার করে একটা লাফ যে মারবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেবল অবুঝ-অবোধ শিশু ছাড়া সকল শ্রেণীর মানুষই কম বেশি সাপ দেখে ভয় পান। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে মানুষ এবং সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী স্বাভাবিক সহজ-প্রবৃত্তি (Natural instinct) অনুযায়ী সাপ দেখা বা সাপের কথা হঠাৎ শোনামাত্র আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করে। শিল্পাঞ্জীর বাচ্চার সামনে সাপ ছেড়ে দেয়া হলে সে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে থাকবে। সেই সাথে চেষ্টা করবে কত তাড়াতাড়ি কোনো বস্তুর সাথে ঝুলে যাওয়া যাবে। অতএব সাপ সম্পর্ক ভয়ে কোনো লজ্জা নেই। আর তাই অন্ধকার ঘরের কোণে সাপ মানেই সারা ঘরে সাপ — এই প্রচলিত উক্তিটির যথার্থতা রয়েছে।

প্রচলিত ধারণা

সাপ নিয়ে এদেশে যে প্রচলিত ধারণা ও ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তা এত ব্যাপক এবং জনমনে এমন বদ্ধমূলভাবে গেঁথে আছে যে তার বিধান, সত্য ও বাস্তব হলেও, দেয়া কঠিন। এই ধারণাগুলিকে আরও বদ্ধমূল হতে সাহায্য করছে পত্র-পত্রিকার কতকগুলি চটকদার খবর। এখানে সাম্প্রতিককালের দুটি পত্রিকার নিবেদন তুলে ধরা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না।

একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক খবর ছাপলো ওঝা সাপে কাটা মরা রোগীকে ভালো করেছে। সেই সাথে ছাপা হয় ওঝার একটি ছবি এবং যে কাল নাগিনী মেয়েটিকে ছোবল মেরেছিল তার। বলা হয়েছে কালনাগিনী অত্যন্ত বিষধর সাপ। এখানে বৈজ্ঞানিক সত্যটা কি? সবাই জানেন মরা মানুষকে জীবিত করার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। রোগিনী সম্ভবত সংজ্ঞাহীন ছিলেন। তাঁকে বিষধর কিংবা অ-বিষাক্ত সাপে কামড়েছিল কিনা কেউ জানে না। আর যে সাপের ছবি ছেপে বলা হয়েছিল কালনাগিনী সাপ সেটি বাংলায় কালনাগিনী হলেও ইংরেজিতে ছিল ফ্লাইং স্নেক বা গোল্ডেন ট্রি স্নেক, যার বৈজ্ঞানিক নাম *(Chrysopelea ornata)*। মজার ব্যাপার হলো এই উড়ন্ত সাপ বা কালনাগিনী একটি অ-বিষাক্ত সাপ। একেবারে শতকরা একশ ভাগ অ-বিষাক্ত এ সাপ গলায় মালা করে বা কোটের পকেটে পুরে ঘোরা যায় যেমনটি যারে ডারাস ও কয়েক জাতীয় ঢোঁড়া সাপ নিয়ে।

তাহলে পত্রিকার খবরটি এখানে তিনটি অসত্যকে স্থায়ী হতে এবং তা দেশের এক কোণ হতে অন্য কোণে ছড়িয়ে পড়তে সহায়তা করলো।

আরেকটি দৈনিক গাইবান্ধা-সংবাদদাতার প্রেরিত একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবর পরিবেশন করলো। খবরে বলা হলো গোখরো সাপের পা। অর্থাৎ গাইবান্ধাতে দুটি পা-সহ একটি গোখরো সাপ এয়ারগানের গুলি দিয়ে মারা হয়েছে। সাপটি গাইবান্ধা কলেজে রাখা হয়েছে। ওর একটি ছবিও পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। পরে ঐ কলেজের সাথে যোগাযোগ করে জানলাম ওটা গোখরো সাপ নয় ; বরং আমাদের অতি পরিচিত ডারাস সাপ। গোখরার পা আছে বা পা হতে পারে বৈজ্ঞানিকেরা এটা বিশ্বাস করতে পারে না — যেহেতু এর প্রমাণ নেই। পরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দেয়া হলো।

সাপের মণি

সাপের মাথায় কোনো মণি বা ঐ জাতীয় কোনো পাথুরে জিনিস কখনো তৈরি হয় না। সাপ সম্পর্কে মানুষের সহজাত ভয়কে ভাঙ্গিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে সাপুড়েকুল সাপের মাথায় কোনো পাথর বা মুক্তা আঠা দিয়ে এঁটে দেয়। ক্রেতার মনের (বিশেষ করে মহিলাদের) কথাটি জানার পরই সাপুড়ে বা বেদেরা স্বীকার করে যে তার কাছে সাপের একটি মণি আছে। তাতে যদি ক্রেতা সন্তুষ্ট হন তবে তাকে তখন মণিটি দেখান। তবে ক্রেতা যদি সন্দেহ প্রকাশ করে এই বলে যে ওটি আসল মণি নয় তখন সাপুড়ে বলবে, কালকে আপনার জন্য একটি মণিসহ সাপ নিয়ে আসবো। পরে গোখরার মাথায় ফণার উপরে ছোট মুক্তা বা চকচকে পাথর আঠা দিয়ে লাগিয়ে ক্রেতার নিকট নিয়ে এসে সর্বজন সমক্ষে সাপের মণি খুলে চড়া দামে বিক্রি করে। সাপের মাথায় যদি মণিই থাকবে তবে সাপুড়িয়াদের তো সব রাজা মহারাজ হয়ে যাবার কথা।

দুধ পান

স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর যেহেতু দুধ বা স্তন নেই সেহেতু তাদের দুধ পান করার প্রশ্নটি একেবারে অমূলক। তবুও আসুন যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বিচার করা যাক।

কোনো সাপের ঠোঁট চোয়াল থেকে আলাদা নয় যেমন আছে মানুষের বা অন্য স্তন্যপায়ীদের। সাপের চোয়ালের উপর বড়শির কালের মতো পিছন দিকে বাঁকানো দাঁত

থাকে। কাজেই সাপের মুখ কিছুতেই চুষে বা শুষে কোনো জিনিস খাবার উপযুক্ত নয়। পৃথিবীতে সাপের আবির্ভাবের কয়েক কোটি বছর পরে স্তন্যপায়ী প্রাণী বিশেষ করে গরু ও মোশ এসেছে। সাপ যেহেতু মায়ের দুধে লালিত হয় নি তাই সে সহজাত প্রবণতা ও স্তন্যপায়ীর দুধ খাওয়ানো শেখতে পারে না। কারণ তখন ওসব প্রাণী দুনিয়াতে আসেই নি। কাজেই মুখের গঠন এবং বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী সাপ দুধ খাবার একেবারে অনুপযুক্ত। উপরন্তু গরুর পা পেঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা অজগর বা গোলবাহার সাপের আছে। আরও মজার ব্যাপার হলো সাপটিকে কেউ দুধপানকারী সাপ বলে চিহ্নিত করে না। যে সাপকে দুধরাজ বলা হয় তার ক্ষমতা হবে না একটি ছাগলের পা পেঁচিয়ে ধরে তাকে অসাড় করা।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে — দুধপানের কথা প্রচলিত হলো কি করে? জবাব দেয়া কঠিন। চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? আমার ধারণা এ উপমহাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বেশি এবং সাপের প্রতি তাদের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগে সেই আদিকাল থেকে সাপুড়ে সম্প্রদায় সাপের দুগ্ধ পানের কৃত্রিম স্বভাবটি রাষ্ট্র করে দিয়েছে। যেহেতু হিন্দুরা পূজা করে অথবা ভক্তি করে (বিশেষ করে দেবী মনসার বাহন হিসাবে) সেহেতু এমন দেবীতুল্য একটি প্রাণী নিশ্চয়ই বামুন ঠাকুরের মতো দুগ্ধই পান করবে, জনতার মতো মাংস নয়। তাদের এই চাতুরী ঢালাওভাবে বিশ্বাস করাবার জন্য পোষা গোখরা, দারাজ এবং দুধরাজ সাপদের পানি পান না করিয়ে তেষ্টা দারুণভাবে জাগাত। তারপর পান করতে দিত দুধ। উপায়ন্তর না পেয়ে সাপ বাধ্য হতো পানির সাধ দুধে মেটাতে। অন্তত মানিকগঞ্জ শহরের একজন মুসলিম সাপুড়েকে এ কর্মটি করতে দেখেছি নিজ চোখে। সাপ দুধ পান অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর ঐ "কন্‌ডিশন্‌ড" সাপটি দেখিয়ে সাপুড়ে বলে বেড়ায় যে দুধরাজ সাপ দুধ ছাড়া অন্য কিছু খায় না।

গ্রামের যে কোনো লোক এমন কি আমার ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন যারা বলছেন তাদের গরুর দুধ সাপে খেয়েছে — তাদের অনেকেরই সাক্ষাৎকার নিয়েছি। কেউ বলেননি যে তিনি নিজ চোখে দেখেছেন একটি সাপ গরুর বানে (বোঁটায়) মুখ লাগিয়ে দুধ খেয়ে চলে গেছে। তবে সবাই বলছে গরুর স্তনে কাঁটা কাঁটা দাগ দেখেছে। আমার কথা হলো এই কাঁটা কাঁটা দাগের সাথে সাপের কোনো সম্পর্কই নেই। সাপের দাঁতের বড়শির কালের মতন যে গঠন তাতে সে যে খাবার জন্য মুখে নেবে তা কেবল পেটের দিকেই যেতে পারবে। বাইরে যেতে মানে ছাড়া পেতে পারার সম্ভাবনা নেই। তবে প্রাথমিক অবস্থায় খাদ্যবস্তু বেশি জোরাজুরির সুযোগ পেলে হয়ত ফস্‌কে দাঁত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সাপ যদি গরুর স্তন কামড়ে ধরে তবে সে সাপের মৃত্যু নির্ঘাত। কারণ একবার কামরে ধরার পর সাপ স্তন যতই তার মুখের ভিতরে নেবে ততই তার মুখের পরিধি বড় হতে থাকবে। এক সময় পুরো বাট এবং ওলানের অংশবিশেষ মুখে ঢুকে শ্বাসনালী পর্যন্ত বন্ধ হতে থাকবে এবং সাপ নির্ঘাত মৃত্যু বরণ করবে এবং দুধের বোঁটার সাথে ঝুলতে থাকবে। এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকৃতিতে সারা দুনিয়াতে কোথায়ও ঘটেছে এমন প্রমাণ আমার জানা নেই।

কথা হলো যেসব গরুর স্তনে কাঁটা কাঁটা দাগ থাকবে সেসব গরুকে পশু চিকিৎসককে দেখাতে হবে এবং আসল রোগের চিকিৎসা করাতে হবে। সাপের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে

খামোখা রোগের বিস্তারই হবে মাত্র। বানে সাধারণত ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসাক্রান্ত হলে অমনটি হতে পারে।

প্রতিহিংসো

অনেকেই বলেন এবং বিশ্বাস করেন সাপের প্রতিহিংসার ক্ষমতা আছে, উদাহরণস্বরূপ বলে কোনো গোখরা সাপকে আঘাত করলে সে সাপ রাতের বেলা ঐ ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে তাকে আক্রমণ করবে।

প্রতিহিংসোর ব্যাপারটি মগজের ধারণ ক্ষমতা এবং তাকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। মানুষ বাদে অন্য প্রাণীর এই ক্ষমতা নেই বললেই চলে। অর্থাৎ মগজের যে অংশ এসব ঘটনার সংযোজনা করে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয় — সেই অংশটুকু সাপের বেলায় বৃদ্ধি লাভ করেনি। অর্থাৎ সাপের স্মরণ শক্তি নেই বললেই হয়। তবে মানুষ তার নিজের স্মরণ-শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যা যা চিন্তা ভাবনা করে, সে ধরে নেয় অন্য প্রাণীরাও অমনি সব কিছুই তার মতো করতে পারে। আসলে সেটা সত্য নয়, যেমন বাঘ বা হাতি মানুষের গায়ের গন্ধ থেকে বুঝতে পারে এরা তাদের স্বজাতি নয়, শত্রু। কিন্তু তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না বন্দুক হাতে বাঘ শিকারে উদ্যত আমি রেজা খানই তাদের শত্রু। আমার পাশে খালি হাতে ঘুরে বেড়ানো পচাদ্দি বা ছেরু মিঞা শত্রু নয়। সামনে পেলে হয়তো আমাকে বাদ দিয়ে ঐ দুজনকেই আগে বধ করবে। সাপের বেলায় এ ব্যাপারটি প্রযোজ্য এ কারণে যে সাপ বাঘের চেয়ে শ্রেণী বিন্যাসের ও বিবর্তনের ধারায় অনেক নিচু স্তরের প্রাণী।

তাহলে প্রতিহিংসার ধারণা এল কি করে, বলা একটু কঠিন। অনুমিত হয় কখনো কোনো ব্যক্তি চলার পথে একটি সাপ দেখে তাকে আঘাত করে। সে যখন রাতে তার মাটির ঘরে ঘুমাচ্ছিল তখন একটি সাপ তাকে কামড়ায়। খুব সম্ভবত এমন কোনো ঘটনা থেকেই প্রতিহিংসার ধারণা চালু হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো আঘাত প্রাপ্ত এবং রাতের কামড়ে অংশগ্রহণকারী সাপ একই প্রাণী নয়। দুটি ভিন্ন সাপ। আঘাতপ্রাপ্ত সাপ ধারে কাছে মানে ছোবলের নাগালে পেলে আঘাতকারীকে কামড়াতে চেষ্টা করবে। অন্যথায় সাপ সহজাত প্রবণতা হেতু প্রথমে চেষ্টা করে আঘাত নিয়েই পালিয়ে যাবার এবং নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করার।

যে সাপ রাতে কামড়েছিল সেটি হয় পূর্বেই ঘরে ঢুকেছিল অথবা ইঁদুরের লোভে ঐ ঘরেই কোথাও কোনো গর্তে বাস করত। ঐ রাতে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের উপর দিয়ে বা পাশ দিয়ে যাবার সময় ঐ ব্যক্তিটির শরীরের কোনো অংশ নড়াচড়া করে এবং ভীত সন্ত্রস্ত সাপ তাকে কামড়ে দেয়। পরে দেখা যাবে যে সাপ কখনো নিশ্চল প্রাণী বা মানুষকে কামড়ায় না।

জিহ্বা দিয়ে শ্রবণ

সাপ যখন কোনোই কাজ করে না, মুখ বন্ধ করে মরার মতো পড়ে থাকে তখনও সে অনবরত জিহ্বা বের করতে পারে। এই ব্যতিক্রমধর্মী স্বভাব গুই সাপ ছাড়া অন্য প্রাণীদের নেই। যেহেতু বারে বারে জিহ্বা বের করে সেহেতু ওর সাহায্যেই সাপ শ্রবণের

কাজটি সারে — ধারণাটি মন্দ নয়! আসলে কি হচ্ছে! সাপের বহিঃকর্ণ (External ear) না থাকায় সাপ সহজে শুনতে পায় না। অতএব এই শোনার কাজটি তাকে অন্যভাবে পুষিয়ে নিতে হয়। সে কাজটি করে জিহ্বা। সবাই জানেন সাপের জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত লম্বা ও সরু। ওদের উপরের চোয়ালের ভিতরের অংশে "জেকবসন অর্গান" বলে একটি গ্রন্থি আছে। জিহ্বার কাজ হলো বাতাসে দ্রবীভূত সকল রাসায়নিক দ্রব্যের নমুনা গ্রহণ করা। পরে জিহ্বার মাথা "জেকবসন অর্গান" ঠেকিয়ে সেই রাসায়নিক দ্রব্যের অনুভূতি ঐ গ্রন্থিতে পৌঁছে দেয়। জেকবসন অর্গান ঐ সমস্ত দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিচার করে মগজের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করে এবং মগজ তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অর্থাৎ শত্রুর গন্ধ পেলে আত্মরক্ষা বা আঘাত এবং খাবারের সন্ধান পেলে তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। অতএব জিহ্বা বার বার বের করতেই হবে। তবে শ্রবণের জন্য নয়, রাসায়নিক ঘ্রাণ গ্রহণের জন্য।

লেজ দিয়ে আঘাত

গ্রামের লোকজন বিশ্বাস করে যে "দারাজ" সাপ লেজ দিয়ে বাড়ি মেরে শত্রুকে ঘায়েল করে। মানুষের গায়ে অমন আঘাত লাগলে সেখানে পচন ধরে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি নিজে বহুবার দাড়াস সাপ নাড়াচাড়া করার সুযোগ পেয়েছি। দাড়াস সাপ কখনো লেজ দিয়ে আঘাতের চেষ্টা করে নি। তবে জোর করে মাথা চেপে রাখলে দাড়াস সহ অন্য সকল সাপই লেজ দিয়ে প্যাঁচানোর চেষ্টা করবে। মাথা ধরে ঝুলিয়ে রাখলে লেজটি সামান্য ঘুরাবে মাত্র। ওতে কোনো লাভ হবে না। কোনো সাপেরই লেজ দিয়ে আঘাত হানার অভ্যাস নেই। কুমীরের লেজের মতো এদের লেজে শক্ত কোনো কাঁটা থাকলে তা দিয়ে আঘাত করা যুক্তিযুক্ত হতো।

দু'মুখো সাপের কয় মুখ

বাংলাদেশের দুটি সাপকে দু'মুখো সাপ বলে চালানো হয় প্রথমটি কেঁচোর আকৃতি ও দৈর্ঘ্যের। এদের কারো লেজের অংশ মাথার চেয়ে বড়। অতএব মাথার দিকে একটি এবং লেজের দিকে একটি মাথা — এই মোট দুটি মাথা মিলেই দু'মুখো সাপ!

অপর সাপটি হলো সবচেয়ে রঙিন শাকিনী, শংকিনী বা শংখচূড় সাপ। এ সাপের লেজটি ভোঁতা। সাপুড়ে বা বেদেরা সাপের অধিক গুণ কীর্তন এবং অদ্ভুত প্রাণী হিসেবে ঘোষণা করে দর্শকদের মনোরঞ্জন এবং অধিক রোজগারের মানসে শাকিনী সাপের লেজটি সাজায় 'মাথা'। একদম অগ্রভাগে রঙ দিয়ে মুখ আঁকে এবং উপরের দিকে ফোঁটা দিয়ে চোখ বানায়। ব্যাস কেল্লা ফতে! দর্শক দেখে মনে করে সত্যিই তো লেজের মুখেও চোখ আছে। অতএব ওটাও একটি মুখে। অতএব শাকিনীর দু'মুখ।

সাপের অগ্রভাগে একটি মাথা এবং লেজের ডগায় অন্য একটি মাথা বলে সাপ সম্পর্কিত বইতে এমনি তথ্য প্রকাশিত হয় নি। তবে বাংলাদেশ অবজারভার এ প্রকাশিত, ইউ. পি. আই পরিবেশিত একটি সাপের ছবি ছেপে বলা হয়েছে ও সাপের দু'মুখ। এর পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণিত হয় নি। ছবি থেকে আমার ধারণা ভেতরের "মাথাটি" লেজের স্ফীত অংশ যাকে সাধারণ মানুষ বা সাংবাদিক (চিত্রগ্রাহক) অন্য একটি মাথা বলে ধরে নিয়েছেন।

অবশ্য বৈজ্ঞানিকভাবে সাপের দুটি মাথা হতে পারে কেবল একটি মাথা দ্বিখণ্ডিত হবার মাধ্যমে। অর্থাৎ দেহের অগ্রভাগের একমাত্র মাথাটি, ভ্রূণাবস্থায় বেড়ে উঠার কালে কোনো অজ্ঞাত কারণে দ্বিখণ্ডিত হতে পারে। ইউরোপীয় গ্রাস স্নেকের বেলায় এমনটি হয়। বছর কয়েক আগে রাশিয়ার উদয়ন পত্রিকায় অমন একটি ছবি ছাপা হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ে। মানুষের ক্ষেত্রে অনেকের ২২ বা ২৪ আঙ্গুল রয়েছে। তেমনি সাপের এক মাথার জায়গায় বেড়ে উঠা মাথার অংশসহ দুটো মাথা থাকতে পারে। কিন্তু লেজের দিকে একটি এবং মাথার দিকে অন্য একটি মাথার নজির নেই।

বাঁশীর সুরে মোহিত সাপ

এ ব্যাপারে প্রাণীবিজ্ঞানী অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন বাংলা একাডেমীর বিজ্ঞান পত্রিকায় এবং জনাব নুরুল হুদা সাপ্তাহিক বিচিত্রায় বিস্তারিত লিখেছেন। শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। সাপের চোখটি ঠিক আমাদের মতো কপালে নয় — মাথার দুপাশে। অতএব আমাদের মতো ওদের দূরবীণ দৃষ্টি বা বাইনোকুলার ভিশন নেই। আমরা যে কোনো বস্তু দেখলে তার আকার, আয়তন এবং নিজের কাছ থেকে দূরত্ব সহজেই অনুমান করতে পারি। সাপ তা পারে না। কাজেই ওকে হেলেদুলে, কাত হয়ে, বাঁকা দৃষ্টিতে লক্ষ্যবস্তু দেখতে হয়। ফলে চলমান যে কোনো বস্তুকে নিরীক্ষণ করতে হলে একটি সাপকে ঐ বস্তুর সাথে সর্বদা একই দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে (কন্‌স্ট্যান্ট) মাথা হেলাতে দুলাতে হয়।

সাপের বহিকর্ণ না থাকায় বাতাসে ভেসে বেড়ানো কোনো শব্দ বা তার ঢেউ সাপের কানে প্রায়ই প্রবেশ করতে পারে না। তবে যে বস্তুর উপর সাপ থাকে, যেমন মাটি, ঝুড়ি, গাছের ডাল প্রভৃতি, আঘাত করলে তাতে যে স্পন্দন হয় সেই স্পন্দন সাপ গ্রহণ করতে পারে। তাই সাপ যখন মাটিতে শুয়ে থাকে তখন মাটিতে বা ঝুড়িতে বা হাঁড়িতে থাকলে সেসবের গায়ে টোকা মেরে বা আঘাত করে সাপকে সজাগ করে তুলে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে সাপের বহিকর্ণ না থাকলেও তারা সামান্য পরিমাণ বাতাস-বাহিত শব্দ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু জীবন-প্রণালি চালু রাখার জন্য এ ক্ষমতা পর্যাপ্ত নয়। অতএব এরা বাতাস-বাহিত শব্দের সংবেদনশীল হয় না। সাপুড়ে বাঁশী বাজিয়ে দর্শকদের মোহিত করে, সাপকে নয়।

শিকড় তাবিজ দিয়ে সাপ বন্ধকরণ

গাছের শিকড়, জড়ি বা তাবিজ সাথে থাকলে সাপ কামড়াবে না — এই ধারণা সারা উপমহাদেশে খুবই চালু ব্যাপার। সাপুড়েদের সাপ-খেলা দেখে পয়সা না দিলেও তাবিজ কবজ অনেকেই কিনতে অভ্যস্ত।

সাপের মগজে এমন কোনো ক্ষমতা নেই যা দিয়ে সে গাছের শিকড় বা তাবিজ কবজের উপস্থিতি আঁচ করতে পারবে। তবে হাঁ, প্রতিদিন যদি একটি সাপকে কোনো শক্ত বস্তুতে আঘাত করতে বাধ্য করা যায় তবে সে কিছুটা অভ্যস্ত (কণ্ডিশনড) হয়ে যায়। পরে সাপ ওরকম বস্তুতে আঘাত করতে অনিচ্ছুক হয়। যেমন বাঘ ও সিংহকে খেলা

শেখানোর সময় বৈদ্যুতিক শক দিতে পারে এমন কিছু বিদ্যুৎযুক্ত বেত বা দণ্ড ব্যবহার করা হয়। ফলে বিদ্যুৎ থাকুক বা না থাকুক অনুরূপ বেত দেখলেই বাঘ ভয়ে মাথা নিচু করে।

সাপুড়েদের কাছে যেসব সাপ থাকে তার কোনোটির বিষদাঁত থাকে না। গোখরা বা বিষধর সাপের বিষদাঁত আগেই ভেঙ্গে ফেলা হয়। কিন্তু বিষদাঁত আছে তার সাহয্যে কামড় দিলে রক্ত বের হবে। কিন্তু মানুষ মরবে না। যেমন ঢোঁড়া সাপ, দাড়াস সাপ কামড় দিলে রক্ত বের হবে কিন্তু লোক মরবে না। তাই সাপুড়ের কাছে তাবিজ, কবজ বা শেকড় থাকুক বা না থাকুক বিষদাঁত ভাঙ্গা সাপ বা অবিষাক্ত সাপ কামড়ালে সাপুড়ে এবং আপনার আমার কিছুই হবে না।

মৃত সাপ, জ্যান্ত সাপ ইত্যাদি

এ ধরনের দুটি ধারণা দেশে খুব চালু। ঢোঁড়া সাপে কামড় দিলে সে জায়গায় গোবর দিলে কামড়ের ক্রিয়া বিষে রূপান্তরিত হবে। দ্বিতীয়ত মৃত ঢোঁড়া ও দাড়াস সাপের মাথায় গোবর দিলে সে সাপ জ্যান্ত হয়ে উঠবে। আপনারা অনেকেই টিকটিকির খসে যাওয়া লেজ নড়তে চড়তে দেখেছেন। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আধ ঘন্টা অবধি খণ্ডিত লেজটি নড়াচড়া করে। যেহেতু সংবেদনশীল স্নায়ু তখনো পর্যন্ত ক্ষমতা হারায় না, সে জন্য এমনটি হয়। সাধারণত মাথায় আঘাত করার মাধ্যমে সাপকে মারা হয়। মাথা নড়াচড়া না করলেই ধরা হয় সাপের মৃত্যু হয়েছে। আসলে তখনো সাপের রক্ত সঞ্চালন সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না এবং স্নায়ুতন্ত্রের কতিপয় স্নায়ু তখনো কার্যক্ষমতা হারায় না। লেজের বেলাতেই ব্যাপারটি বেশি নজরে পড়ে। যেহেতু লেজের অগ্রভাগে রক্তনালির সংখ্যা কম এবং স্নায়ুগুলি দীর্ঘ সময় সচল থাকার ফলে লেজ নিস্তেজ হতে সময় লাগে বলে আমার ধারণা বা বিশ্বাস। এতে গোবরের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

তবে যে কোনো সাপের কামড়ের জায়গায় গোবর বা অন্য বাহ্যিক বস্তু পড়ার ফলে পচনজনিত ঘা হতে পারে—যাকে গ্রামের লোকজন বিষের ক্রিয়া বলে ভ্রম করতে পারে।

সাপের পা

আমি তখন ছোট। সমবয়সীদের কাছ থেকে শুনেছি, যে সাপের পা দেখবে সে রাজা হবে। মেয়েরা হবে রানি। তখন থেকেই রাজা হবার একটা বাসনা যে না ছিল তা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমার মতো লাখ লাখ কিশোর এবং গ্রামবাসী কোনোদিনই রাজা হতে পারবে না। কারণ সাপের আসলে কোনো পা নেই। যে জিনিস নেই তা আর দেখা যাবে কোত্থেকে। কেবল কল্পনা করা যায়।

সাপের পায়ের ধারণাটি একেবারে অমূলক নয়। এর আগে গাইবান্ধা কলেজে পা সহ গোখরা সাপের কথা বলেছি। পত্রিকায় ঐ ঘটনা প্রকাশের পর আমি নিজেই ঐ সাপ সংগ্রহের জন্য খুব চেষ্টা করেছি। পরে নমুনাটি বিজ্ঞান যাদুঘরে আসে। সাপটি গোখরা নয়। ওটা বড় একটা দারাজ সাপ।

সব পুরুষ সাপে অর্ধলিঙ্গ (Hemipenis)নামে এক জোড়া পুরুষাঙ্গ আছে। এ দুটি অর্ধলিঙ্গ অবসারণী ছিদ্র পথ থেকে সামান্য বিস্তৃত—সঙ্গমের সময় একটি অর্ধলিঙ্গ স্ত্রীর

অবসারণী ছিদ্রের মাঝ দিয়ে স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেশ করে এবং শুক্রের সাহায্যে ডিম্বকে নিষিক্ত করে।

ভয় পেলে বা অবসারণী ছিদ্রের কাছাকাছি কোনো জায়গায় চাপ পড়লে দুপাশে দুটি অর্ধলিঙ্গ বেরিয়ে আসতে পারে। কদাচ কেবল একটিও বের হতে পারে। এই অর্ধলিঙ্গ থেকে সাপের পা থাকার ধারণাটি মানুষের মনে বদ্ধমূলভাবে গেঁথে গেছে। আসলে আমরা যেসব সাপ সচরাচর দেখি তাদের কারোরই পা নেই। বালুবোরা বা কমন স্যাণ্ড বোয়া নামক সাপে পায়ের মতো একজোড়া প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গ আছে। অজগর ও ময়াল পুরুষের পায়ু পথের পাশে একটি করে নখর সাদৃশ্য অঙ্গ থাকে। এটা পায়ের ক্ষয়িষ্ণু অংশ।

প্রশ্বাসে মানুষ গিলা

পৃথিবীতে এখন কোনো সাপ নেই যা প্রশ্বাসের সঙ্গে মানুষ বা স্তন্যপায়ী প্রাণী বা অন্য প্রাণী গিলে খায়। বাংলাদেশের অজগর সাপকে এই অপবাদ দেয়া হয়। অজগর সেই অর্থে যে কোনো প্রজাতির সাপ আক্রমণ বা তা প্রতিহত করার জন্য কামড় বা ছোবল মারবে। খাদ্য-বস্তুকে ঘায়েল করার জন্য কামড়ের সাথে সাথে পেঁচিয়ে ধরে খাদ্য-প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলে। হাড় গোড় ভেঙ্গে নেয়।

সাপের দৌড়-পাল্লা

সাপ এবং মানুষে দৌড় প্রতিযোগিতা হলে প্রত্যেকবারই মানুষ জিতবে। সেই অর্থে দ্রুত চলন ক্ষমতাসম্পন্ন সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী সাপের আগে যাবে। কারণ দৌড়বার জন্য যে শক্তি স্তন্যপায়ী বা পাখির দেহে উৎপন্ন হবে সাপসহ সকল প্রকার সরীসৃপদের দেহে তা কখনো হবে না। সে কারণে সাপ সামান্য ১০-১৫ মিটার দূরত্ব দ্রুত অতিক্রম করার পরই দুর্বল হয়ে পড়বে। অতএব পাল্লায় মানুষের জয় হবে। পারত-পক্ষে কোনো সাপ মানুষকে ধাওয়া করবে না। মানুষের দেহ-চাপা পড়ার ভয়ে সে মানুষকে তাৎক্ষণিক আক্রমণ করবে। তবে ডিম বা বাসায় পাহারারত সাপ বাসার চৌহদ্দির মধ্যে ডিম ও বাচ্চা রক্ষার জন্য লোকজনকে তাড়া দিতে পারে। সাধারণভাবে সাপ কাছিমের গতিতে চলে।

পিচ্ছিল সাপ

সাধারণের ধারণা হলো সাপের শরীর পিচ্ছিল এবং খুবই শীতল। দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো সাপই পিচ্ছিল নয়। তাদের গা থেকে কোনো পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত হয় না। কাজেই দেহ পিচ্ছিল হবার উপায় নেই। সাপের শরীর টিকটিকি, গুই সাপের মতোই কিছুটা উত্তপ্ত। সাপের দেহ শীতল এই ধারণাটি সত্য নয়। অমূলক।

সাপ ও নেওলের সম্পর্ক

সাপে ও নেওলের সম্পর্কের আগে দেখা যাক সাপের শত্রু কারা। সাপ কি করেই বা আত্মরক্ষা করে। সাপের এক নম্বর শত্রু হচ্ছে মানুষ। সাপ দেখলেই মারতে হবে। না

মারতে পারলে কমপক্ষে ঢিল ছুঁড়তে হবে। এ সবই এ দেশের ধর্মীয় অনুশাসন। সাপের চামড়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পাহাড়ীয়ারা সাপ ও তার ডিম খায়।

ইঁদুর, বেজী, গুইসাপ, জলার পাখি এবং শিকারি পাখি সাপের ডিম ও বাচ্চা খায়। মোরগ-মুরগি, হাঁস এবং পোষা বিড়ালকেও সাপ খেতে দেখা যায়। কদাচ কোলা ব্যাঙ সাপের বাঁচ্চা খেতে পারে। আর বৃহদাকার গোবরের পোকা (রাইনোসেরাস বিটল), বড় কালো পিঁপড়া, ছোট ছোট দু'মুখো সাপ খেয়ে ফেলতে পারে। এ ছাড়াও আছে রাজ গোখরা ও শাঁকিনী সাপ কর্তৃক অন্য সাপ খাওয়া।

সাপের আত্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন হলো গা ঢাকা দেয়া বা তাড়াতাড়ি কোন বস্তুর আড়ালে বা গর্তে ঢুকে পড়া। এ ছাড়া অজগর, ময়লা সাপ এবং ছদ্মবোরা সাপ শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্য বেশ জোরে ফোঁস ফোঁস বা হিস্ হিস্ শব্দ করতে পারে। গোখরা এবং কলিউব্রিডী গোত্রের কোনো কোনো প্রজাতি ফণা তুলতে বা গলার অংশ ফুলিয়ে বেশ ভয়াল মূর্তি ধারণ করতে পারে। কেউ কেউ আবার লেজ গুটিয়ে তার বিভিন্ন রঙ দিয়েও ভয় দেখাতে পারে। দু'মুখো সাপ হাতে নিলে প্রায়ই লেজের অগ্রভাগের সরু বাঁকা অংশ দিয়ে খোঁচাতে পারে।

একদম উপায়ান্তর না দেখলেই সাপ কামড় দিবে। এ কামড় বিষধর বা অবিষধর যে কোনো সাপই দিতে পারে। আক্রান্ত, ভীত বা কোনটাই না হলে বিষধর সাপ মানুষ বা গরুর মতো বড় প্রাণীদের আক্রমণ করে না।

তরুণ শিক্ষিত সাপুড়ে দীপক মিত্র কলিকাতার বাসিন্দা। সে ভারতের সবচেয়ে বড় ও সাহসী বৈজ্ঞানিক সাপুড়ে। বিষদাঁতসহ সে গোখরা সাপকে লেজ ধরে মাটি থেকে তোলে। তারপর লেজ উঁচু করে সাপের মাথাটা অন্য হাতের উপর আলগোছে নামিয়ে দেয়। গোখরা হাতের তালু বেয়ে হেলিয়ে রাখা দেহের উপর দিয়ে, বাড়িয়ে দেয়া (লেজ ছেড়ে তারপর) অন্য হাতের উপর দিয়ে তালু পার হবার সময় সে খপ করে সাপের মাথা ধরে নেয়। অথবা নামতে দেয় মাটিতে। পুনরায় গোখরাকে ধরে লোকজনের সামনে বিষ বের করে নেয় কাঁচের পাত্রে। বোম্বাই শহরে দীপক মিত্রের এই লোমহর্ষক কাণ্ড আমি বহুবার দেখেছি। মাদ্রাজের সর্প বিশারদ রমুলাস বলেছেন ও ধরনের ভয় শূন্য কাজ তার দ্বারা হবে না। যদিও রমুলাস ও তার স্ত্রী যায়েদা তাঁদের নিজ হাতে গোখরা সাপ ধরে তার খেলা বহুবার আমাকে দেখিয়েছে।

দীপক মিত্রের উদাহরণটি থেকে সহজেই বোঝা যায় ভয় বা আঘাত না পাওয়া পর্যন্ত সাপ সাধারণত আক্রমণ করে না।

বেজী সাপ খায়। একথা সত্য। তবে গোখরার পরিবর্তে অপরাপর প্রজাতি এর খাদ্য তালিকায় বেশি স্থান পায়। গোখরার সাথে বেজীর ঝগড়ার সম্ভাবনা আসলে শূন্য। কারণ বেজী দেখা মাত্র গোখরা পালাবে। ভারত এবং বাংলাদেশে এমন একজন বিজ্ঞানীর সন্ধান আমি পাইনি যিনি নিজ চোখে প্রকৃতিতে সাপে-বেজীতে লড়াই করতে দেখেছেন। বি. বি.

সি টেলিভিশন তার বিহেভিয়র সিরিজের ছবির জন্য রমুলাসের সাহায্যে মাদ্রাজ স্নেক পার্কে সাপ ও বেজীর লড়াই বাঁধিয়েছিল। মানুষে বাধানো সে লড়াই আমি দেখেছি। লড়াইয়ে জয় হয়েছিল বেজীর। সাপ বহুবার রণে ভংগ দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বেজী সে সুযোগ দেয় নি। গোখরা বাধ্য হয়ে ফণা উঁচিয়ে বেজীকে ছোবল মারার চেষ্টা করেছে। বেজী সাপের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে সাপের চোয়াল কামড়ে ধরে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিয়েছে যে সাপ কিছুতেই নিজের দেহ মাটিতে সঠিকভাবে লাগিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। কয়েকটি ঝাঁকুনি দিয়েই বেজী সাপকে ছেড়ে দিয়েছে। পালয়নপর সাপকে বাধ্য করেছে পুনরায় ফণা তুলতে এবং সে আবার তার চোয়াল কামড়ে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সাপটিকে ছেড়ে দিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক।

বিষধর সাপের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বেজী এবং স্বর্পভুক পাখির অস্ত্র হলো গায়ের ফোলানো পশম এবং পালক। তবে পশম ও পালক ভেদ করে যদি সাপের ছোবল পশু বা পাখির গায়ে লাগে তবে তাদের মৃত্যু নির্ঘাত।

সাপের কামড় ও চিকিৎসা

ওঝারা সাপে কাটা রোগী ভালো করবে এটাই আমাদের দেশী রেওয়াজ। কোথাও ঝাড়-ফুক, তাবিজ, কবজ, পানি পড়া ইত্যাদি দিয়েও সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করা হয়। অবাস্তব হলেও সত্য যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাপে কাটা রোগী এসব অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় ভালো হয়। কেন হয় সে কারণও এখানে বলব।

বিষধর এবং অবিষধর যে কোনো প্রজাতির সাপ মানুষসহ অন্য সব প্রাণীকে কামড়াতে পারে। সাপে কাটলেই মানুষ মারা যাবে এটা ঠিক নয়। অবিষধর সাপে কামড়ালে নিয়মানুযায়ী কোনো প্রাণী মারা যাবে না। তবে সাপে ছোবল মেরেছে এই ভয়ে যে কোনো মানুষের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হতে পারে। তার ফলে সে ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। অবিষধর সাপে কাটা এমন ধরনের রোগীদেরকে বাঁচাতে পারে ওঝা, ঝাড়-ফুঁক, এবং পানি পড়া। লাল ডোরা, সবুজ ডোরা এবং প্রবাল সাপে কমজোরী কামড় দিলে সেসব রোগীকেও এই ধরনের ঝাড়-ফুঁকে ভালো করা সম্ভব। এখানে রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। ওঝার মন্ত্র পাঠ অকথ্য ভাষায় গালি, যা তোতা পাখির মতন আওড়ান হয়, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতি রোগীর মনকে চাংগা করে এবং হৃৎপিণ্ডের কম্পন কমিয়ে আনে।

সর্প বিশারদ রমুলাস বলেছেন যে, বোম্বের হফকিন্স ইন্সটিটিউট এক জরিপে বলেছে দক্ষিণ ভারতে যত লোককে সাপে কামড়ায় তার প্রায় আশি ভাগ হচ্ছে অবিষাক্ত সাপের কামড় এবং যত লোক মারা যায় তাদের প্রায় আশি ভাগ অবিষাক্ত সাপের কামড়ে মরে। অর্থাৎ সাপে কামড় দিয়েছে এই ভয়েই তারা মরে।

ওঝা সম্প্রদায়, ঝাড়-ফুঁক এবং পানি পড়া বিষধর সাপে কামড়ালে রোগীকে বাঁচানোর নামে মরতে বেশি সাহায্য করে। কারণ বিষাক্ত সাপে কাটা রোগীকে এসবের কিছুই ভালো করতে পারে না।

অন্যদিকে যেহেতু দেশের বেশির ভাগ সাপে কাটা রোগীকে অবিষাক্ত সাপে কামড়ে থাকে, সেহেতু ওঝাদের মন্ত্র-তন্ত্র ওসব রোগীর মনোবল উন্নত রাখার জন্য যথেষ্ট সহায়ক। সাপের কামড়ের এক অমোঘ চিকিৎসা হলো মনোবল উন্নত রাখা।

এখন আমাদের দেখা দরকার, যেসব বিষধর সাপ মানুষকে কামড়ায় তাদের বিষের কি প্রতিক্রিয়া আমাদের দেহে হয়। এ ব্যাপারে রমুলাসের বইয়ের সাহায্য নিয়ে নিচের অংশ লেখা হলো।

গোখরার কামড় (ইণ্ডিয়ান কোবরা)

গোখরা সাপের বিষ স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে। গোখরার বিষ মোটর নার্ভের কেন্দ্রগুলিকে অকেজো করে ফেলে। এর দরুন শ্বাস এবং হৃৎপিণ্ডের কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রোগী মারা যায়।

গোখরায় কামড়ালে (১) কামড়ের জায়গায় ব্যথা হতে পারে, (২) কামড়ের এক দেড় ঘন্টা পরে ক্ষতস্থান ফুলে উঠতে পারে, (৩) কখন কখন ক্ষতে ঘা দেখা যায় বা নেকরোসিস হতে পারে, (৪) চোখে আবছা বা অস্পষ্ট দেখা, (৫) চোখের পাতা নুদে আসবে, (৬) পা কাঁপবে অথবা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে, (৭) জিহ্বা ভারী হয়ে আসবে, (৮) কথা জড়িয়ে যাবে, (৯) মুখ দিয়ে লালা ঝরতে পারে, (১০) ঝিমুনি লাগবে এবং আচরণ হবে অসংলগ্ন, (১১) দারুণ শ্বাসকষ্ট হবে এবং খিচুনি দেখা দেবে। ফলে দম বন্ধ বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগী মারা যাবে।

কাল কেউটের কামড় (কমন ক্রেইট)

কেউটের বিষ গোখরার মতো হলেও গোখরার চেয়ে এদের বিষ দুই থেকে আট গুণ বেশি বিষাক্ত। এদের কামড়ের প্রথম চার/পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত রোগীর লক্ষণসমূহ গোখরায় কাটা রোগীর লক্ষণের মতো হবে। সেই সাথে নিচের লক্ষণগুলি ভীষণভাবে মনে রাখতে হবে।

কেউটেয় কামড়ালে (১) ক্ষতস্থান ফুলবে না, (২) কোনোরূপ ব্যথা অনুভব হবে না, (৩) কামড়ের প্রথম কয়েক ঘন্টায় বিষের কোনো ক্রিয়ার লক্ষণ রোগীর দেহে নাও ফুটে উঠতে পারে এবং (৪) কামড়ের ছয় থেকে বার ঘন্টার ভেতর পাকস্থলিতে এবং গিটে গিটে দারুণ ব্যথা অনুভব হতে পারে।

সাপে কাটা সকল রোগীর মধ্যে কেবল কেউটেয় কাটা রোগী নীরবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কেউটে নিশাচর এবং রাতে যত রোগী সাপে কাটে তার বেশির ভাগ ছোবল আসে কালকেউটে থেকে। সে জন্যই বোধ হয় গ্রামের লোক বলে কাল সাপে ছুঁয়েছে, এ রোগী আর ভালো হবে না।

চন্দ্রবোরার কামড় (রাসেল ভাইপার)

চন্দ্রবোরার বিষ গোখরার বিষের চেয়ে এক তৃতীয়াংশ কম বিষাক্ত। তবে চন্দ্রবোরার দাঁত এত লম্বা (এক সেন্টিমিটারের বেশি) এবং বিষ থলিতে গোখরার থলির চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বিষ ধরতে পারে। তাই এরা কামড়ালে এবং পর্যাপ্ত বিষ ঢেলে থাকলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। চন্দ্রবোরার বিষও রক্তের উপর ক্রিয়া করে। এদের বিষ রক্তের কণিকাকে আক্রমণ করে। এ বিষ রক্ত পরিবহণের নালীর ঝিল্লির কোষ ভেঙ্গে দেয় রক্তের অন্তক্ষরণ এবং জমাট বাঁধাবার জন্য রক্তে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য থাকে তাও ভেঙ্গে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করে। চন্দ্রবোরার কাটা জায়গায়(১) সঙ্গে সঙ্গে এবং অনবরত জ্বালা পোড়া অনুভূত হতে পারে, (২) ক্ষতস্থান মারাত্মকভাবে ফুলে উঠবে। ফুলা জায়গা ঘন্টা কয়েকের মধ্যে দ্বিগুণাকার হতে পারে অর্থাৎ কিনা পায়ে কামড়ালে তা ফুলে সত্যি কলা গাছের মতো মোটা হতে পারে, (৩) যে অঙ্গে কামড়াবে সে অঙ্গের রঙ পরিবর্তন হবে, কালশিরা পড়বে, ক্ষতস্থানের আশে পাশে কলার (Tissue) রঙ নীল, লাল, কাল,বা সবুজ হতে পারে, (৪) ক্ষতস্থানে ফোসকাও দেখা দিতে পারে, (৫) রোগীর বমি বমি ভাব হবে, শরীর নেতিয়ে পড়বে, এবং সে খুবই উত্তেজিত হবে, (৬) থুথু, বমি, প্রস্রাব বা পায়খানার সাথে রক্ত আসতে পারে, (৭) রোগীকে অতি মাত্রায় বিষ ঢেলে দিয়ে থাকলে রোগীর চোখ, ঠোঁট, দাঁতের মাড়ি, নখের নিচে এবং পায়ু পথ থেকেও রক্ত বেরুতে পারে, (৮) চোখ, ঝাপসা হয়ে আসবে, (৯) শ্বাস কষ্ট হবে এবং (১০) প্রচুর অন্তক্ষরণ, হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্বল এবং বৃক্কের সকল কাজ বন্ধ হয়ে যাবার দরুন রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

শঙ্খচূড়, রাজ গোখরা বা কিং কোবরা যে এলাকায় কদাচ পাওয়া যায় সে এলাকায় মানুষ সাধারণত রাতে চলাচল করে না, চললেও তারা প্রায় নৌকায় থাকে। যেমন সুন্দরবনে বা পাহাড়ি অঞ্চলে এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। শাকিনী, শঙ্খিনী, দুমুখো বা ব্যান্ডেডক্রেইট একান্তই নিশাচর। নরম মেজাজের হওয়ার ফলে এরা সহসা কামড়ায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে সত্যিকার অর্থে তিন প্রজাতির, গোখরা, কেউটে এবং চন্দ্রবোরার, কামড়ে আমাদের দেশের লোকজন মারা যায়। এদের মধ্যে চন্দ্রবোরার আধিক্য উত্তরবঙ্গে বেশি।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সাপে কাটা রোগীকে ডাক্তারী চিকিৎসা ছাড়া তাৎক্ষণিক যা করা যেতে পারে তা হল তার মনোবল সমুন্নত রাখা। এর জন্য প্রথমেই রোগীর কাছ থেকে সকল অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে সরিয়ে দেয়া। যথেষ্ট আলো বাতাস দেহে পৌঁছতে দেয়া। রোগীর সাথে কথা বলা এবং তাকে সাহস যোগান। রোগীকে উত্তেজিত হতে না দেওয়া।

হাতে বা পায়ে কামড়ালে ক্ষতের কিছু উপরে বা নিচে দুটি আলাদা বেণ্ডেজ বা মোটা ফিতা দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দিতে হবে যাতে রক্ত চলাচলের পরিমাণ কমিয়ে রাখা যায়।

দেহের চামড়া এবং বাঁধা ফিতার মাঝখান দিয়ে অন্তত আঙ্গুল চালনার মতো জায়গা রাখতে হবে। ক্ষত পা-হাত নিচ দিকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। পা বা হাত নাড়াচাড়া না করান বাঞ্ছনীয়। এ সময় রোগীকে এম্প্রিন জাতীয় টেবলেট বা গ্লোকোজ স্যালাইন দিতে হবে। এতে করে বিষের ক্রিয়ার কিছু হবে না। কিন্তু রোগীর মনোবল খুবই উন্নত হবে। বিগত আটাত্তর-উনাশি সালে ঢাকা এবং ময়মনসিংহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যখন সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন চিকিৎসকবৃন্দ ইনজেকশনের কথা বলেছিলেন। রমুলাসও তার সাপের বইতে ইনজেকশনের কথা বলেছে। বিরাশি সালে ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং ক্যাজুয়েলিটি মেডিসিনের ডঃ সালাউদ্দিনের সাথে আমি ও রমুলাস সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার বিষয়ে আলাপ করি। একজন চিকিৎসক জানান বিষধর সাপে কাটা রোগীর একমাত্র ঔষধ হচ্ছে এন্টিভেনম বা এন্টি ভেনীন ইনজেকশন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তা বাজারের ডাক্তারখানা, সরকারি ডিপেনসারি এবং হাসপাতালগুলিতে নেই! পাকিস্তান আমলের পরে নাকি কেবল এক চালানে এন্টিভেনম আমদানি করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ওষুধ ডিপোতে এখন নাকি এন্টিভেনম নেই। বিষধর সাপে কাটা রোগীর একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে এন্টিভেনম ইনজেকশন। দেশের বাজারে বা সরকারি হাসপাতালে এ ওষুধ পাওয়া যায় না। ভাবতে অবাক লাগে বৈকি! অবিলম্বে এন্টিভেনম আমদানি করে শহরের হাসপাতালগুলোতে না দিলেও সকল থানা হাসপাতাল গুলোতে পৌছান দরকার। কারণ শহুরে মানুষের চেয়ে গ্রামের মানুষকে সাপে কাটে বেশি। সেসব জায়গায় সাংবাদিক না থাকার কারণে সংবাদ-পত্রে সাপে কাটা রোগী মারা যাবার খবর খুবই সামান্য ছাপা হয়।

আমার জানা মতে ভারতে কমপক্ষে তিন জায়গায় অঞ্চলীয় বিষধর সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য এন্টিভেনম তৈরি হয়। বোম্বের হফকিন্স ইন্সটিটিউট গোখরা, কাল কেউটে, চন্দ্রবোরা এবং সম্স্কেল্ড ভাইপারে কাটা রোগীর চিকিৎসার জন্য একটি সম্মিলিত এন্টিভেনম তৈরি করে। এই এন্টিভেনম দিয়ে উপরের চারটির যে কোনো একটি প্রজাতি কামড়ালে তার চিকিৎসা করা যাবে। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের বেঙ্গল কেমিক্যালস এন্টিভেনম তৈরি করে। হরিয়ানা প্রদেশের কাসৌলীতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় গবেষণা ইন্সটিটিউট এন্টিভেনম তৈরি করে। অতি সম্প্রতি রমুলাস এবং মাদ্রাজী উপজাতীয় "ইরুলা" মিলিতভাবে এন্টিভেনম তৈরির জন্য মাদ্রাজ স্নেক পার্কে উৎপাদিত সাপের বিষ কাসৌলীতে দিচ্ছে।

বাংলাদেশে আমি একজন লোককে জানি যিনি এন্টিভেনম রাখেন। তিনি হলেন ফাদার ইউজিন হমরিখ। মধুপুরের জঙ্গলের পাশের জলছত্র মিশনে তিনি থাকেন। হমরিখ বিষধর সাপ ধরে তা খান এবং সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার সামান্য ব্যবস্থাও রাখেন। ফাদার হমরিখের কাছে প্রথম জেনেছিলাম দেশের বাজারে এন্টিভেনম কিনতে পাওয়া যায় না। সারা দেশে সরকারিভাবে কেবল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সংযুক্ত সামরিক হাসপাতালে, এন্টিভেনম আছে যা সর্বদাই সর্ব সাধারণের নাগালের বাইরে।

কুমীর

প্রাগৈতিহাসিক মহাযুগের ডাইনোসরদের অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক চরিত্রের সমাহার ঘটেছে কুমীরবর্গীয় প্রাণীদের দেহে। সরীসৃপের মধ্যে কেবল কুমীরদের হৃৎপিণ্ড প্রায় সম্পূর্ণ চারটি ভাগে ভাগ হয়ে দুটি অলিন্দ এবং দুটি নিলয়ের সৃষ্টি করেছে। চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড আছে কেবল পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের।

বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে মোট তিন প্রজাতির কুমীর পাওয়া যেত। ভারতে এখনো এরা সবাই বিদ্যমান। এরা হচ্ছে ক) লোনা পানির কুমীর, সল্ট ওয়াটার বা এসচুয়ারাইন ক্রোকোডাইল *Crocodylus porosus* .খ) মিঠা পানির কুমীর, মাগার বা মার্স ক্রোকোডাইল *Crocodylus palustris*. এবং গ). ঘড়িয়াল *Gavialis gangeticus*. মিঠা পানির কুমীর গত দুশতকে বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। এক-দুটি এখনো যদি বেঁচে থাকে তবে তা সুন্দরবনের উত্তরাঞ্চলীয় নদী যেখানে লবণাক্ততা অপেক্ষাকৃত কম সেখানে থাকতে পারে। যেহেতু বাওয়ালীরা লোনা ও মিঠা পানির কুমীরকে আলাদা করে চিনতে পারে না সেহেতু একটি দুটি মিঠা পানির কুমীরের অস্তিত খুঁজে বের করা খুবই কঠিন কাজ। মিঠা পানির কুমীর এখন আছে কেবল মীরপুরের চিড়িয়াখানা এবং বাগেরহাটের পীর খান জাহান আলী সাহেবের মাজার সংলগ্ন পুকুরে। এই দুই জায়গায় এদের সর্বমোট সংখ্যা হবে আট থেকে দশটি। এক সময় মিঠা পানির কুমীর পাওয়া যেত পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরীসহ পাহাড়ি নদী কর্ণফুলী, এবং তাদের শাখা-প্রশাখায়। সারা বাংলাদেশের কোথাও এই কুমীর গত দশ পনের বছরে দেখা যায় নি। এরা অবশ্যই প্রকৃতি থেকে হারিয়ে গেছে বলা ভালো।

লোনা পানির কুমীর কখনো মিঠা পানিতে বাস করত না। খুলনা শহরের নিচে পশুর নদী থেকে শুরু করে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া লোনা পানি ও জোয়ার-ভাটার সকল নদী, দক্ষিণ বঙ্গীয় নদী মোহানা যেখানে ব্যাপক এলাকা জুড়ে চরাঞ্চল ছিল সেখানেই সমুদ্র খাড়ি ও মোহানায় লোনা কুমীরের আনা-গোনা ছিল। এখন এ কুমীর কেবল সুন্দরবনে আছে। [অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) এক প্রবন্ধে বলেছেন সুন্দরবন এলাকাতেই মোট ৩০০০ কুমীর হত্যা করা হয় ১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ সালে।] সারা সুন্দরবনের নদী, খাল ও খাড়ির পরিমাণ ২০০ বর্গমাইল। প্রতি বর্গমাইলে একটি কুমীর ধরে সারা সুন্দরবনে ২০০টি লোনা পানির কুমীর আছে বলে আমার বিশ্বাস। অস্ট্রেলিয়া এবং পাপুয়া নিউ গিনীতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে একটি করে লোনা কুমীর আছে। সেখানকার পরিবেশ আমাদের সুন্দরবনের পরিবেশ অপেক্ষা উন্নততর। কারণ বনভূমি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক না হওয়ায় লোকসমাগম, বনকাটা এবং পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি হয় কম। সেহেতু কুমীরের জন্য ঐ সব এলাকা আমাদের সুন্দরবনের চেয়ে নিরাপদ। ঘড়িয়াল সম্পর্কে আলোচনা করবো একটু পরে।

কুমীর চেনার উপায়

বাংলাদেশে যে তিন প্রজাতির কুমীর পাওয়া যেত তার একটিকে অন্যটি থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে শনাক্ত করা সম্ভব। কেবল দারুণ লম্বা চোয়াল (তুণ্ড বা স্নাউট) থাকার জন্যে ঘড়িয়ালকে অন্য সব কুমীর থেকে আলাদাভাবে চেনা যায়। বাকি দু-প্রজাতি চেনার জন্য দুটো পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। জ্যান্ত বা মৃত কুমীর হাতে পেলে অথবা কুমীর যখন রোদ পোহাতে থাকবে তখন একটি থেকে অন্যটিকে চেনা যাবে তাদের চোয়ালের তুলনামূলক দৈর্ঘ্য, মাথার উপরকার ঘাড়ের ও পিঠের কাঁটার অবস্থা দেখে (চিত্র : ২.৪৬, ৩.৪৭)।

লোনাপানির কুমীরের চোয়াল গোড়ায় যত প্রশস্ত, লম্বায় তার দেড় থেকে আড়াই গুণ দীর্ঘ হবে। প্রত্যেকটি চোখের সামনে লম্বালম্বিভাবে একটি করে চূঁড়া আছে। চোয়াল মূলদেশ থেকে অগ্রভাগের দিকে ক্রমশ সরু। দেখতে মূলা বা গাঁজরের মতো। উপরের চোয়ালের প্রথমাংশের উভয় পাশে চারটি করে দাঁতসহ উপরের পাটিতে দাঁতের সংখ্যা ৩৪ থেকে ৩৮। মাথার পিছনে চারটি বড় বড় কাঁটা মিলে চারকোনা প্লেটের সৃষ্টি হয়। এই প্লেটের আগে-পাছে দু একটি বিচ্ছিন্ন কাঁটা থাকতে পারে। ঘাড়ের ওপর চারটি কাঁটা থাকে। এগুলো একটার সাথে আরেকটা সেঁটে থাকে না। এরা অপেক্ষাকৃত খাড়া। পিঠের ওপর কঠিন হাড়যুক্ত বর্মের ন্যায় চার থেকে আট সারি কাঁটা থাকে। একটি কাঁটার হাড় অন্যটির সাথে লেগে থাকে না—মানে দুটি কাঁটা পাশাপাশি থাকে এবং আগে পরের কাঁটার মাঝে যথেষ্ট ফাঁক থাকে। ঘাড়ের এবং পিঠের কাঁটার মাঝে দূরত্ব বেশি (চিত্র: ৩.৪৮ ও ৩.৪৯)।

মিঠা পানির কুমীরের চোয়ালের উপর, চোখের সামনে কোনো চূঁড়া নেই বললেই চলে। চোয়াল অপেক্ষাকৃত খাটো। দৈর্ঘ্য মূলদেশের প্রস্থের চেয়ে মোট দেড়গুণ। উপরের চোয়ালের অগ্রভাগের প্রত্যেক পাশের পাঁচটি দাঁত সমেত উপরের পাটির দাঁতের সংখ্যা ৩৮। মাথার পিছনের কাঁটাযুক্ত চারকোনা প্লেটটি লোনা পানির প্রজাতির মতো হলেও এদের প্লেট বেশি প্রশস্ত। কাঁটাগুলো অধিক চ্যাপ্টা। মাথার পিছনে ঘাড়ের কাঁটার ব্যবধান খুব কম। পিঠের কাঁটার ভেতরকার হাড় একটি অন্যটির সাথে প্রায় লেগে থাকে।

মাঠে মিঠা পানির কুমীরকে লোনা পানির কুমীর থেকে আলাদা করা যায় প্রথমোক্ত প্রজাতির মাথার পিছনের প্রায় চ্যাপ্টা চতুষ্কোণ কাঁটাযুক্ত প্লেট এবং ঘাড়ের উপরকার দু'সারি কাঁটা দেখে। উপরন্তু লোনা পানির কুমীরের পিঠের কাঁটা খাড়াখাড়া এবং মিঠা পানির কুমীরের কাঁটা চ্যাপ্টা ধরনের। প্রায় ৫০ থেকে ১০০ গজ দূরে অবস্থিত কুমীরদের এসব বাহ্যিক গুণাবলি দূরবীণের সাহায্যে চোখে পড়ে।

পৃথিবীর কুমীর

সারা পৃথিবীতে ২৫ থেকে ২৭ প্রজাতির কুমীরবর্গীয় প্রাণী আছে। এদের ১৫-১৬টি প্রজাতি ক্রকোডাইলিডী, ৯টি এলিগেটরিডী এবং একটি গেভিয়ালিডী গোত্র বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। কুমীর গোত্রের সবাইকে কুমীর বলে ডাকা হলেও একটি প্রজাতিকে বলা হয় ফলস ঘড়িয়াল। এলিগেটর গোত্রের দুটি প্রজাতিকে বলা হয় এলিগেটর। বাকি সাতটি হলো কাইমান।

ঘড়িয়াল, কুমীর, এলিগেটর, কাইমান বা ফলস ঘড়িয়ালের মধ্যে কতকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল দেখা যায়। এদের সবার আছে জোড়া হাত, পা, লম্বা লেজ, চোয়াল, চোয়ালের অগ্রভাগের উপরে নাসারন্ধ্র, মাথার উপর চোখ ও চোখের পিছনে ঢাকানাযুক্ত কানের ঝিল্লি, কাঁটাযুক্ত শরীর। হাড়ের বুননীসহ শক্ত আঁশে মোড়া। কাঁটার পৃষ্ঠদেশ উচু খাড়া হয়ে চূঁড়ার আকার ধারণ করে। কাঁটাগুলো বর্মের ন্যায় কাজ করে। ফলে সহজে গুলি করে কুমীর মারা সম্ভব হয় না। ডাঙ্গায় গর্ত খুড়ে ডিম পাড়া, মা কুমীরের ডিমও বাসা প্রহরা দেওয়া, বাসার মাটি সরিয়ে বাচ্চা বের করা, ঘন্টার পর ঘন্টা রোদ পোহানো বা মরার মতো পড়ে থেকে শরীরের শক্তিক্ষয় রোধ করা কুমীরের স্বভাবের অংশ।

কুমীরের হাত পা ডাঙ্গায় চলবার জন্য বিশেষ উপযোগী। কুমীর যখন পানির ধারের খাড়া কোনো পাড়ে রোদ পোহায় তখন আগন্তুকের উপস্থিতি টের পেলে শরীরটাকে ঢালু পাড়ের উপর দিয়ে টেনে টেনে পানিতে গিয়ে পড়ে। এতে ধারণা জন্মে যে, কুমীর ডাঙ্গায় চলবার সময় পেটের দিক মাটিতে ঠেকিয়ে চলে। আসলে তা নয়। স্থলভাগে চলাফেরার সময় কুমীর হাত-পায়ের ওপর ভর করে বুক ও পেট মাটি থেকে যথেষ্ট উপরে তুলে হেঁটে বেড়ায়। লেজের বিভিন্ন ভঙ্গিমার মাধ্যমে ওরা পানিতে সাঁতার কাটে। সাঁতারের সময় হাত পা গুটিয়ে দেহের সঙ্গে সেঁটে রাখে। তবে পানিতে ভেসে বেড়াবার সময় হাত পা ছড়ানো থাকতে পারে, যেমন রাখে ব্যাঙ। বিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য কুমীর তার দাঁতযুক্ত চোয়াল এবং লম্বা লেজের ব্যাপক ব্যবহার করে।

কুমীরের সকল দাঁত প্রায় দেখতে একরকম। সেহেতু কোনো দাঁত দিয়ে খাবার ধরা, কোনোটা দিয়ে খাবার কাটা সম্ভব হয় না । অতএব ওপরের এবং নিচের পাটির দাঁতগুলো গিয়ারের মতন শিকারের উপর বসে যায়। এতেই শিকারের মৃত্যু স্বাভাবিক। কিন্তু খাদ্যবস্তু খুব বড় আকারের হলে তা দাঁতের ফাঁকে ফেলেই কুমীর সমানে পাক খেতে থাকবে। এই মোচড়ের তোড়ে খাদ্যবস্তুর পা বা ঘাড় মটকে গিয়ে মৃত্যু হবে। খাদ্যদ্রব্য ছোট হলে কুমীর তা পানির নিচেই খেয়ে ফেলব। বড় হলে মুখে খাবার ধরে চোয়াল উঁচু করবে পানির উপর। তারপর সামান্য ঝাঁকুনীতে তা উর্ধ্বাকাশে একটু ছুঁড়ে মেরেই হাঁ করে গিলে নিবে। পানিতে খাবার গিলতে কুমীরের কষ্ট হয় না এজন্য যে মুখগহ্বরের শুরুতে, উপরে এবং নিচে, দুটি ভালব থাকে। খাদ্য গলধঃকরণের সময় ভালব দুটি খাদ্যের ওপর এমনভাবে সেঁটে থাকে যে ওসব ভেদ করে পানি কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

কুমীরের বর্তমান অবস্থান

ঘড়িয়াল পাওয়া যায় বাংলাদেশে, ভারত, নেপাল এবং কদাচ পাকিস্তানে। ফসল ঘড়িয়াল/গেভিয়াল মালয়ের মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপপুঞ্জে, চায়নীজ এলিগেটর পূর্বচীনে এবং আমেরিকান এলিগেটর যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বাস করে।

সাত প্রজাতির কাইমান প্যারাগুয়ে, আমাজন, ওরিনোকো, মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা, কলাম্বিয়া এবং গায়ানার নদীসমূহে বিচরণ করে। কুমীরের একটি প্রজাতি

মিঠা পানির কুমীর বেলুচিস্তান থেকে ভারতের আসাম, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা অবধি বিস্তৃত। বাকিদের পাওয়া যায় পশ্চিম আফ্রিকা, আপার কঙ্গো বেসিন, নিউগিনী, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, কিউবা, ওরিনোকো বেসিন, আফ্রিকা ও মাদাগাস্কার, কঙ্গো থেকে সেনেগাল, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, জাভা, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায়। লোনা পানির কুমীর বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার মালয় দ্বীপপুঞ্জে এবং অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায়।

দৈর্ঘ্য/বয়স

ক্লীফোর্ড এইচ পোপ নামক সরীসৃপবিদ সারা দুনিয়ার কুমীরকে দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে তিনটি দলে বিভক্ত করেছেন। সবচেয়ে বড়দের দলে পড়ে আমাদের ঘড়িয়াল, লোনা পানির কুমীর এবং আমেরিকা ও ওরিনোকোর কুমীর। যদিও পোপ তার বইতে বলেছেন এরা লম্বায় ২৩ ফুটের বেশি হয় না, ভারতীয়, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা বলেছেন ঘড়িয়াল এবং লোনা পানির কুমীর নাকি ৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তবে এরা সচরাচর ১৪ থেকে ১৫ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। মিঠা পানির কুমীর লম্বায় ১৫ ফুটের বেশি হয় না। সাধারণত ৮/৭ ফুট লম্বা কুমীর বেশি দেখা যায়।

মিঠা পানির এবং লোনা পানির কুমীর ৬০ থেকে ৮০ বছর বাঁচতে পারে। শোনা যায় প্যারিসে রাখা 'জীন-কুইবী' নামক আমেরিকান এলিগেটর যখন ৪ এপ্রিল, ১৯৩৭ সালে মারা যায় তখন তার বয়স নাকি হয়েছিল ৮৫ বছর। এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও সখের সরীসৃপ পালক মেজর ফ্লাওয়ার বলেছেন—তাঁর পোষা আমেরিকা এলিগেটর ৫৬ বছর, চায়নীজ এলিগেটর ৫০ বছর এবং মিঠা পানির কুমীর ৩১ বছর ছিল যখন তিনি এসব তথ্য প্রকাশ করেন। ঘড়িয়াল ৫০ থেকে ৬০ বছর অবধি বাঁচতে পারে।

কুমীর শিকার

বন্দুক রাইফেল দিয়ে কুমীর শিকার সম্ভব। তবে এদের ব্যবহার ডাঙ্গাতেই সীমাবদ্ধ। পানিতে কোনো কুমীরকে শিকার করলে তা পণ্ডশ্রম বই আর কিছুই হবে না। গুলি খেয়ে কুমীর পানিতে ডুব দেবে। যদি গুলি দেহের পাশের কোনো অংশ দিয়ে ঢুকে থাকে তবে মরতে দিন দুয়েক লাগবে। এসময় গুলি খাওয়া কুমীর লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে যাবে। ডাঙ্গায় শিকারের সময় এমনভাবে বন্দুক তাক করতে হবে যাতে গুলি মাথার ঠিক পিছনের কাঁটাবিহীন চামড়া ভেদ করে স্নায়ুরজ্জুকে ছিঁড়ে দেয়। অনেকেই আবার গুলি করে মেরুদণ্ড ভেঙ্গ দেয়। আহত কুমীর অনেকটা আহত বাঘের মতই হিংস্র হয়।

গ্রামাঞ্চলে কুমীর শিকারের কায়দা ভিন্ন। সেখানে হারপুন যা শক্ত এক ফলা বিশিষ্ট টেঁটা শরীরের পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এক সময় পদ্মা যমুনাতে যখন হাজার মনি উড়িয়া পশ্চিমা নৌকা মাল টানতো তখন ওসব মাঝিরা হারপুনের সাহায্যে ঘড়িয়াল মেরে খেত। ওদের বড় নৌকার পিছনে ছোট ডিঙ্গি নৌকা থাকত। চার পাঁচজন মাঝি উঠত সে ডিঙ্গীতে। একটি শক্ত লাঠির মাথায় আটকিয়ে নিত হারপুন। হারপুনের পিছনে বাঁধা থাকত লম্বা রশি। নদীর দ্বিতীয় অংশে ঘড়িয়ালের আনাগোনা যেখানে বেশি সেখানে ডিঙ্গীসহ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত। ১০ থেকে ১৫ ফুটের মধ্যে ঘড়িয়াল আসতে দেখলে সাথে

সাথে ছুঁড়ে দিত হারপুন। ঘড়িয়াল সমানে মোচড় দিতে থাকত। এতেও হারপুন ছুটাতে না পেরে আহত ঘাড়িয়াল এলো–পাথারি দৌড়াতো। ফন্টাখানেক বা দুয়েক পরেই সে নিঃস্তেজ হয়ে পড়ত। তখন ঘড়িয়াল টেনে ডাঙ্গায় তোলা হতো। রাজশাহীর চরের লোকেরা বলে ঐসব মাঝিরা নাকি ঘাড়িয়াল বালুতে পুতে রাখত। ঘড়িয়ালের মাংস সপ্তাহকাল ধরে তার মহা–উৎসবে খেত।

ঘড়িয়ালের কথা (চিত্র : ৩.৫০ ও ৩.৫১)

ঘড়িয়াল, ঘড়েল, বাইশাল, মেছো কুমীর, গেভিয়াল এবং গেভিয়েলিস গেনজেটিকাস (*Gavialis gangeticus*) একই প্রাণী। শেষোক্ত নামটি বৈজ্ঞানিক। তাই এটি বাদে বাকি সব নামই এলাকাভেদে ভিন্নতর হতে পারে। তবে একে যে নামেই ডাকা হোক না কেনো খুবই লম্বা চোয়ালের কুমীর বললে যে কেউ চিনবে। সারা দুনিয়াতে ঘড়িয়াল সাদৃশ্য একটি প্রাণীই আছে। সেটি হচ্ছে ফসল ঘড়িয়াল বা মালয়ন ঘড়িয়াল টমিসটোমা শ্লিজেলী। (*Tomistoma schlegeli*)

পৃথিবীতে ঘড়িয়াল পাওয়া যায় কেবল নেপালের কর্নালী, বাবাই, রাপতি দুন, নারায়নী এবং কোশী নদী, ভারতের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানন্দী এবং বাংলাদেশের পদ্মা ও যমুনাতে। ভারতীয় কুমীর বিশারদ জে, সি. ড্যানিয়েল, রমুলাস হুইটেকার, লালা এ. কে. সিংহ এবং ডঃ এইচ. বাস্টার্ডের মতে নেপালের নদীসমূহে গোটা পঞ্চাশেক এবং ভারতীয় নদীতে শতখানেক প্রাকৃতিক ঘড়িয়াল বেঁচে আছে। পাকিস্তানের শুক্কুর এবং গুড্ডু বাঁধের কাছে ১৯৭৭ সালের দিকে নাকি দু-তিনটি ঘড়িয়াল দেখা গিয়েছিল।

বাংলাদেশে ঘড়িয়ালের অবস্থা নেপালের চেয়েও সঙ্গীন। ১৯৭০–এর দিকে রাজশাহীতে একটি ঘড়িয়াল ছানা ধরা পড়ে। বিভিন্ন প্রর্দশনীতে সে নিজের অস্তিত্বে প্রমাণ করে এক সময় হাঁপিয়ে উঠে এবং অনাহারজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়। তার মরদেহটি শেষ পর্যন্ত স্থান পায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের যাদুঘরে। সেখান থেকে প্রমোশন পেয়ে এখন সে আছে ঢাকার বিজ্ঞান যাদুঘরে।

একাত্তর থেকে আটাত্তর সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রাজশাহী শহরের নিকটবর্তী চরে প্রায় সাড়ে ১২ ফুট লম্বা মেয়ে ঘড়িয়াল ধরা পড়ে। দুর্ভাগিনী পেট ভরতি ডিম নিয়ে চরে রোদ পোহাতে উঠে। সেখানে জাল শুকাতে দিয়েছিল জেলেরা। সে জড়িয়ে পড়ে ঐ জালে। আর যায় কোথায়। হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠেছে বাইশাল বেঁধেছে। অমনি চরবাসীরা লাঠি–সোঠা নিয়ে হামলা করেছে জালে বাঁধা ঘড়িয়ালকে। আধমরা অবস্থায় ওটাকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজশাহীতে। সেখানে প্রদর্শিত হবার পর এক সময় এটির মৃত্যু হয় এবং এর স্বর্গবাস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের যাদুঘরে।

একটি বড় ঘড়িয়াল ধরা পড়ে সিরাজগঞ্জের কাছে যমুনার খাড়িতে। জেলেদের ফাঁসি জালে বেধেছিল এই ঘড়িয়াল। এটাও প্রথমে আশ্রয় পায় সিরাজগঞ্জের প্রর্দশনীতে তারপর মৃত্যু। ফুলছড়ি ঘাটের কাছে, যমুনাতে ধরা পড়ে আরো একটি ছোট ঘাড়িয়াল। এই ঘড়িয়াল নাকি গাইবান্ধার বিভিন্ন প্রর্দশনীতে প্রর্দশিত হবার পর শেষ পর্যন্ত জায়গা করে নেয় গাইবান্ধা কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের যাদুঘরে।

উপরের চারটি ঘাড়িয়াল ও তাদের ছানা ধরা পড়ার কাহিনীর বাইরে আরো ১৮টি ঘড়িয়াল ছানা ধরা পড়েছিল। দুটি বাদে তাদের বাকি সবাই মারা গেছে (চিত্র : ৩.৫২)। বিগত ১৯৮২-৮৩ সালে বৃহৎ একটি ঘাড়িয়াল রংপুরের গাইবান্ধা থেকে ঢাকা চিড়িয়াখানায় আনা হয়। সেটা পরে মারা যায়। গাইবান্ধা থেকে আনা দ্বিতীয় একটি ঘড়িয়াল (বাচ্চা) এখন চিড়িয়াখানায় এবং দুটি যুবতী রাজশাহী চিড়িয়াখানায় বেঁচে আছে।

ঘড়িয়ালের চারিত্রিক তথ্য (চিত্র : ৩.৪৬ এ ও বি)

ঘড়িয়াল আসলে মিঠা পানির খুবই লম্বাটে ধরনের কুমীর। এদের চোয়াল সব কুমীরের চেয়ে লম্বা। লেজের মাথা থেকে বর্ধিত চোয়ালের অগ্রভাগ পর্যন্ত একটি ঘড়িয়াল সর্বাধিক ৩০ ফুট লম্বা হতে পারে। বৃহৎ ঘড়িয়ালের চোয়াল চার-পাঁচ ফুট অবধি লম্বা হতে পারে। প্রতিটি চোয়ালের পার্শ্বদেশ সমান্তরাল যার পাশ ঘেঁষে প্রায় একই আকারের ৪৪ থেকে ৪৮টি দাঁত। দাঁতগুলো অনাবৃত। তাই মুখ বন্ধ থাকলেও দাঁতগুলো দেখা যায়। মাথা থেকে চোয়াল প্রথমে ক্রমশ সরু হয়। তারপর হঠাৎ করে চোয়ালের অগ্রভাগ বেশ মোটা এবং ভোঁতা হয়ে যায়। এই ভোঁতা চোয়ালের অগ্রভাগে পুরুষ ঘড়িয়ালের উপরের চোয়ালে, লোটা ঘটি বা কলসী আকৃতির ছোট একটু বর্ধিত অংশ থাকে। এই 'ঘড়া' বৎ অংশ এবং সম্ভবত চোয়ালের পূর্বাপর আকৃতি থেকে এই কুমীরের নাম হয়েছে ঘড়িয়াল। ইংরেজ সাহেবরা যাকে ভুল করে বলতেন 'গেভিয়াল' যেমন করে তাঁরা বলতেন ত্রিভেনেন্দ্রপুরাম কে ত্রিভেন্দ্রাম (বর্তমান ভারতীয় রাজ্য কেরালার রাজধানী) ঢাকাকে 'ডেক্কা', ইত্যাদি।

ঘড়িয়াল পানির বাসিন্দা (সত্যিকার অর্থে উভচর) হলেও শ্বাসের জন্য বায়বীয় অক্সিজেন দরকার হয় এর। তাই পানিতে থাকলেও এরা অহরহ ভেসে ওঠে। কুমীরের মতো ঘড়িয়ালের নাসারন্ধ্রের অবস্থান অতি চমৎকার। চোয়াল যেখানে শেষ হয়েছে তার সামান্য আগের প্রশস্ত অংশের উপরিভাগে দুটো ঢাকনাযুক্ত ছিদ্রই হচ্ছে নাসারন্ধ্র। যখন শ্বাস নেবার প্রয়োজন পড়ে তখন পুরো ঘড়িয়ালকে পানিতে ভাসতে হয় না ; কেবল নাকের ছিদ্রপথযুক্ত চোয়ালের সম্মুখভাগ জাগালেই চলে। শ্বাসের সময় আলগোছে ঢাকনা খুলে যায় এবং বাতাস ভেতরে ঢোকে। ঘড়িয়াল যখন পানিতে ডুবে তখন ঢাকনা ছিদ্র পথকে ঢেকে দেয় ফলে ওসময় কোনো পানি ঢুকতে পারে না।

ঘড়িয়ালের মুখের হা খুব দীর্ঘ। এদের জিহ্বা নিচের তালুর সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত ফলে টিকটিকি, গোসাপ এবং সাপের মতন এরা যখন-তখন জিহ্বা বের করতে পারে না। এদের কানের ছিদ্রপথের উপর একটি পর্দা থাকে যা ইচ্ছামতো খোলা ও বন্ধ করা যায়। ঘড়িয়ালের হাতে পাঁচটি এবং পায়ে চারটি করে আঙ্গুল আছে। ভিতরের দিককার তিনটি আঙ্গুল নখরযুক্ত। এদের চোখ দুটো যেনো মাথার ওপর। সে কারণে সমস্ত শরীর ডুবে থাকলেও নাকের মতোই চোখ দুটো পানির উপর রেখে ভেসে থাকতে পারে।

ঘড়িয়ালের পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে হাঁসের পায়ের মতো চামড়া থাকে। তবে হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে অমন চামড়া নেই। ঘাড় থেকে লেজের অগ্রভাগ পর্যন্ত সারি সারি চ্যাপ্টা বা খাড়া খাড়া শক্ত এবং কখনো কখনো প্রশস্ত আঁইশ বা শল্ক দ্বারা আবৃত থাকে।

লেজের মাঝখান থেকে অগ্রভাগ অবধি উপরের দিকে কেবল এক সারি খাড়া শক্ত আঁইশ আছে। লেজটি চিতল মাছের মতো চ্যাপ্টা হওয়াতে এটি শুধু সাঁতারেই নয়, হালের কাজে এবং মারামারিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত বয়স্ক পুরুষ ঘড়িয়াল মেয়ে অপেক্ষা কয়েক ফুট বড় হয়। পুরুষ ঘড়িয়ালের চোয়ালের অগ্রভাগে যে ঘড়াবৎ বর্ধিত মাংসপিণ্ড থাকে কেবল তার সাহায্যেই একে মেয়ে থেকে আলাদা করা যায়। বাকি সব চরিত্র একই ধরনের বলা যায়। বাচ্চা ঘড়িয়ালের রঙ বয়স্কদের চেয়ে উজ্জ্বল। বয়স্করা সাধারণত কালচে ধূসর। বালু ও কাদায় বাস করা কুমীর সঙ্গত কারণেই দেখতে বেশি গাঢ়।

স্বভাব

বর্তমানের ঘড়িয়াল বাস করে ফুলছড়ি ঘাট থেকে নগরবাড়ী ঘাট পর্যন্ত যমুনায় এবং সারদার কাছের চারঘাট এলাকা থেকে রাজশাহী শহর পেরিয়ে গোদাগড়ি পর্যন্ত পদ্মায়। যমুনাতে এদের কদাচ দেখা যায়। সারদা থেকে রাজশাহী শহর পর্যন্ত এলাকায় ঘড়িয়াল সর্বাধিক দেখা গেছে। লোকজনের উপস্থিতি কম থাকলে বা জেলেরা ও নৌকার মাঝিরা বেশি বিরক্ত না করলে ঘড়িয়াল প্রায় সারাদিন ধরেই বালুবেলায় পড়ে থাকতে ভালোবাসে। যখন দিনের বেলায় একাজের সুযোগ মেলে না তখন রাতেও বালুবেলায় উঠে আসে। বালুবেলায় শুয়ে থাকার সময় ঘড়িয়াল মস্তবড় হাঁ করার অভ্যাসটি কিছুতেই থামাতে পারে না। চোয়াল খোলার চেয়ে বন্ধ করার কাজটি বেশি কষ্ট সাধ্য বিধায় চোয়াল খোলা রাখাই শ্রেয়! চোয়ালের গোড়ায় যে মাংসপেশী আছে চোয়াল উন্মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা তালাচাবির মতো লেগে থাকে। ফলে চোয়াল খোলাবস্থায় ধরে রাখতে বেগ পেতে হয় না। সব কুমীরেই এ স্বভাব দারুণ প্রকট। এই হাঁ করার অভ্যাস নিয়ে প্রচুর গল্প প্রচলিত আছে।

খাবার

সব কুমীরের মধ্যে ঘড়িয়ালের চোয়াল মাছ ধরার জন্য সর্বাপেক্ষা যুৎসই। খাদ্যবস্তু হঠাৎ করে দুই চোয়ালের ফাঁকে, দাঁতের মধ্যে গেঁথে ফেলে। মাছ সে যত বড়ই হোক না শাড়াসীর মতো দাঁতের ফাঁকে একবার আটকে গেলে মরণ অবধারিত। মাছ মরে যাবার পর চোয়ালের বিভিন্ন ভঙ্গিমার মাধ্যমে তাকে সোজা করে মুখের ভিতর বসিয়ে গিলে ফেলে। ঘড়িয়ালের আবাসভূমির আশেপাশে যারা বাস করে তারা প্রায়ই ঘড়িয়ালের খাবার কৌশল অবলোকন করে। ঘড়িয়ালের প্রধান প্রাকৃতিক খাবার হচ্ছে আঁইশবিহীন মাছ ; মানে বোয়াল, আইর, গুজি, পাঙ্গাস ইত্যাদি। প্রকৃতিতে এসব মাছ আবার রাক্ষুসে এবং মাংসাশী মাছ বলে পরিচিত। এরা অবাধে নদীর রুই, কাতলা, কালবাউস ও মৃগেলের ডিম, পোনা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মাছ ধ্বংস করে। অতএব ঘড়িয়াল এসব মাংসাশী মাছ খাবার মাধ্যমে রুই-কাতলা জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক শত্রুকে ধ্বংস করছে এবং পক্ষান্তরে এসব দামি মাছের ফলন বাড়াতে সহায়তা করছে। মাদ্রাজের রমুলাস-হুইটেকার নামক সরীসৃপবিদ তামিলনাড়ুর বিভিন্ন হ্রদে এক পরীক্ষার মাধ্যমে এ সত্য উদঘাটিত করেছেন।

প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি (চিত্র : ৩.৫২ ও ৩.৫৩)

ফাল্গুন চৈত্র মাসে এক ঘড়িয়াল কর্তৃক অন্য ঘড়িয়ালের ঘাড় কামড়ানো এবং একে অপরকে কৃত্রিম ধাওয়া করা থেকে বুঝতে হবে ওদের প্রজননের সময় হয়েছে। এসব পূর্ব রাগের পালা শেষ হয় পুরুষ ও স্ত্রী ঘড়িয়ালের দৈহিক মিলনের মাঝ দিয়ে। এ সময় মেয়ে ঘড়িয়াল হন্যে হয়ে খুঁজে বালু বহুল নদী পাড়। পদ্মা যমুনাতে এমন ধরনের জায়গার অভাব নেই। সুবিধামতো জায়গা বেছে নিয়ে ঘড়িয়াল প্রায়ই সেখানে রোদ পোহাতে উঠে। পেটের ভেতর ডিম বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বালু খুঁড়ে একটি দুতিন ফুট গভীর গর্ত করে মা ঘড়িয়াল। তাতে সে ৪০ থেকে ৫০টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়া শেষ হলে আশেপাশের বালু দিয়ে গর্তের মুখ ঢেকে দেয়। এই ধরনের ডিমবহুল গর্তকে ঘড়িয়ালের বাসা বলা হয়।

ঘড়িয়ালের ডিম লম্বায় প্রায় চার ইঞ্চির একটু ওপর আর ওজন প্রায় এক পোয়া। বড় রাজহাঁসের চেয়ে ঘড়িয়ালের ডিম বড় এবং ধবধবে সাদা। ঘড়িয়ালের ডিমের উভয় মাথাই প্রায় সমান। দেখতে অনেকটা বৃহদাকার ক্যাপসুলের মতো। ডিমের খোলস মসৃণ নয়। পাখির ডিমের চেয়ে কয়েকগুণ পুরু এদের খোলস। কারণ ঘড়িয়াল যখন ডিম পাড়বে তখন যেন এক ডিম আরেক ডিমের ওপর পড়ে ভেঙ্গে না যায় এবং যে দীর্ঘ সময় ধরে গর্তে থাকবে তখন যেন খরা বা শুষ্কতার কারণে ডিম শুকিয়ে না যায়।

ঘড়িয়ালের ডিমে মা বা বাবা কুমীরকে তা দিতে হয় না। গর্তের বালুর যে উত্তাপ তাতেই ডিম ফুটে যাবে। যেভাবে ডিমগুলো মা ঘড়িয়ালের পেট থেকে বের হয় ঠিক একইভাবে ডিমগুলোকে বাসায় থাকতে হয়। ঐ অবস্থায় সামান্য নড়-চড় হলেই ডিম আর ফুটবে না। ফলে সামান্য এদিক সেদিক হলেই ভ্রূণ ঘুরে যায় এবং ভেতরকার কুসুম ঘুলিয়ে যায়। এতে করে ভ্রূণের মৃত্যুই স্বাভাবিক। মুরগির ডিম বাসা থেকে সরালেও ভ্রূণের কোনো ক্ষতি হয় না। ঘড়িয়ালের হয় তাই চরবাসীরা যখনই গর্ত খুঁড়ে ঘড়িয়ালের ডিম বের করে নেন, তখনই ডিম বাচ্চা ফোটাবার অযোগ্য হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীরা বহু চেষ্টা করেছেন ঘড়িয়ালের ডিম ফোটাবার জন্য। সফল হন নি ঐ একই কারণে। এর ফলে প্রতিবছর কয়েকশ ডিম নষ্ট হচ্ছে। এটা ঘড়িয়ালের প্রাকৃতিক বংশবৃদ্ধিতে দারুণ বাধাস্বরূপ।

ডিমে তা দিতে না হলেও মা ঘড়িয়ালকে সদাই বাসার উপর বা আশেপাশে রোদ পোহাতে দেখা যায়। প্রতিদিন এতবার একই পথে ঘড়িয়াল বাসায় উঠে যে, মনে হবে বহুকাল ধরে হাঁটাহাঁটির ফলে যেমন পথ সৃষ্টি হয় এটিও তেমনি। ঘড়িয়ালকে বাসা পাহারা দিতে হয় নানান কারণে। এর প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো বাসার গর্ত পুনঃখনন করে বাচ্চা বের হবার পথ সুগম করে দেয়া। মা গর্তের মুখ খুলে না দিলে ডিম ফুটে বেরুনো বাচ্চা বালু চাপা পড়েই মরে যাবে।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে ডিম থাকবে মাটির নিচে বালুর ভিতর, প্রায় দুই ফুট নিচে। মা কুমীর থাকবে বাসার ওপর। অতএব সে কি করে টের পাবে কখন বাচ্চা ফুটবে? আমরা জানি মোরগ-ছানা যখন ডিমের ভেতর থেকে হবো হবো করছে তখন মুরগির বাচ্চার ওপরের ঠোঁটের ঠিক অগ্রভাগের উপরে ছোট একটি খাড়া দাঁতের মতো সৃষ্টি হয়।

এ দাঁত ডিমের ভেতরকার পর্দা কাটতে এবং খোলস ফাটাতে সাহায্য করে। ঘড়িয়ালের বাচ্চার ঠোঁটের ওপর অমনি এগটুথের (Egg-tooth) জন্ম হয়। বাচ্চা ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে বা কয়েক দিনের ভেতর এই দাঁত খসে পড়ে। ঘড়িয়াল ছানা যখন দাঁতের সাহায্যে ডিমের ঝিল্লি কাটার প্রাণপণ চেষ্টা করে তখন বাসা থেকে এক নাগাড়ে ৪০/৫০টি ডিম থেকে কট কট বা কুট কুট শব্দ ওঠে। একে বলে পিপিং। গ্রামের লোকেরা মুরগির ডিম কানের কাছে নিয়েও টের পায় মুরগির বাচ্চা ফুটবে কি ফুটবে না। ঘড়িয়ালের ডিমের বেলাও সে কথা প্রযোজ্য। মা ঘড়িয়াল এই 'কট কট' কারো মতে 'ঘোঁত ঘোঁত' শব্দ থেকে টের পায় বাচ্চা ফোঁটার সময় হয়েছে। সে বালু সরিয়ে বাসার মুখ খুলে দিয়ে সরে পড়ে অথবা বাসার পাশে বসে থাকে।

ঘড়িয়ালের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে ৬০ থেকে ৭৫ দিন সময় লাগে। যে বালুতে ডিম পাড়ে সে বালু কদাচ উত্তপ্ত হয়। বেশির ভাগ সময়ই স্যাঁতস্যাঁতে থাকে। সদ্যজাত বাচ্চারা বাসা থেকে বের হয়ে প্রাণপণে ছুট দেয় পানির দিকে। কোনো কোনো বাচ্চা আবার মা ঘড়িয়ালের পিঠে সওয়ার হয়েও কেউ কেউ পানি পর্যন্ত যেতে পারে। বাচ্চাদের প্রতি মায়ের দায়িত্ব থাকে প্রথম কয়েক সপ্তাহ। বাচ্চা মাকে অনুসরণ করে চলে। এরপর ঘড়িয়াল আপন ছানাকে চিনতে পারবে না। তাই যে কোনো ছোট বাচ্চা ঘড়িয়াল বড় ঘড়িয়ালের সামনে পড়লে তাকে খেয়ে ফেলার সম্ভাবনাই বেশি। সে জন্যই মাছের মায়ের মতো কুমীরের মায়েরও পুত্রশোক নেই। তাই বোধহয় ব্যাপক ব্যবহৃত হয় 'কুম্ভীরাশ্রু বা ক্রকোডাইল টিয়ারস।

বাচ্চা ঘড়িয়াল জন্মকালে ১০/১২ ইঞ্চি লম্বা থাকে। প্রথম দুতিন বছরে তাদের সর্বাধিক বৃদ্ধি হয়। এ সময় তারা প্রায় পাঁচ ফুটের মতো লম্বা হয়। এদের বার্ষিক বর্ধন গড়ে ৮/১০ ইঞ্চি। চার-পাঁচ বছরের মাথায় একটি ঘড়িয়াল প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। অন্যদিকে মিঠা পানির কুমীর প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে ১০/১২ বছরে, লোনা পানির কুমীর ১২-১৫ বছরে। ঘড়িয়াল এক নাগাড়ে ৩০-৩৫ বছর ধরে প্রজননে অংশ নিতে পারে। সাধারণত লাজুক প্রকৃতির হলেও প্রজনন ঋতুতে ঘড়িয়াল যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দেয়। বাসা পাহারার সময় গ্রামের রাখাল বালক এমন কি ধারি লোকজনও যদি বাসার কাছে যায়, তবে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে বা কামড়ে ধরতে মা ঘড়িয়াল কম যাবে না। চরবাসীরা বলেন এ সময় তারা প্রায়ই চড়াও হন ঘড়িয়ালের ওপর। তখন শত ঢিল খেয়েও মা ঘড়িয়াল বাসা ছেড়ে পালায় না। প্রজনন ছাড়া অন্য সময় মানুষ কাছে গেলেই ঘড়িয়াল ডাঙ্গা ছেড়ে পানিতে ডুবে যায়।

চর খিদিরপুরে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত যে তিনজনকে ঘড়িয়াল আক্রমণ করেছিল তারা তিনজনই উন্মুক্ত আকাশের নিচে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে যেখানে পানি ব্যবহার করতে যান সেখানে তাদেরকে কামড়ে দিয়েছিল। একজনকে হাতে এবং দুজনকে শরীরের মাংসাল অংশে। এরা তিনজন একই পরিবারের লোক এবং সবাই সুস্থ। নদীর যে অংশে গভীর, পাড় খাড়া সেখানেই খেয়া ঘাট, গোসল করার এবং গরু-ছাগল পরিস্কারের জায়গা। এবং ওসব জায়গার কাছেই ঘড়িয়াল বাসা করে বেশির ভাগ সময়। মানুষ এবং ঘড়িয়ালের অবস্থান শান্তিপূর্ণ না হলে এরা সবাই একই পানি ব্যবহার করতে পারত না।

ঘড়িয়ালের শত্রু ও বিলুপ্তির কারণ

ঘড়িয়ালের এক নম্বর শত্রু মানুষ। দুই নম্বর এবং প্রাকৃতিক শত্রু ঘড়িয়াল নিজেরাই ও অপরাপর কুমীর। মানুষ ঘড়িয়ালের চামড়া দিয়ে জুতা, সেণ্ডেল, ভ্যানটি ব্যাগ, মানি ব্যাগ ইত্যাদি বানায় ; মাংস খায়, বাসা ভেঙ্গে দেয়, ডিম নষ্ট করে, বাচ্চা মারে, জাল পেতে জ্যান্তগুলোকে ধরে অথবা গুলি করে বা হারপুনের সাহায্যে হত্যা করে আনন্দ পায়। এছাড়া অফিসার এবং ধনীক শ্রেণী যে জীবনে কত কুমীর মেরেছে তার তালিকা বাড়াবার জন্যই কেবল ঘড়িয়াল শিকারের উন্মত্ত নেশায় মেতে উঠে। ইদানিং বন্দুক দিয়ে শিকারের হার কিছুটা কমে গেছে। অন্যদিকে নাইলন জালের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ফাঁসি জালে বেঁধে ঘড়িয়ালের মৃত্যু হচ্ছে। শহরের আশেপাশে এমনি ধরনের মৃত্যু হলে লোকে জানতে পারে। বাকি সমস্ত খবরই বেমালুম চাপা পড়ে যায়। নাইলন জালে প্রথম বাধা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িয়াল প্রাণপণে ঝাপাঝাপি শুরু করে। এর ফলে সে আরো বেশি করে জালে পেঁচিয়ে যায়। অনেক সময় চরে জাল শুকাতে দিলে তাতে রোদ পোহাতে উঠেও ঘড়িয়াল আটকে যায়। পানির নিচে দুঘন্টার পর থাকা সম্ভব হয় না বিধায় জালে পেঁচিয়ে গেলে শ্বাস কষ্টে এরা মারা যায়।

পারতপক্ষে ঘড়িয়ালের কোনো প্রাকৃতিক শত্রু নেই। ঘড়িয়াল ছানা ঘড়িয়ালের, শিকারি পাখি, মাছ মুরাল, কুমীর এবং বোয়াল জাতীয় রাক্ষুসে মাছের পেটে যেয়ে মারা পড়তে পারে। তবে বড় ঘড়িয়াল বা বড় কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা নেই। একই জলায় এরা শান্তিপূর্ণভাবে সহ-অবস্থান করে। বার্ধক্যজনিত কারণে ঘড়িয়ালের মৃত্যু হয়।

ভারতের ফারাক্কা বাঁধের ফলে এবং মেঘালয় ও আসামে ব্যাপকহারে বনরাজির ধ্বংসের ফলে পাহাড়ি ঢলে বয়ে আনা বালু ও পলিমাটি পদ্মা ও যমুনাতে ব্যাপক জায়গা জুড়ে চর সৃষ্টি করেছে এবং পানির গভীরতা কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে যেসব জায়গায় বোয়াল আইড় ও পাঙ্গাস মাছের বাতান ছিল সেগুলো বিলীন হয়ে গেছে। খরা মৌসুমে এক নদীর বিভিন্ন এলাকার ঘড়িয়াল একত্রিত হতে পারে না। বিশেষ করে প্রজনন ঋতুতে একত্রিত না হবার ফলে 'জেনটিক এক্সচেঞ্জ' সম্ভব হচ্ছে না।

ব্যাপক জায়গা জুড়ে চর পড়ার ফলে বিশাল জনগোষ্ঠী চরে গিয়ে বাসা বাঁধছে এবং আবাদ করছে। এতে ঘড়িয়ালের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। নদীর যে অংশে ঘড়িয়াল বাস করছে সেই অংশে অপরিকল্পিত এবং মাত্রাতিরিক্ত মৎস্যসম্পদ আহরণ জেলেদের বা তাঁদের নৌকার ঘন ঘন আনাগোনা ঘড়িয়ালের সাধারণ জীবনযাপনের বাধাস্বরূপ।

বিস্তীর্ণ এলাকায় চর পড়ার ফলে নদীর যে পাড় খাড়া সে পাড়েই ঘড়িয়াল বাসা বাঁধে বেশি। এর দুটি প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে। প্রথমত বাচ্চা বের হয়েই ধারে কাছে পানি পায়। দ্বিতীয়ত পাড় খাড়া হবার ফলে বাসার কাছে শত্রুর আনাগোনা কম হবে। আর স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী নদীর যে পার খাড়া সে পাড় ভাঙ্গে বেশি। ঘড়িয়াল বাসা বাঁধার পরপর যে বৃষ্টি হয় তাতেও অনেক সময় পাড় ধসে পড়ে বাসা ও ডিমের ক্ষতি হয়।

চিত্র ৩.৪৬ : মিঠাপানির কুমীরের মাথা ও চঞ্চু

চিত্র ৩.৪৭ : মিঠাপানির কুমীর Crocodylus palustris.

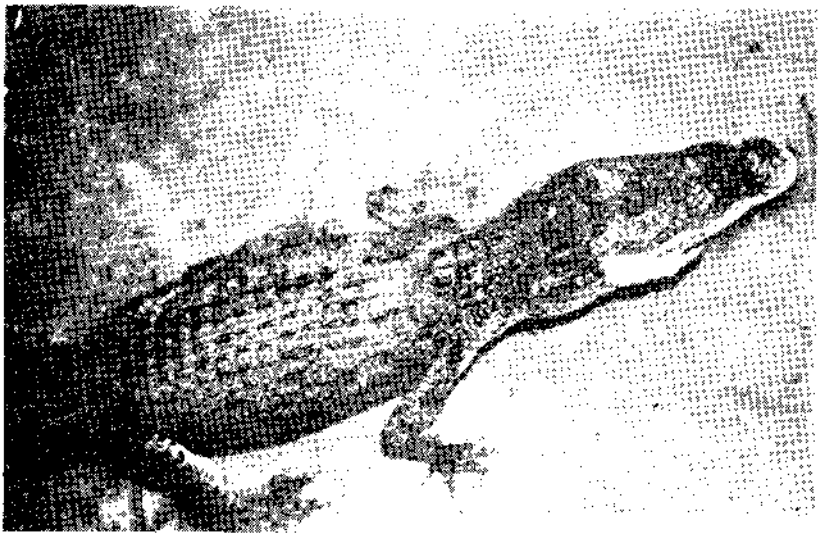

চিত্র ৩.৪৮ : লোনাপানির কুমীরের চোখের পিছন দিক, ঘাড় এবং পিঠের কাটা দর্শনীয়

চিত্র ৩.৪৯ : লোনাপানিরকুমীর Crocodylus porosus.

চিত্র ৫.৫০ : ঘড়িয়াল Gavialis gangeticus (বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল)

চিত্র ৫.৫১ : ঘড়িয়াল ছানা

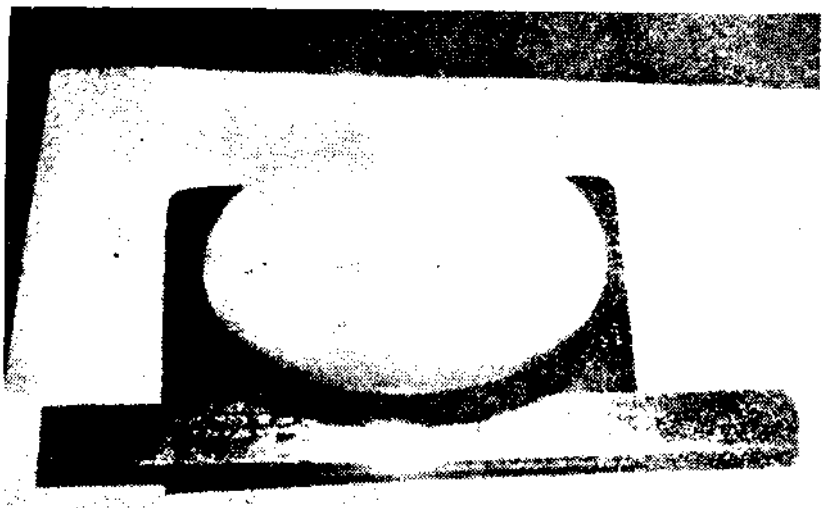

চিত্র [illegible] : ঘড়িয়ালের ডিম : [illegible] থেকে সংগৃহীত (১৯৮[illegible]

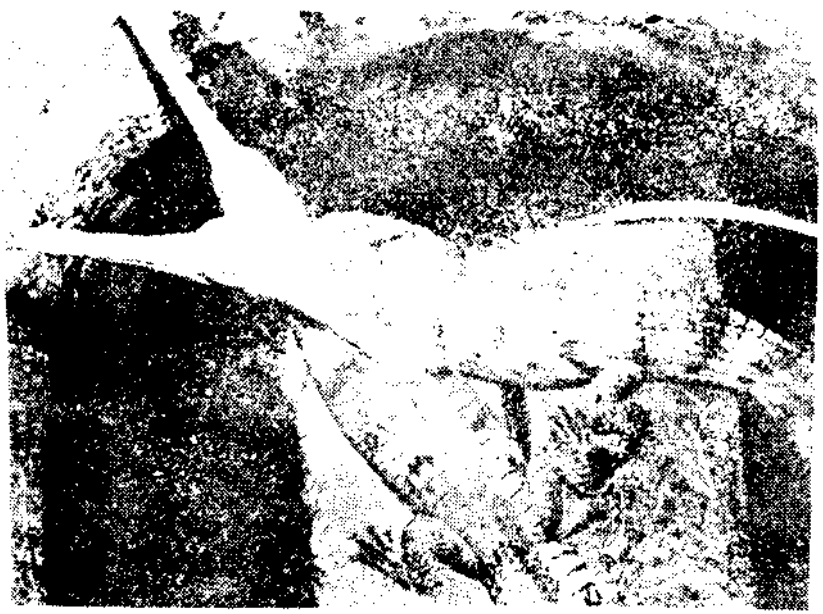

চিত্র [illegible] : রাজশাহী চিড়িয়াখানার পানির ড্রামের ভিতর দুটি ঘড়িয়ালছানা ([illegible]) [illegible]
১৯৮৫ সালে বাচ্চা দুটিকে হ্রদে ছাড়া হয়।

এখন মনে হয় আমাদের পদ্মা থেকে ঘড়িয়াল লুপ্ত হয়েছে। কেবল যমুনার কোনো অংশে এক–দুটি থাকতেও পারে।

বিলুপ্তি রোধের উপায়

আমাদের পাশের দেশ ভারতের উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং তামিলনাড়ু রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় ভারত সরকার এফ. এ. ও এবং ইউ. এন. ডি. পি'র যৌথ উদ্যোগে 'ঘড়িয়াল পুকুর' তৈরি করেছে। এর উদ্দেশ্যে দ্বিমুখী। কয়েক জোড়া ঘড়িয়াল ঐ পুকুরে পেলে বড় করে যাতে করে ওখানেই ঘড়িয়ালের বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। পরে এসব ঘড়িয়াল নদী–নালায় ছেড়ে দেয়া। দ্বিতীয়ত ঘড়িয়ালের বাসা থেকে সকল ডিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে 'ঘড়িয়াল পুকুরে' এনে বাচ্চা ফোটানো। বাচ্চাগুলো বড় হলে প্রাকৃতিক আবাসে ছেড়ে দেয়া। ভারতে গত তিন–চার বছরে হাজার খানেকের ওপর বাচ্চা ফুটেছে এবং সেগুলো এখন ঘড়িয়াল পুকুর থেকে প্রাকৃতিক স্রোতে ছেড়ে দেয়ার অপেক্ষায় আছে। ঘড়িয়াল পুকুরে ঘড়িয়ালের সংখ্যা যত বাড়বে এর ব্যবহারিক দিকটিও তত উজ্জল হবে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘড়িয়াল ছেড়ে বয়োবৃদ্ধ ঘড়িয়াল ধরে বা মেরে তাদের চামড়া বাজারজাত করা যেতে পারে। মাংস বিক্রি করাও সম্ভব।

ঘড়িয়াল পুকুর সৃষ্টি ছাড়াও নদী বা হ্রদের ঘড়িয়াল —বহুল এলাকা অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। ওখানে ঘড়িয়ালের কোনো রকম ক্ষতিসাধন ও জীবন–যাপনে বাধার সৃষ্টি আইনত দণ্ডনীয়। ওসব অভয়াশ্রমে গেলে ঘড়িয়াল দেখা যাবে, এ ধারণা জন্মাবার ফলে প্রতিদিন দর্শনার্থী বিশেষ করে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এসব অভয়াশ্রম স্বর্গপুরী বৈকি।

উপরের কোনো ব্যবস্থাই বাংলাদেশে বিদ্যমান নেই। এর মূল কারণ বোধহয় ঘড়িয়ালসহ অপরাপর প্রাণী সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের বনবিভাগে "বিজ্ঞজনের" অভাব। বন বিভাগের আওতায় বেড়ে ওঠা সতীন–পুত্রের মতো 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ শাখা'র অকর্মণ্যতা এবং মাতৃ বিভাগের বিমাতা সুলভ মনোভাব এর জন্য কম দায়ী নয়। 'বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন—১৯৭৩' ঘোষণা করার মাধ্যমে বন বিভাগ মনে করেছেন তাদের দায়িত্ব শেষ এবং ঐ আইন দেশের সকল বন্যপ্রাণী বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র 'রক্ষা কবচ'। বনবিভাগ বন সামলাতেও হিমসিম খাচ্ছে। বনের মধ্যের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ 'গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার' মতো। তা বনের বাইরের জীবজানোয়ার সামলাবে কে? তাই চর মোক্তাপুরের বা চর খিদিরপুরের লোকদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে ঘড়িয়ালের ডিম ও বাচ্চা ধ্বংস করা। মানুষ যদি ঘড়িয়ালের ডিম ও বাচ্চা না ধরে এবং বাসা ধ্বংস না করে, জালে বেধে গেলে ঘড়িয়ালকে ছেড়ে দেয়, তবে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে ঘড়িয়ালের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ইত্যবসরে চরাঞ্চল থেকে ঘড়িয়াল ডিম সরীসৃপবিদদের সহায়তায় তুলে এনে কৃত্রিমভাবে ফুটিয়ে বাচ্চাগুলোকে লালন পালন করে নদীতে ছাড়ার ব্যবস্থা নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রতি বছর প্রজনন ঋতু শুরু হবার আগেই পদ্মা ও যমুনার চরে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে ঘড়িয়াল সমৃদ্ধ এলাকা খুঁজে বের করতে হবে। ফাল্গুন চৈত্র মাস থেকে গবেষক

দল প্রেরণের মাধ্যমে ডিম সংগ্রহ করে এনে গবেষণাগার বা গবেষণা পুকুর পাড়ে ডিম ফোটাবার ও বাচ্চা লালনের বাস্তব কর্মসূচি নিতে হবে। এসবের জন্য অর্থ যোগান দিতে পারে বন বিভাগ, মৎস্য বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। দেশের বাইরে থেকে পাওয়া যেতে পারে 'ফাও ; ইউ. এন.ডি.পি এবং আই. ইউ. সি. এন বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ' ফাণ্ড থেকে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. AHAMED, N , 1955. On edible turtles and tortoises of East Pakistan, Directorate of Fisheries, East Pakistan p. 18.

২. DANIEL, J, C, 1983. The book of Indian reptiles. Bombay natural History Society, India.

৩. HUSAIN, K. Z. 1974. An introduction to the Wildlife of Bangladesh. F. Ahamed, Dhaka.

৪. KHAN, M.A.R. 1980 A 'Holy' Turtle of Bangladesh, Hornbill 1980 (4) : 7-11.

৫. " 1982.a Chelonians of Bangladesh and their conservation, J. Bombay. Nat. Hist. Soc. 79 (1) : 110-116.

৬. " 1982b. Wildlife of Bangaldesh-a checklist. Dhaka University, Bangladesh.

৭. " 1982c Present Status and distribution of Crocodiles and Gharial of Bangladesh. Country Report CROCODILES. IUCN/Switzerland, p. 229-236

৮. OLIVIER, R.C.D. 1979. Wildlife conservation and management in Bangladesh. Report. F.A.O. Rome, vii+148 pp.

৯. PRITCHARD.P.C.H.1979. Encyclopaedia of Turtles, T.F.H. Publications. Neptune, N.J., U.S.A.

১০. SMITH, M.A, 1931-43. The Fauna of British India, Ceylon and Burma, including the whole of the Indo Chinese Sub Region. Reptilia and Amphibia, 3 vols. (Does not include amphibians), Taylor and Jackson, London.

১১. WHITAKER, R. 1978. Common Indian Snakes, Mac Millan co, India Ltd.

১২. মিত্র, শ্রী, শ, না: ১৯৫৭, বাংলার শিকার প্রাণী। সরকারী মুদ্রণালয়, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

১৩. রহমান, রেজাউর ১৯৮৫, সাপ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৪. শফি, মোঃ এবং কুদ্দুস, মি, মোঃ আঃ ১৯৭৭, বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ। বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা ৩/(২) : ১৪-৩৬।

১৫. হোসেন, কাঃ জাঃ, ১৯৭৯, বাংলাদেশের বন্যজন্তু সম্পদ ও তার সংরক্ষণ। বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা। ৫/(৩) : ২৯-৩১।

১৬. খান, মোঃ আঃ রে, ১৯৯২, বাংলাদেশের সাপ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৭. DAS, INDRANEIL, 1994. The Reptites of South Asia : checklist and distributional symmary. Hamadryad. 19 : 15-40.

১৮. INGER, R. F. and DUTTA, S.K. 1987. An overview of the Ampihbian Fauna of India. J. Bombay. nat. Hist. Soc. 83 : 135-145.

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

অ
অকৃত্রিম ১
অক্টোবর ৩৩
অক্সিজেন ৮,২২,৪২,৪৫
অক্ষাংশ ৩
অক্ষিগোলক ১২০
অঙ্কুর ৮
অঙ্কুরোদগম ৮
অগ্রপদ ৪৫
অঙ্গুলিনলক ৪৮
অজগর ১০৭
অর্জুন ৬
অজৈব ৩৩
অধ্যাপক (কাজী জাকের) হোসেন ৪৬,১১৯,১৪৭
অধ্যাপক ইউসুফ আলী ১৪৬
অধলিঙ্গ ১৪০
অধিলেজ ৬০
অধিলেজুর ৬৩
অপকারী গাছ ৭
অফিওফাগাস ১২৯
অফিস ২
অফিডিয়া ৪২
অবসারনী ছিদ্র ৩৪,৪৫
অভিনিবেশ ৩৪
অভভিভিপেরাস ১৩০
অভিযোজন ২২,৪২,৪৫
অমেরুদণ্ডী ১
অয়েল পাম ৮
অরকিড ৬,৭
অলিন্দ ২২
অলিভ রিডলে টারটল ৭৬,৭৮
অশোক ৪,৭
অশ্বত্থ ৪,৬
অস্ট্রেলিয়া ১৩১,১৪৭

আ
আইনগত ৩
আঁইশ ৪২
আই. ইউ. সি. এন ১৬২
আকৃতি ১
আগস্ট ৩৪
আগাছা ৫,৮
আঙ্গুল ২,৩,৪৫
আঁচিলা ৮৩
খাটোপা –৯১
পাহাড়ি–৯২
আজুলী ৪
আত্মরক্ষা ১
আদি কড়ি কাইট্টা ৬০
আদ্রতা ৪
আনজন (আঞ্জন) ৪২,৮৩,৮৪,৯১
ছোট–৮৪,
সরু–৮৪,৯২,
সিকিমী– ৯২
আন্তর্জাতিক ১
আফ্রিকা ৬৩
আবাসিক পাখি ১৮
আম ৪
আমরা ৪
আমাজন ১৪৯
আমুর ১৭
আমলকী ৪,৭
আমেরিকা ৭৬

আরপাঙ্গাসিয়া ১৭
আলম্ব ৮
আলুবোখারা ৬১
আলমারি ৮৫
আরাকান রাস্তা ৬১
আশ্রয় ১
আসাম ৬৩,১৫৬
আসাম লতা ৫,৭
আহমেদ ৬০
আড়তদার ৮১

এ
একুরিয়াম ৫৮
এগামিডী ৮৩
এগটুথ ১৫৫
এনডেমিক ১২০
এনসাইক্লোপিডিয়া অফ টারটলস ৪৪
এন্টিভেনম ইনজেকশন ১২৯
এন্টিভেনম সিরাম ১২৪
এপিডারমাল ৪৩,৪৭
এপ্রিল ৭২
এফ্রডন্ট ৮৩
এলিগেটর ১৪৮
এশিয়াটিক বক্স টারটল ৬১

ই
ইউ. এন. ডি. পি ১৬২
ইকোসিস্টেম ২১,৩৩
ইদুর ৩, ১৯,৩৯
ইদুরের গর্ত ১২৩
ইগুয়ান এগ-ইটার ১১৮
ইন্দোনেশিয়া ৫৭
ইন্দ্রনীল দাশ ৬২
ইটের ফাঁকে ২৪
ইমাইডিডী ৪৬, ৪৭
ইম্ব্রিকেট ৮৮, ৯১, ১০৬
ইরি ধান ২১
ইরিটমোকেলিস ইমব্রিকেটা ৭৫
ইলাপিডী ১২০
ইলাপিনী ১২০
ইলাস্টিক লিগামেন্ট ১০৩
ইয়োলোস্পেকটেকল্ড উলফ স্নেক ১০৯
ইংরেজী ২১

উ
উই ৩৭
উত্তর ৩
উত্তর বঙ্গ ৯১
উদবিড়াল ২১
উদাল ৬,৮
উদ্দীপক ৩৩
উদ্ভিদ ১, ৬, ২১
উদ্ভিদবিদ্যা ৩৩
উপকূলীয় খণ্ডবন ১৭
উপকূলবর্তী সাপ ১৮
উপজাতীয় ৪৬
উপপল্লব ৮৩
উপবর্গ ৪২,১০৩
উপরিস্তর ৫,৬
উভচর ৪১
উভচর প্রাণী ২২,২৪
উরিআম ৬
উরীঘাস ১৯
উরু ২২
উলু ১৭
উল্লুক ৬
উড়ন্ত কাঠবিড়ালী ১১৬

ও
ওঝা সম্প্রদায় ১৪৩
ওভোভিভিপেরাস ১১৩
ওরা ১৭
ওরিনোকো ১৪৮
ওয়াইকং ৬০,১১৬
ওয়াইল্ড লাইফ ১

ওয়াইল্ড লাইফ অফ বাংলাদেশ : এ চেকলিস্ট ২৪
ওয়ার্ম স্নেক ১০৬
ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড ১৬২
ওয়েটল্যাণ্ড ২১

ক
কক্সবাজার ৫, ৬০, ৭৬, ১১৩
কচু ৬
কচ্ছপিয়া দ্বীপ ৭৮
কদম ৪
কর্দমাক্ত ৮
কর্দমাক্ত সমভূমি ১৮
কর্ণপটহ ৮৩
কর্ণফুলী ১৪৭
কর্নিয়াম ৪৩
কমন স্নেকস অফ ইণ্ডিয়া ১০৫
কবুতর ২
করঞ্জ ১৭
কলা ৭
কলিকাতা ৬২
কড়ই ৪, ৬, ৮
কান্তা–, ৪
চাকুয়া–, ৪
শীল–, ৪
কচ্ছপ ৪২, ৪৪, ৬৩
কাইট্রা– ৪২, ৪৪, ৪৭, ৪৮
কড়ি–, ৫৭, ৫৯
কালি–, ৪৮
কালো–, ৬২
বড়–, ৫৯
বড় কড়ি–, ৫৭
ভাইটাল–, ৫৭, ৫৯
মাঝারি–, ৫৭,৫৯
সিলেটি–, ৬০
স্মিথের–, ৫৯
হলদে–, ৬২
কাইমান ১৪৯
কাকলাস ৮৯
কাকড়া ১৭, ৩৯
কাকড়াভুক বান্দর ১৮
কাচুগা ৫৯
কাচুগা সিলেটেনসিস ৫৭
কাছিম ১৯, ২১, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৮১
কাছিম বর্গ ৪৪
কাজী জাকের হোসেন ২৩
কাঞ্চন ৭
কাঠ বিড়ালী ৩
কাদাখোচা ১৮,২০
কানাডা ৭৬
কানের পর্দা ৮৩
কামড়, কাল কেউটের ১৪৪
–গোখরার ১৪৪
–চন্দ্রবোরার ১৪৫
কালিঙ্গা ৫
কালি বাঁশ ৭
কালো গুই ৯৩
কালোমেঘা ১১৩
কার্বন–ডাই অক্সাইড ২২, ৪২, ৪৫
কাশ ৮
কাপ্তাই হ্রদ ৮২
কেওরা ১৭, ১৮
কেওয়াকান্তা ১৮
কেজি (কিলো) ৪৬, ৪৮, ৬০, ৬১
কেঠো ৫৮
কেমেলিয়ন ৯০
কেরেটা কেরেটা ৭৬
কোনা ব্যাঙ ৩
কোরাল ট্রি ১২৫
কোরাল স্নেক ১২৫
কোবরাক্সিন ১২৮
কিলোনিডী ৪৬,৭৫
কিলোনি অ্যামবয়নেনসিস ৭৫
কিলোনি ইমিস ৭৫

কিলোনিয়া ৪২
কিলোনিয়া মাইডাস ৭৬
কিলোমিটার ৩
কিংবেদন্তি ১৩৪
কীট-পতঙ্গ ৩৬
কেস্টানপসিস ৭
কুকরি মুকরি ১৯
কুকুর ২
কুকুর জিভ ২৪
কুঙ্গা ১৭
কুচি ৫
কুতুবদিয়া ১৯, ৭৬
কুদুম গুহা ৬০
কুমারিকা ৫,৭
কুমির (কুমীর)-১৮, ৪২, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯
-মিঠা পানির-, ১৪৭
-মেছো-, ১৫১
-লোনা পানির-, ১৪৭
-কুমীর-চেনা ১৪৮
-পৃথিবীর-১৪৮
-বর্তমান অবস্থান ১৪৯
-বিশারদ ৩৭, ১৫১
-শিকার ১৫০
কুমিল্লা ৪৮
কুম্ভী ৪,৮
কৃত্তিকা বর্ম ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫৮, ৬১, ৬৩
কৃপা ১৭
কৃষি বিজ্ঞান ৩৩
ক্যালসিয়াম ২৩
ক্রোকোডিলিয়া ৪২
ক্লীফোর্ড এইচ পোপ ১৫০
ক্রিসিমিস পিক্টা ৭৫
ক্রোমোটোফোর ৮৯

খ

খলসী ১৭
খয়ের গাছ ১৯
খাগড়া ৮, ১৭
খাদ্য শৃঙ্খল ৩৩
খালুয়া কাছিম ৭৩, ৭৪
খাসিয়া পাহাড় ৬০
খেজুর ২
খোকসা ৭
খোরমা ৬১
খ্রিস্টান সম্প্রদায় ৪৬, ৫৭, ৫৮, ৭৯

গ.

গঙ্গা কাছিম ৭৩
গজারী ৪,৭৪
গজারী বন ৪
গর্জন ৬, ৭, ৯
গণ্ডার ২১
গম ২
গড়, মধুপুর ৩,৪
গরু-মোষ ২
গরু-মোষ-ভেড়া-ছাগল ১৯
গলধঃকরণ ১০৩
গলবিল ৩৫
গল্লাবেত ৭
গ্লকিডিয়ন ৭
গবেষণা ১
গাছ ৪
গাছ আলু ৫
গাম ৭
গামারী ৬,৮
গারো ৪৬
গারো পাহাড় ১১৭
গালপ্যাগোজ ৬৩
গ্লাইড ৮৯
গ্লাস লিজ্জারড ৮৩
গ্লাই স্নেক ৮৩, ১০৪
গাংচিল ১৮
গার্সিনিয়া ৭
গেওয়া ১৭, ১৯
গেকোনিডী ৮৩
গোখরা সাপ ১৯
গোত্র কিলোনিডী ৭৬

গোরান ১৭, ১৮
গোলপাতা ১৭
গিরগিটি ৪২, ৮৩, ৮৮
জারডনের ৯০
সবুজ ৯০
গিরীবাজ ২
গ্রিন টারটল ৭৬
গুইসাপ ১৮, ২১, ৪২, ৬১, ৮৩, ৯২, ১০৩
গুই,–কালো ৯৩
–বড় ৯৩
–সোনা ৯৩
গুইল ৮৩
গুই গুটিয়া ৬
গুটি ৪২
গুটিকা ৩৬, ৬৩
গুলিন্দা ১৮
গ্রামীণ বন ২০

ঘ
ঘাস ২
ঘাড় ৪৫
ঘড়েল ১৫১
ঘড়িয়াল ৪২, ১৪৭, ১৫১, ১৫২
–মালয় ১৫১
ঘোড়া ২
ঘোড়ানিম ৫
ঘুঘলি ১৮

চ
চকোরিয়া ১৭
–সুন্দরবন ১৭
চট্টগ্রাম ৫, ৯, ১৯, ৩৭, ৪১, ১১৩
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৭৪, ৮৯, ১৩৩
চর–ওসমান ১৯
–কুকরী মুকরী ১৯
–খিদিরপুর ১৫৫
–জব্বার ১৯
–লক্ষী ১৯
চম্পা ৮
চব্বিশ পরগনা ১৭
চলন বিল ২১
চড়ুই ২৩
চা ৮
–বাগান ১১৯
চাকমা ৪৬, ৬০, ৭২
চান্দপাই ৩৮
চান্দুল ৬
চাপালিশ ৬
চামচিকা ৩, ১৯
চাল ২
চালা ৪
চাষী ৩৩,৩৪
চাষী–মজুর ৪৪
চিকা ৩, ৩৯
চিকিৎসা ৩৩
চিতি কাছিম ৭২
চিত্রা কাছিম ৭৫
চিত্রা হরিণ ১৮
চির সবুজ ৮
চিড়িয়াখানা ৫৭
চিংড়ি ১৮, ৫৮
চেকলিস্ট ৪৮
চোখাকৃতির ফোটা ৬২
চোষক ৩৫
চোয়াল ৪৫
চুলিয়া কান্তা ১৭

ছ
ছাগল ২
ছিম কাছিম ৪৪, ৭৫

জ
জগডুমুর ৬
জরায়ুজ ৮
জলখাসী ৪৪

জলছত্র মিশন ১২২
জলডোরা ২১
জলপাই ৬
জলপাই রঙা কাছিম ৭৮
জলভূমির বন ২১
জাকির হোসেন ৭৫
জাতা কাছিম ৭৫
জাপান ১৩১
জাপানি বিজ্ঞানী ৬১
জাম ৬, ৭
জামালপুর ৩,৪
জার্মান, পশ্চিম ১১০
জারুল ৪,৮
জালালী কবুতর ২,৩
জিওকিলোন ইমাইস (ইমিস) ৬৩, ৭৫
জিন ৭৪
জিনকেনবার্গ যাদুঘর ১১০
জিনজিরা (জিঞ্জিরা) দ্বীপ ১৮,৪৪
জির ১৭
জিহ্বা দিয়ে শ্রবণ ১৩৭
জীবিকা ১
জেলা –৪
–কুমিল্লা ৫
–জামালপুর ৪
–দিনাজপুর ৪
–নোয়াখালি ৫,৫৮
–টাঙ্গাইল ৩, ৪, ৮০
–ঢাকা ৪, ৫, ২১, ৫৮
–পটুয়াখালি ১৯
–রাজশাহী ২০, ৫৮, ৫৯, ৬০
–সিলেট ৫, ২১, ৩৩, ৭২
জেলে ৪৪
জে. সি. ডানিয়েল ৪৪, ১৫১
জুন ৩৮, ৪৫
জুলাই ৪৫
জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া ১০৭
জৈব ৩৩
জৈব পদার্থ ৮

ঝ
ঝাংগি ৩৮
ঝিঁঝি পোকা ৩৬
ঝোপঝাড় ৩
ঝুমকোলতা ৭

ট
টমি হিকিদা ৬১
টাট মেমোরিয়াল ক্যান্সার ইন্সটিটিউট ১২৮
টারজান ৬
টার্ন ১৮
টিকটিকি ৩, ১৯, ৪২, ৮৩
–উড়ন্ত ৮৩, ৮৮
–খসখসে ৮৪
–গোদা ৮৬
–ছোট ৮৬
–মসৃণ ৮৬
–গিরগিটি ৮৩
টেকনাফ ৫, ১৮
টেনাসসেরীম ৬১
টেস্টেড্ডু ৬৩
টেস্টুডিনিডী ৪৬, ৬২
টিনোসপোরা ৭
টোরা ১৭
টুন ৬
ট্রাইওনিক্স ৭৩
ট্রাইকেরীনাটা ৬১
ট্রাইজুগা ৬১
ট্রান্সগ্রেসিভ স্তর ৭
ট্রায়াসিক কালে ৪৫
ট্রায়োনিকিডী ৪৬, ৭২

ঠ
ঠেস মূল ৮
ঠাটারি বাজার ৪৮

ড

ডইয়া ৬
ডলু ৭
ডলু বাঁশ ৭
ডাকর ১৭
ডারমোকেলিস কোরিয়াসিয়া ৭৫
ডারমোকেলিডী ৪৬, ৭৫, ৭৯
ডাল ২
ডবা কচ্ছপ ৬১
ডিম ২৩, ৩৪, ৪১
ডম পাড়া ২২
ডম্বানু ৩৫
ড. পিটার সি. এইচ. প্রিচারড ৪৪
ড. ফরীদ আহসান ৭৪, ৮৯
ড,. যোসেফ ১২৪
ডা. সালাউদ্দিন ১৪৬
ডেরিস ৭, ১৭
ডোরা-সাপ ১৯, ২১
-,মেটে ৪২
-,জল ৪২
ড্রাকো ১১৬

ঢ

ঢাকা- ৪৮, ৭৪
-ক্যান্টনমেন্ট ১৪৬
-চিড়িয়াখানা ৫৭
-বিশ্ববিদ্যালয় ২৩, ২৪, ৩৩, ৭৬
-বিজ্ঞান যাদুঘর ১৫১
ঢাকি জাম ৮
ঢেকি শাক ৬
ঢাংমারি ২

ত

তক্ষক ৩৯, ৪২, ৮৭
তাপমাত্রা ১৭, ২৪
তারাপ ৫
তালি ৬
তেলশুর ৬
তেলাপোকা ৩৩
তেঁতুলিয়া ৪৪, ৯১
তুণ্ড ৪৮, ১৪৮

দ

দশম ৩৩
দক্ষিণ এশিয়া ৬৩
দারাজ ১৯
দারাল বাঁশ ৭
দাঁত ৪৫
দুলাহাজরা ৫
দি বুক অফ ইণ্ডিয়ান রেপটাইলস ৪৪
দিনাজপুর ৭৫
দীর্ঘতম সাপ ১০৮
দীপক মিত্র ১২৯, ১৪২
দৈনিক আজাদ ৮৯
দ্রাঘিমাংশ ৩

ধ

ধমনী ২৩
ধলেশ্বরী ৮০, ৮২
ধান ১, ১৯
ধূম কাছিম ৪৪, ৭৩, ৭৪

ন

নখরযুক্ত ৪৫
নটরডেম কলেজ ১২২
নদনদী ৩, ১৭
নবম ৩৩
নরসিংদী ৪৮
নলখাগড়া ৪, ৮
নাইলক্সিন ১২৮
নাজির আহমেদ ৪৬,৮১
নাম ৪৬
নাফনদী ১৮, ৪৪

নারায়ণগঞ্জ ৪৮
নারকেল ৮
নালিকা ৪৫
নাসারন্ধ্র ৮৩
নাসিরাবাদ কলেজ ৬১
নিউজিল্যাণ্ড ৪২
নিউ মার্কেট ৮৬
নির্মোচন ৮৩
নিরামিষাশী ৪৮
নিলয় ২২, ২৩
নিশাচর ২৪
নিশিন্দা ১৮
নিষেক ৩৪
নীলগিরি ২
নুনঝাউ ১৭
নুনিয়াকান্তা ১০
নুপসিয়াল প্যাড ৩৪
নুরুল হুদা ১০৩
নেত্রকোণা কলেজ ১২২
নোটন ২
নোয়াখালি ৬১

প
পটুয়াখালি ৬২
পট্টি, আঙ্গুলের ৮৫
পট্টিকা ৮৭
পর্দা ৮৫
পদ্মা ৫৯, ৬০, ৭৫
পর্বত ৩
পর্যবেক্ষণ ১
পরজীবী ৭
পরাস ১৭
পরিপাকতন্ত্র ৩৫
পরিবর্ধন ২২
পরিবেশ ১, ২, ৩
–পদ্ধতি ৩৩
–সাম্য ৮৬
পশু ২
পশুর নদী ১৭
–পশ্চাদপদ ৪৫
পশ্চিম বঙ্গ ১৭, ২৪
পশ্চিম ভানুগাছ ৫
পাখনা ২২
পাখি ২, ২০, ২১
–কাদাখোচা ২০
–পেলিক্যান ২০
–বক ২০
–বুলবুলি– ৩৯
–মদনটাক ২০
–পাতা ফড়িং ৩৮
পাতি হাঁস ২
পাথারিয়া ৫
পানিবাজ ৮
পাপুয়া নিউগিনী ১৪৭
পাবলাখালি ৭২
পা ২২
পা বিহনি ৪২
পাম ওয়েল বাগান ৬১
পাবলাখালি ৭২
পার্বত্য চট্টগ্রাম ৫,৭২
পা যুক্ত ৪২
পারথেনোজেনেসিস ১০৬
পারুয়া বাঁশ ৭
পালমোনারী শিরা ২২
পাহাড় ২
পাহাড়ি ৩
পাহাড়ি কচ্ছপ ৬৩, ৮০
পোকা–মাকড় ২২
পোষা ২
পিজিয়ন ২
পিতরাজ ৬
পিট ভাইপার ১১৯, ১৩৩
পিটালী ৬, ৮
পিপড়ে ৩৭

পিরামিড ৬০, ১১৪
পিড়কা ৮৪
পীর খান জাহান আলী ১৪৭
পুকুর ৩
পুনঃরপ্তানি ৪৫
পুরুষ ৩৪, ৩৫
পুলিশ ৪৫, ৪৬
পূর্ব পাকিস্তান ৪৫
প্রচলিত ধারণা ১৩৪
প্রজাতি ১, ২, ৩৬
প্রজনন ১, ২, ৩, ৫
–কাল ৩৫
–চক্র ৩৩
প্রতিকূলতা ১
প্রতিহিংসা ১৩৭
প্রিচারডের এনসাইক্লোপিডিয়া ৬১
প্রেমেন্টিস ১১৭
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ৩৯
প্রাকৃতিক ১, ২, ৩, ৪৪
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৪৪
প্রাথমিক চিকিৎসা ১৪৫
প্রাণিবিদ্যা ২৩
প্রাণিবিজ্ঞান ২৩
পুরোডল্ট ৮৩

ফ
ফতেহ্ গড় ৬২
ফনা (ফোনা) অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ৮৪, ১০৫
ফরেস্ট ১৭
ফড়িং ৩৮, ১১৭
ফাও ১৬২
ফাদার–টিম ১২২
–হমব্রিখ ১২২
ফার্ন ৬
ফার্মগেট ৪৮
ফারাক্কা ৮২, ১৫৬
ফ্ল্যাপ ৭২
ফ্ল্যাপশেল ৭২
ফ্লিপার ৭৬, ৭৯
ফেনা ২৩
ফেব্রুয়ারী ৩৩
ফ্রথ ২৩
ফুডচেইন ২২,২৩
ফুলকা ২২,৩৫
ফুসফুস ২২,৩৫
ফ্যাটাল ডোজ ১২০

ব
বই–পুস্তক ২২
বক্স টারটল ৬১
বক্ষস্ত্রান ৪৪, ৪৭, ৫৭, ৫৯, ৬১
বক্ষস্ত্রান কড়া ৭৪
বুকশেলফ ৮৫
বর্গ ৪৪
বট ৪,৬
বন ২, ৫, ৭
–উপকূলীয় ৪
–গজারী ৪
–গ্রামীণ ৩
–চির সবুজ ৩
–জলাভূমি ৩
–পাতাঝরা ৩, ৪
–মিশ্র ৩
–ম্যানগ্রোভ ৩, ৪
–শাল ৩, ৪
–বিভাগ ৩, ৮১, ৮২
–সার্কেল ৪
বনশ্রেণী অ্যাকুয়ার্ড ৩
–আনক্লাসড ৩
–খাস ৩
–প্রটেকটেড প্রাইভেট ৩
–ভেস্টেড ৩
বন–বাদাড়ে ১

BANBEIS Library

বন্যজীব ১
বন্যপ্রাণী ১, ৩, ২১
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ৮১, ৮২, ১১৫, ১৬১
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সার্কেল ৪০
বন্যশুকর ১০৮
বন মোরগ ৩
বর্মযুক্ত চামড়া ৪২
বরুনা ৮
বড় কেঠো ৫৭, ৫৯
বড়শী ৪৮, ৫৯, ৮০
বড় বাঁশ ৭
বল্গুরাজ ১১৭
বহিরাগত ৭
বহুরূপী ৯০
বাইদ ৪
বাওর ৩, ২১
বাঘ ২১
বাজ-ঠোটো ৭৮
বাথরুম ৮৫
বাটট্রেস ৮
বাটনা ৬
বাদুড় ১৯
বানর ১৯
বানর-হনুমান ৩৬
বান্দর ১৮
বান্দরবন ৪১, ৬৩
বাবুই ২
বাবুল ৫
বার্মা ২৪, ৬৩, ৭৮
বায়েজীদ বোস্তামী পুকুরের কাছিম ৪৭
বায়ুমণ্ডল ১১৯
বারিয়াঢালা ৮৬, ১২৪
বালুবোরা ১০৭
বাঁশ ৭
বাঁশীর সুরে ১৩৯
বাসিন্দা পাখি ১৯
বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা ৪৬, ১০৫, ১১৯, ১৪৭
বাংলাদেশ ১, ৪, ৫, ৮, ১৭, ১৮, ১৯, ৩৭, ৬১, ৬২, ৬৫, ৭৮
বাংলায় ১
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর দি এডভ্যান্সমেন্ট অব (অফ) সাইন্স ১১০
বাংলাদেশ জার্নাল অফ জুলজি ২৩
বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি ২৩
বাংলাদেশের সাপ ১০৪
বিভাগ ৩
বি. ডি. আর. ৪৬
বি. এন. এইচ. এস. ৪৭
বি. বি. সি. টেলিভিশন ১৪২
বিরল ১
বিলুপ্ত ১
বিলুপ্ত প্রায় ১
বিশারদ ৫
বিশ্রামগার ৮৬
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৬২
বিষদাঁত ১১৯
বিষ থলি ১১৯
বিষধর ১০৬
বিড়াল ২
বিক্ষোভ জাহির ৩৬
বিজ্ঞান যাদুঘর ৮৮
বেসিন ৮৫
বেঁজি ২১
বেঙ্গল কেমিক্যালস ১৪২
বোর্নিও ৬৩
বোলা ১৭
বোম্বে নেচারাল হিস্ট্রী সোসাইটি ৪৭
বোম্বের হফকিন্স ইন্সটিটিউট ১৪৬
বোয়াল ১৫৬
বুলবুলি ৩৯
বুনো মোষ ২১

বুনোহাঁস ২০
বুদ্ধ নারিকেল ৬
ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ৪৫
ব্রিটিশ মিউজিয়াম ১১৮
বৈজ্ঞানিক ১
বৈজ্ঞানিক অফিসার ৪০
বৈজ্ঞানিক নাম ৪৬
বৌদ্ধ ৪৬
ব্যাণ্ডেড উলফ স্নেক ১০৮
ব্যাণ্ডেড রেসার ১১৪
বৃহত্তম কাছিম ৭৯
বৃষ্টিপাত ৪
ব্যাঙ ১৯
–কটকটি ৩৮
–কোনা ২৩, ৩৭, ৩৯
–কুনো ২৩, ২৯, ৩৩, ৩৪
–খসখসে ২৪
–গাছ ৪০
–গেছো ৪১
–গেছো খসখসে ২৪, ৩৩
–চীনা ৩৬, ৪০
–ছ, আঙ্গুলে ৩৮
–ঝিঝি ৪০
–পানা ৪০, ৪১
–পুরুষ ৩৪, ৩৫
–ফোটকা ৩৭
–বেলুন ৩৭
–ভাউয়া ২৩, ৩৭
–ভেঁপু ৩৭
–মসৃণ ৩৭
–লাল চীনা ৩৬
–স্কীপার ৩৮
–স্ত্রী ৩৪, ৩৫
–ব্যাঙাচি ৩৩, ৩৫ ৩৯

ভ
ভদ্রা ১৭
ভাইপারিনী ১৩১
ভাইপারিডী ১৩১
ভাদল ১৭
ভানুগাছ ৫
ভারত ৮২
ভারতীয় ১৭, ৩৭, ৬১, ৬২
ভারতবর্ষ ৪৫
ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ৬৩
ভিটিস ৭
ভেরানিডী ৮৩, ৮৪
ভেড়া ২
ভুবন চিল ১২২
ভুমারীগোনা ৫
ভূগোল ৫
ভৌগলিক ৫
ভোঁদর ২১

ম
মগ সম্প্রদায় ৭৭
মগজ ২২
মঠ গোরান ১৭
মধুপুর জাতীয় উদ্যান ৩৭
মনপুরা ১৯
মনিটর ৮৪
ময়মনসিংহ ৮০
ময়ূর ১০৮
মশা ৩৩, ৪০
মস ৬
মহেশখালি ১৭, ১৯, ৭৬
মৎস্য বিভাগ ৪৬, ৮১, ১৬২
মৎস্য শ্রেণী ২২
মাইওগ্লোবিন ৪৫
মাকড়সা ৩৩
মাগুর ৪০
মাছ ১
মাছ মুরাল ১৫৬
মাতামুহুরী ১৭

মাদাগাস্কার ৬৩
মাদারী ৭৪
মাদ্রাজ ১১৩
মাদ্রাজ কুমীর খামার ১২২
মাদ্রাজ স্নেক পার্ক ১২২
মানিকগঞ্জ ৮০
মানুষ ১
মালঞ্চ ১৭
মালয়দেশীয় ৮
মায়াহরিণ ১০৮
ম্যানগ্রোভ বন ৮, ৯
ম্যাকুলেটাস ৮৮
মেকরাঙা ৭
মেক্সিকো ৭৫
মেঘালয় ১৫৬
মেরুদণ্ড ৪৫
মেরুদণ্ডী ১
মেলানোকেলিস ট্রাইকেরীনাটা ৬০
মোজ ৮
মোঃ শফি ৪৬
মোনতাকিম ১০৫, ১০৬, ১৩০
মোমেনশাহী ৪, ২১, ৬০, ৬২
মোষ ১৮
মোহনা ৩
মটসেফ ২৪, ৮৫
মতিঙ্গা বাঁশ ৭
মিনজিরী ৪
মিলিমিটার ৪
মিয়া মোঃ আব্দুল কুদ্দুস ৪৬, ১৩০
মীরপুর চিড়িয়াখানা ১৪৭
মুক কীট ৩৯
মুকুলের মাহফিল ৮৯
মুনিয়া ৬১
মুরগী ৪০
মুসেণ্ডা ৭
মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান ২৩

য
যব ২
যশোহর ৬২
যমুনা ৬০, ৭৫

র
রক্ত চোষা ৮৮, ৮৯
রক্ত, দুষিত ২২
বিশুদ্ধ ২২
রক্ষিত চর্বি ২৪
রপ্তানি ৪৫, ৪৬, ৮১
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ৪১, ৮১
রঘুনন্দন ৫
রমনা পার্ক ৮৭
রমুলাস হুইটেকার ৩৭, ৪১, ৫৭, ৬১, ৮৪, ১০৫, ১২১, ১৪২, ১৫১
রমেশ চন্দ্র শীল ৫৭
রয়াল পাম ২
রয়াল টি ৮১, ৮২
রশীদ ১০৬, ১৩০
রাইটিয়া ৫
রাই মঙ্গল ১৭, ৪৪
রাগিবউদ্দিন ১২৪
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ ১১৬
রাজকান্দি ৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ১১০, ১৫১
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১২৬
রাবার ৮
রামগদি ১৮, ৬১
রাসেলস ভাইপার ১৩১
রাংকিয়ং ৫, ৬৩
রিঙ্কোসিফালিয়া ৪২
রিং লির্জাড ৬১
রীডলের সামুদ্রিক কাছিম ৭৮
রেওয়াজ ১
রেনেন্ডী ৪১

রোদ পোহানো ৪৩

ল
লখিন্দর ১১৬
লগারহেড ৭৬
লতা বড়ই ৫
লতা সীম ৫,৭
লবণ ৮
লাইগোসোমা ৮৪
লালিত ২
লিজারড ৮৪
লেদারব্যাক টারটল ৭৯
লেপিডোকেলিস অলিভেসিয়া ৭৬
লোরিয়াল ১২০
লোহাকাট ৮

শ
শণ গাছ ৭
শফি ও কুদ্দস ৭৫, ৭৬
শস্যদানা ২
শারীর বৃত্তীয় ২৪
শালিক ১০৮
শাক আলী ইমাম ১২৪
শাহপুরির দ্বীপ ১১৮
শেওড়া ৪
শেওলা ৩৮
–কাটা ৩৮
শেয়াল কাটা ২
শ্রেণী ২, ৩৩, ৮৩
শ্রেণীভুক্ত ৪২
শিকার ৭৯
শিকড়–তাবিজ ১৩৯
শিবসা ১৭
শিমুল ৬
শিং ৪০
শীত কালীন ঘুম ২৪
শীত নিদ্রা ২৪, ৩৯
শীলা কচ্ছপ ৬০
শীল্ড ৪৭, ৪৮, ৫৭
শুককীট ৩৯
শুকর ২১
শুক্রাণু ৪১
শ্বাসমূল ৮
শ্লেটার ১২৯

স
সবুজ শেওলা ৩৩
সবুজ সামুদ্রিক কাছিম ৭৭
সমকামীতা ৩৬
সমুদ্র ৩
সরকার (এস. ইউ) ১০৫
সরনখোলা রেঞ্জ ৫৭
সরীসৃপ ২, ২৩, ৮৩
সন্দীপ ১৯, ৭৬
স–স্কেলড্ ভাইপার ১৩৩
সংরক্ষণ ১
সাঙ্গু–মাতামুহুরী ৫
সাদা বাইন ১৭
সাধারণ বান্দর ১৮
সাপ ১০৬–১৩৩
সাপুড়ে সম্প্রদায় ১১৫
সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১০৩
সাম্বার হরিণ ১৮
সামুদ্রিক কাছিম ১৮, ৪৪, ৭৫, ৭৬
সারকোলোবাস ১৭
সাংকোষ ৭
সিঙ্গরা ১৭
সিটকী ৮
সিনসিডী ৮৩
সেমপেটরিক ৫৮
সিলিনটারেট ৭৮
সিলেবিস ৬৩
সীগালস ১৮
সেন্টমার্টিন দ্বীপ ১৮, ১৯, ৭৬, ৭৮, ৮০,

সেলা ১৭
স্নেক ১০৯, ১১৩, ১১৭
সোনাদিয়া ১৯, ৭৬, ৮০
সোনালো ৮
সুন্দর বন ২, ৮, ৯, ১৭, ৩৩, ৩৮ ৫৭, ১১৬
সুন্দরী ১৭
সুন্দরী লতা ১৭
সুন্দী কাছিম ৭২
সূত্র ১
স্টারনাম ১০৩
স্লোওয়ার্ম ১০৪
স্কোয়ামোটা ১০৩
স্পার ১০৭
স্তরবিন্যাস ৫
স্ত্রী ৩৪
স্বরথলি ৩৪
সাঁচি বেত ৭
স্বর্প বিজ্ঞানী ১০৩

হ

মস্তবিল টারটল ৭৮
হড়ো ১৭
হযরত বায়েজীদ ৭৪
হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ ৭২
হরিতকী ৬
হরিণ ১৮, ১৯, ২১
হসন্ত ৪৮
হাইনা বেত ৭
হাওর ৩
হাজার বড়শী ৮০
হাজারিখিল ৫, ১২৪
হাতিয়া ১৯
হাতেম আলী কলেজ ১১৬
হাটি, কাছিমের ৮১
হারপুন ১৫০
হারবাং ৫
হারারগাছ ৫
হামাদ্রিয়াদ ৮৩, ১১
হাড়গোজা ৭, ১৮
হাড়জোড়া ৭, ১৭
হিজল ৮, ১৭
হিন্দু সম্প্রদায় ৫৭, ৬২, ৭৯
হেঁতাল ১৭
হোগলা ৮, ১৭
হোমিওপ্যাথি ১২৮
হোসেন ৭৬, ৮৩, ৮৪, ১০৫, ১১৮
হ্রদ ৮
হৃৎপিণ্ড ২৩

Library